বৌদ্ধ পুরাণ' গ্রন্থ

মহাবংশ

সাধনকমল চৌধুরী
অনুবাদক

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

পরম পূজনীয় পিতা—

পণ্ডিত ৺জয়দ্রথ চৌধুরী, সূত্রবিশারদ

মহাশয়ের পুণ্য স্মৃতিতে

কিছু কথা

বঙ্গোপসাগরের মহাদ্বীপ শ্রীলংকা ভারতবর্ষের সর্ব দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই মহাদ্বীপের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ বহু প্রাচীনকাল থেকেই। সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে প্রায় আড়াই বা তিন হাজার বছরেরও পূর্বে। ভারতবর্ষে বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পরে স্বাভাবিকভাবেই সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম গিয়ে পৌঁছায়। তবে তারও আগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেই দেশে গিয়ে পৌঁছেছে। তার পিছু পিছু শৈবধর্ম, জৈনধর্ম ইত্যাদিও ভারতবর্ষ থেকে সেই দেশে যায়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে শ্রীলংকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা একসময় সেই দেশে গিয়ে বসবাসও করে। সেই দেশের শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সভ্যতায় ও ভাষায় ভারতবর্ষের দ্রাবিড়দের প্রভাব স্পষ্ট। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকেও মানুষ গিয়ে বসবাস করে শ্রীলংকায়। তাই সেই দেশে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে দ্বীপবাসীদের সংমিশ্রণ হয়েছে, বিভিন্ন ভাষার এবং কৃষ্টিরও সংমিশ্রণ হয়েছে। তাই ভারতবর্ষে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি আজও সেই দেশে দেখা যায়। ভারতবর্ষের মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা আজও সেই দেশে বিদ্যমান। তাই একসময় মনে হতো এই দেশটি ভারতবর্ষের বাইরে হলেও বুঝি এই দেশেরই একটা অংশ। দুই দেশের মানুষদের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র, সেটা প্রাচীনকাল থেকে আজও অম্লান।

শ্রীলংকার প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। অবশ্য এখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম এবং খৃষ্টান ধর্মও সেই দেশে রয়েছে। তবে সেগুলো সংখ্যায় লঘু। শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশী। ইতিহাস বলে, সম্রাট অশোকের কালে, খ্রিঃ পূঃ ২৪৬ অব্দে ভারতবর্ষ থেকে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম শ্রীলংকায় গিয়ে পৌঁছায়। সেই থেকে এই ধর্ম আজও সেখানে স্বমহিমায় টিকে রয়েছে। প্রাচীন এই দেশে এই ধর্মকে জড়িয়ে প্রাচীনকাল থেকে নানা উপাখ্যান যে গজিয়ে উঠবে এতে আর অস্বাভাবিক কি? সর্বদেশে সর্বকালে কল্পনাপ্রবণ মানুষ স্বীয় ধর্মের গুণগান গাইতে, তাকে প্রাধান্য দিতে, নানা কাল্পনিক, অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব করে। মুখে মুখে প্রচলিত এইসব কাহিনী নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একসময় বিরাট মহীরুহের রূপ নেয়। এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটিও তাই। এটা হচ্ছে শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্ম ঘিরে নানা উপাখ্যানের সমষ্টি। অবশ্য এর মধ্যে সত্য কাহিনীও রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসও রয়েছে, দুই দেশের

তৎকালীন প্রাচীন রাজাদের কথাও রয়েছে। সেই হিসাবে ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থটিকে গাঁজাখুরী কাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এই গ্রন্থের বহু অংশে রয়েছে দুই দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, যা বাদ দেওয়া যায় না। উপাখ্যানের সংকলন করতে গিয়ে লেখক বহু ক্ষেত্রে দুই দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাও এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থটি মাগধী প্রাকৃত ভাষায় লেখা, যেটাকে বুদ্ধঘোষ পালি ভাষা বলেছেন। যে সময় এই গ্রন্থটি শ্রীলঙ্কায় লেখা হয়, সেই সময় খুব সম্ভবত বুদ্ধঘোষ সেই দেশে ছিলেন। সেটা ছিল শ্রীলঙ্কার রাজা ধাতুসেন-এর রাজত্বকাল (৫০১-৫২৭ খ্রিস্টাব্দ)। পরে ১৯০৮ সালে জার্মান অধ্যাপক গাইগার গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। শ্রীমতী বোডে (BODE) সেইটি পরে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং অধ্যাপক গাইগার সেই গ্রন্থটি দেখে দেন ১৯১২ সালে। গ্রন্থটি সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন ভিক্ষু সুমঙ্গল ও পণ্ডিত বতুয়ানতুদাবে। গ্রন্থটির কোন বাংলা অনুবাদ আজও আমার চোখে পড়েনি।

গ্রন্থটির শুরু হয়েছে বুদ্ধের লঙ্কাদ্বীপে আগমন নিয়ে। এইখানে বলে রাখা ভালো যে, গ্রন্থের এই অংশটি মোটেও সত্য নয়। বুদ্ধ কখনও লঙ্কাদ্বীপে যাননি এবং সেখানে গিয়ে কোনরূপ যক্ষদেরও তাড়াননি। এই অংশে যেসব পূর্বতন বুদ্ধদের কথা বলা হয়েছে সেগুলো দীঘনিকায়ের প্রক্ষিপ্ত সূত্র থেকেই নেওয়া। অতএব কোনটাই সত্য নয়।

যাই হোক, গ্রন্থটিকে উপাখ্যান হিসাবে পড়লেও পাঠক অভিভূত হবেন। গুপ্ত যুগে লিখিত 'পুরাণ' গ্রন্থগুলির মতো 'বৌদ্ধ পুরাণ' লিখতে গিয়ে লেখক এক নতুন ধরনের গ্রন্থ সৃষ্টি করেছেন, যা শুধুমাত্র কাল্পনিক ও অলৌকিক কাহিনীর সংকলন নয়। সাধারণতঃ 'পুরাণ' বলতে আমরা যা বুঝি, তার মধ্যে বাস্তবসত্য থাকে না বললেই চলে। পুরাণে কিছু রাজ-বংশের কথা থাকলেও সেটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলা চলে না। ঐতিহাসিকরা সেটাকে বলেছেন 'mythical historical section'। এই গ্রন্থ কিন্তু সেই হিসাবে সঠিক পুরাণ হয়ে ওঠেনি। পুরাণের মতো মিথ্ ও অলৌকিক কল্পনা এই গ্রন্থে থাকলেও সেটা কোন ক্ষেত্রেই বাস্তবকে বাদ দিয়ে হয়নি, বা সঠিক বাস্তবকে ছাপিয়ে যায়নি। লেখক অলৌকিক কল্পনার পাখা মেললেও তাঁর পা দুটি কিন্তু শক্ত ভূমিতেই। এই গ্রন্থের বহু কাহিনী যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'The information about ··Buddhist missions sent to different regions was confirmed by the discovery of inscriptions containing the names of preachers mentioned in the ceylonese chronicles······It is also quite

possible that the Mahavamsa reflected real events connected with the spread of Buddhism during the 2nd-1st century B. C.,

এককালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও যে নতুন ধরনের 'বৌদ্ধ পুরাণ' লিখেছিলেন তারই মহান নিদর্শন এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটি। বিষয়টি আজকের বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে হয়তো অজানা। সেটা জানানোর লোভেই আমার এই অনুবাদ। যতখানি সহজ সরল করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করেছি এই অনুবাদে। টীকাও রাখা হয়েছে। মূলের সত্যতা অক্ষুন্ন রাখতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভাষাটা একটু জটিল হয়ে পড়েছে। তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থের মূল রস বজায় রাখতেই তা করতে হয়েছে।

আশা করি অনুবাদের মাধ্যমে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক মূল গ্রন্থটির রসাস্বাদনে বঞ্চিত হবেন না। যদি এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠকদের মনে ধরে তবেই এই কষ্টের সার্থকতা।

'সব্বে সাত্তা সুখিতা হোন্তু'

অনুবাদক

গ্রন্থ পরিচিতি

মাগধী প্রাকৃতে লেখা 'মহাবংশ' গ্রন্থটি হচ্ছে লংকাদ্বীপের প্রচলিত কিছু উপাখ্যানের সংকলন। লোকমুখে প্রচলিত এইসব উপাখ্যান একত্রিত ক'রে 'দ্বীপবংশ' নামক গ্রন্থটি লেখা হয় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে। কে সেই গ্রন্থটি লিখেছিলেন সেটা আজও জানা যায়নি। গ্রন্থটি ছিল খাপছাড়া গোছের। ভাষায়ও বেশ গণ্ডগোল ছিল। Geiger সাহেব বলেছেন—'The Dipavamsa presents the first clumsy redaction in Pali verses.' এই কারণে, খুব সম্ভবত, ভিক্ষু মহানাম, খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ অব্দে 'মহাবংশ' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এই গ্রন্থের বেশীর ভাগ বিষয় নেওয়া হয়েছে 'দ্বীপবংশ' গ্রন্থ থেকেই।

গুপ্তযুগে পুরাণ লেখা হয়। সেই পুরাণের আকারেই এইসব উপাখ্যান গ্রন্থের উদ্ভব, যেমন মহাবংশ, চুলবংশ, শাসনবংশ ইত্যাদি। এগুলোকে 'বৌদ্ধ পুরাণ' বলা যায়, যদিও তারা সম্পূর্ণ পুরাণ গ্রন্থ হয়ে ওঠেনি।

কী আছে এই মহাবংশ গ্রন্থে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার 'মহাবংশ' সম্বন্ধে বলেছেন, 'The narrative winds its way through both the history of ceylon and the history of Buddhism on the island, with cross-references to important events in the history of Buddhism taking place in India. A variety of sources are used such as royal records, monastic records, histories of relics and shrines, legends, folklores and the personal experiences of those who have witnessed events. The Mahavamsa is given to literary embellishments and a ready incorporation of mythological and legendary material···The purpose in writing the chronicles was partly historical and partly didactic since they were also intended for the edification of the Buddhist order, the Sangha.' (Ancient Indian Social History. Some interpretations—Romila Thapar).

যেহেতু বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষে এবং ধর্মের বেশ কিছু বিবর্তন হয়েছিল সেইখানে, তাই মহাবংশ-এর লেখক ভারতবর্ষের কিছু বিশেষ ঘটনার কথাও যুক্ত করেছেন এই গ্রন্থে। তিনটি মহা ধর্মসম্মেলনের কথা রয়েছে এই গ্রন্থে; বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিনে বিজয়ের লংকাদ্বীপে আগমনের কথা রয়েছে; কোশলরাজ বিধুরব দ্বারা শাক্যদের নিধনের কথা রয়েছে; মৌর্য রাজাদের কথা রয়েছে। যুবরাজ

মহেন্দ্রের মায়ের কথা রয়েছে (যা ইতিহাসে বিরল)। বোধিবৃক্ষের কথা রয়েছে ; শাক্য রাজাদের কথা রয়েছে ; মগধ, কুশীনারা, রাজগৃহ, বিদেহ ইত্যাদিরও উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, দেবদহের শাক্য অঞ্জনের স্ত্রী হচ্ছেন যশোধরা যিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা জয়সেনের কন্যা। তাঁদের ঔরসজাত কন্যা মায়া ও প্রজাপতিকে রাজা শুদ্ধদন বিয়ে করেন। রাজা শুদ্ধদনের শ্যালক সুপ্পবুদ্ধের প্রথমা কন্যা ভদ্দকচ্চানাকে রাজা শুদ্ধদনের পুত্র গোতম বিয়ে করেন। এইরকম বিয়ে শাক্যদের মধ্যে তৎকালে প্রচলিত ছিল।

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে রাজা বিম্বিসারের পিতার সাথে রাজা শুদ্ধদনের বন্ধুত্ব ছিল। কথাটি যে ঠিক তা বলা যাচ্ছে না। আরও বলা হয়েছে যে বুদ্ধ চুরাশি বছর বয়সে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইতিহাস বলে যে বুদ্ধ আশী বছর অবধি বেঁচে ছিলেন। এই নিয়ে অবশ্য নানা মতভেদ রয়েছে। তবে এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোক রাজা হন। দ্বীপবংশ ও মহাবংশ গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে।

শ্রীলংকার রাজা তিষ্য যে রাজা অশোকের সমসাময়িক ছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে। এই নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এই রাজাও সম্রাট অশোকের মতো 'দেবানংপিয়' কথাটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এই কারণে প্রথম দিকে 'দেবানংপিয় রাজা'র শিলালিপির প্রবক্তা কে এই নিয়ে প্রিন্সেপ সাহেব বেশ ধন্দে পড়েছিলেন, কারণ 'দেবানংপিয় রাজা' কথাটি শিলালিপিতে ছিল। পরে তিনি এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটি পাঠ করে বুঝেছিলেন যে শিলালিপির 'দেবানংপিয়', রাজাটি হলেন ভারত সম্রাট অশোক, কারণ দেবানংপিয় তিষ্য রাজার কোন শিলালিপি লংকাদ্বীপে পাওয়া যায়নি এবং তিনি নিজের দেশ ছেড়ে সকল শিলালিপি ভারতবর্ষের ভূমিতেই বা স্থাপন করবেন কেন? তাছাড়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত সম্রাট অশোকের ধর্মদূত পাঠানোর কথা এই সম্রাটের শিলালিপিতেও রয়েছে।

এইসব কারণে এই উপাখ্যান গ্রন্থটিকে দুই দেশের ইতিহাসের সূত্র গ্রন্থও বলা চলে।

অনেকে বলেছেন এই গ্রন্থে সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের কাহিনীটির কোন উল্লেখ না করে গ্রন্থটি সত্যভ্রষ্ট হয়েছে। কথাটি ঠিক নয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের সঙ্গে লংকাদ্বীপের যোগাযোগ কোথায়? সম্রাট অশোক লংকাদ্বীপের জন্য এবং বৌদ্ধধর্মের জন্য যেটুকু করেছেন তাই বলা হয়েছে এইখানে। তার বাইরে গিয়ে বলাটা বেশী বাড়াবাড়ি হতো না? তবে লেখক নিশ্চয়ই কলিঙ্গ যুদ্ধের উল্লেখ করতেন যদি সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর

বিবেকের দংশনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিতেন। '...for if it had been so spectacular the ceylonese monks would certainly have made much of it. However there is no reference to the Kalinga war in the ceylonese Chronices'. (Ashoka and the Decline of the Mauryas-Romila Thapar) ঐতিহাসিক Eggermont বলেছেন যে সম্রাট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পরে কলিঙ্গ জয় করেন, কারণ সম্রাটের শিলালিপিতে ধর্মে দীক্ষার সময় হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বে। (The chronology of the Rein of Asoka Moriya, P. 88) তিব্বতী ঐতিহাসিক 'তারনাথ' ও সেই মত পোষণ করেন। এই সকল ঐতিহাসিকরা মনে করেন খুব সম্ভবত এই কারণেও এই সব 'বংশ গ্রন্থে' অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের কোনরূপ উল্লেখ নেই।

এই গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ-এর ছায়াও রয়েছে। রাজা পণ্ডুয়াভয়-এর জন্ম ও জীবন-কাহিনীটির সঙ্গে কৃষ্ণ-বাসুদেব-এর জন্ম ও জীবন কাহিনীর যথেষ্ট মিল রয়েছে মহাবংশ-এ। 'The details of the story are too similar even to allow of any Jungian explanation of the identical myth'. (Romila Thapar)

সেই কারণে প্রথমেই বলা হয়েছে পুরাণের মতো গ্রন্থ লিখতেই বসেছিলেন লেখক। কিন্তু তা হলেও এইসব উপাখ্যান গ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে পুরাণকে অনুসরণ করেনি। তাদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের স্বকীয়তা দিয়েছে।

গ্রন্থের শেষের দিকে মহাযানী 'বৈপুল্য সূত্রের' ও তন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারত থেকে এগুলো একসময় লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে পৌঁছায়। 'বৈপুল্য সূত্র' হলো মহাযানী ধর্মানুশাসন গ্রন্থগুলোর সমষ্টি। এই গ্রন্থগুলো নানাজনে নানাসময়ে লিখেছেন। বর্তমানে এই গ্রন্থগুলো কেবল নেপাল দেশেই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রন্থগুলোর কিছু ইংরেজী অনুবাদও হয়েছে। বৈপুল্য সূত্রের গ্রন্থগুলো হলো—অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক, ললিতবিস্তর, লঙ্কাবতার অথবা সদ্ধর্ম লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যুহ, তথাগতগুহ্যক অথবা তথাগত-গুণজ্ঞান, সমাধিরাজা ও দশভূমিশ্বার। এই নয়টি গ্রন্থের মধ্যে সদ্ধর্ম-পুণ্ডরিক গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে মহাযানী ধর্মাদর্শের সকল গূঢ় তত্ত্ব। মহাযানীরা শাক্যমুনিকে মানুষের পরিবর্তে ঈশ্বর, বিশ্বপতি, জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতায় রূপান্তরিত করেছেন। এই গ্রন্থগুলোর উদ্ভব হয়েছে খ্রিষ্টীয় ২য় অব্দে। মহাযানীরা এই নয়টি গ্রন্থকেই মান্য করেন, বৌদ্ধ ত্রিপিটককে নয়। এছাড়া, মহাযানীরা কাল্পনিক উপাখ্যানও রচনা করেছেন,

যেমন 'অবদান' গ্রন্থগুলো। অবদানশতক, মহাবস্তুবদান, দিব্যাবদান, অবদান-কল্পলতা, বোধিসত্ত্বদান-কল্পলতা প্রভৃতি মহাযানী গ্রন্থগুলো একসময় থেরবাদী বা হীনযানী বৌদ্ধদের মধ্যেও খ্যাতি অর্জন করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এইসব গ্রন্থের কাহিনী নিয়ে বিখ্যাত সব কবিতা, গীতিনাট্য রচনা করেন, যেমন পূজারিণী, মূল্যপ্রাপ্তি, অভিসার, পরিশোধ, শ্যামা, শাপমোচন ইত্যাদি। 'অবদানকল্পতার' রচনাকার হচ্ছেন কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র (১১ খ্রিষ্টাব্দ)। এইরূপ নানা কাহিনীকার বিভিন্ন সময়ে এই 'অবদান' গ্রন্থগুলো রচনা করেন।

'মহাবংশ' শ্রীলঙ্কার একটি অনবদ্য উপাখ্যান গ্রন্থ। থেরবাদী ভিক্ষুর সংকলিত এই গ্রন্থের রচনাশৈলী, উপস্থাপনা ও বিন্যাস অনবদ্য। কাহিনীগুলো আকর্ষণীয় এবং পাঠককে বিমুগ্ধ করে। এই গ্রন্থ দুই দেশের প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের এক অমূল্য রত্নবিশেষ। তৎকালীন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধ্যান-সাধনার মধ্যে থেকেও যে উচ্চতর সাহিত্য চর্চা করেছিলেন, এই মহাবংশ গ্রন্থই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। ত্রিপিটক বহির্ভূত এই গ্রন্থকে কোনমতেই বাদ দেওয়া যায় না।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম বিকাশের প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে এই গ্রন্থে যা ঐতিহাসিকদেরও কাজে লাগবে।

এই প্রকাশনায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

ইতিহাসের আলোয় গৌতম বুদ্ধ
প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন
মিলিন্দপঞ্‌হ (অনুবাদ)
বিশুদ্ধ দীঘনিকায় (অনুবাদ)
বিশুদ্ধ সুত্তনিপাত (অনুবাদ)
থেরীগাথা (অনুবাদ)
থূপবংশ (অনুবাদ)
বুদ্ধের ধ্যানপদ্ধতি ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা
বেদ ও বুদ্ধ
গীতা ও বুদ্ধ

সূচীপত্র

মহাবংশ

১

তথাগতের লঙ্কাদ্বীপে আগমন

বিশুদ্ধ বংশ সম্ভূত[১], পবিত্র, সম্যক সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া, কোন কথনই[২] বর্জন না করিয়া, মহাবংশ আবৃত্তি শুরু করিতেছি। প্রাচীন ঋষিগণ পূর্বে যাহা সংকলন করিয়াছিলেন, উহা কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল অতি দীর্ঘ এবং কোন কোন অংশে ছিল অতি হ্রস্ব। উহাতে অনেক অংশে পুনরাবৃত্তিও ছিল। ॥ ১-২ ॥

এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটি সেই সকল দোষমুক্ত। ইহা সকলের বোধগম্য হইবে ও স্মরণে থাকিবে। ইহা মনে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিবে। ইহা যুগ পরম্পরায় প্রাপ্ত। আপনারা এই 'মহাবংশ' অনুধাবন করিয়া শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হউন। ॥ ৩-৪ ॥

অতীতে এই বিজয়ীবীর[৩] সম্যকসম্বুদ্ধ দীপঙ্কর বুদ্ধকে দেখিয়া সংকল্প করিলেন যে তিনিও বুদ্ধ হইবেন এবং জগৎকে অশুভ হইতে মুক্ত করিবেন। ॥ ৫-৬ ॥

তিনি উক্ত সম্যকসম্বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া কশ্যপ বুদ্ধ অবধি চব্বিশজন[৪] সম্যকসম্বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎবাণী জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং সকল পারামি[৫] পূর্ণ করিলেন। ॥ ৭-১০ ॥

এই বিজয়ীবীর যথাসময়ে পরমজ্ঞান[৬] প্রাপ্ত হইয়া গোতম বুদ্ধ হইলেন। তিনি জগৎ-এর দুঃখ মোচন করিলেন। ॥ ১১ ॥

মগধ রাজ্যের উরুবেলায় এই মহামুনি বোধিবৃক্ষের পাদদেশে ধ্যানে বসিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধত্বলাভ করিলেন। ॥ ১২ ॥

বুদ্ধত্বলাভের পর সাতদিন তিনি সেই স্থানে আত্মমগ্ন ছিলেন। যে জ্ঞান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা অন্যকে প্রদান করিবার কথা চিন্তা করিলেন। ॥ ১৩ ॥

অতঃপর তিনি বারাণসীতে[৭] গিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন। তিনি সেই স্থানে বর্ষাবাস করিয়া ষাটজনকে ধর্মশ্রবণ করাইয়া অর্হত্বলাভ করাইলেন। ॥ ১৪ ॥

এই সকল দীক্ষিত ভিক্ষুদের তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন।

অতঃপর ভদ্দের ত্রিশজন সঙ্গীদের ধর্মে দীক্ষা দিয়া শান্ত ঋষি কশ্যপের এক হাজার জটাধারী[৮] অনুচরদের ধর্মে দীক্ষা দিবার জন্য উরুবেলায় গিয়া

সারা শীতকাল সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাহাদের ধর্মে দীক্ষা দিবার উপযুক্ত করিলেন। ॥ ১৫-১৬ ॥

সেই সময় ঋষি কশ্যপ উরুবেলায় এক বিরাট যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। তিনি শাস্তার আগমনে প্রীত হইবেন না এবং তাহার দেখাও পাওয়া যাইবে না, ইহা বুঝিয়া শাস্তা ভিক্ষার্থে উত্তরকুরু প্রদেশে[৯] গেলেন। ভিক্ষা শেষে তিনি অনোতত্ত[১০] হ্রদের তীরে উপবেশন করিয়া আহার সমাপ্ত করিলেন। ॥ ১৭-১৮ ॥

অতঃপর বুদ্ধত্বলাভের নবম মাসে, চান্দ্র বৎসরের[১১] দশম মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লঙ্কাদ্বীপে ধর্মবিজয়ের জন্য শাস্তা লঙ্কাদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ, বিজয়ীবীর জ্ঞাত ছিলেন যে লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার ধর্ম স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইবে। তিনি আরও জ্ঞাত ছিলেন যে লঙ্কাদ্বীপ যক্ষে[১২] পরিপূর্ণ। অতএব প্রথমে যক্ষদের লঙ্কাদ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। ॥ ১৯-২০ ॥

তিনি আরও জ্ঞাত ছিলেন যে, লঙ্কাদ্বীপের মধ্যস্থলে নদীতীরের সুরম্য মহানাগ উদ্যানই[১৩], যাহা তিন যোজন দৈর্ঘ্য ও এক যোজন প্রস্থ, যক্ষদের বিচরণ ক্ষেত্র। দ্বীপের সকল যক্ষরা সেই উদ্যানে তখন সমবেত হইয়াছেন। ইহা জ্ঞাত হইয়া তথাগত সেই স্থানে গেলেন। ॥ ২১-২৩ ॥

যক্ষদের সেই আসরের মধ্যস্থলে, শূন্যে, তাহাদের মাথার উপরে তথাগত ভাসিয়া থাকিয়া ঝড়, জল, ঝঞ্ঝা, প্রলয়, অন্ধকার ইত্যাদির উদ্ভব করিয়া যক্ষদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিলেন। এই মধ্যস্থানে পরে সেই স্মৃতিতে 'মহিয়ংগন স্তূপ' নির্মাণ করা হয়।

ভীত সন্ত্রস্ত যক্ষগণ তথাগতের নিকট তাহাদের ভয়মুক্ত করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। ॥ ২৪-২৫ ॥

সেই প্রার্থনায় তথাগত ভয়ার্ত যক্ষদের বলিলেন, 'হে যক্ষগণ! আমি তোমাদের ভয়মুক্ত করিব, তবে তোমরা আমাকে উপবেশনের স্থান দাও।'

যক্ষগণ সমস্বরে বলিল, 'হে বীর শ্রেষ্ঠ প্রভু! শুধুমাত্র উপবেশনের স্থান নয়, আমরা আপনাকে সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ প্রদান করিব। আপনি আমাদের ভয়মুক্ত করুন।' ॥ ২৬-২৭ ॥

অতঃপর যক্ষগণ তথাগতকে তাহাদের মধ্যস্থলে উপবেশনের স্থান প্রদান করিলে, তথাগত ঝড়, জল, ঝঞ্ঝা, প্রলয়, অন্ধকার ইত্যাদি দূর করিয়া যক্ষদের ভয়মুক্ত করিয়া সেই প্রদত্ত স্থানে চর্মাসন বিছাইয়া উহার উপর উপবেশন করিলেন। ॥ ২৮ ॥

ধীরে ধীরে উক্ত চর্মাসন চারিধারে বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং উহার চারিধারের প্রান্তভাগে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। যক্ষগণ সেই অগ্নি ও উত্তাপ

হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে ভয়াতর্ নয়নে দূরে সরিয়া গিয়া দেখিলেন যে তথাগত অগ্নি পরিবৃত হইয়া সেই চর্মাসনে নিশ্চিন্তে বসিয়া রহিয়াছেন।

॥ ২৯ ॥

অতঃপর তথাগত দৈববলে সুদূরের গিরিদ্বীপকে[১৪] উক্ত স্থানে আনিয়া যক্ষদের নিকটে স্থাপন করিলেন। ভয়ার্ত যক্ষগণ অগ্নি এবং উহার উত্তাপ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে সেই গিরিদ্বীপে গিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

॥ ৩০ ॥

লংকাদ্বীপের সকল যক্ষরা গিরিদ্বীপে গিয়া অবস্থান করিলে তথাগত পুনরায় দৈববলে গিরিদ্বীপকে তাহার পূর্বের স্থানে ফিরাইয়া দিলেন।

এইরূপে তথাগত লংকাদ্বীপকে যক্ষশূন্য করিলেন। ॥ ৩১ ॥

অতঃপর তথাগত আসন হইতে উঠিয়া অগ্নি নির্বাপিত চর্মাসনটি গুটাইয়া লইলেন।

ইহার পর সেই স্থানে দেবতাদের সমাগম হইল। তথাগত তাঁহাদের ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মসভায় উপস্থিত বহুকোটি জীবসকল ধর্মে দীক্ষা লইলেন। ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল সকলে গ্রহণ করিলেন। ॥ ৩২ ॥

সুমনকূট[১৫] পর্বতের দেবকুমার মহাসুমন ধর্মে দীক্ষা লইয়া স্রোতাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু অ'রাধ্য, উহা ব্যক্ত করিতে তথাগতকে প্রার্থনা করিলেন। কল্যাণকর তথাগত ইহা শুনিয়া স্বীয় মস্তকের উপর হস্ত বুলাইয়া তাঁহার মস্তকের কয়েকটি চুল দেবকুমার মহাসুমনকে প্রদান করিলেন। ॥ ৩৩-৩৪ ॥

দেবকুমার মহাসুমন তথাগতের মস্তকের উক্ত চুল সুবর্ণ পাত্রে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শাস্তা উদ্যানের যেই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সাত হস্ত দৈর্ঘ্য পরিমাণ ভূমিতে বহুবর্ণের মণিমুক্তার আচ্ছাদন দিয়া উহার উপর সেই চুল রক্ষিত সুবর্ণ পাত্রটি স্থাপন করিলেন। ॥ ৩৫ ।

শাস্তার মস্তকের চুল রক্ষিত সেই সুবর্ণ পাত্রের উপর দেবকুমার মহাসুমন নীলকান্ত মণির একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

॥ ৩৬ ॥

সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর ভিক্ষু সারিপুত্রের শিষ্য ভিক্ষু সরভু দৈববলে তথাগতের প্রজ্জ্বলিত চিতার অগ্নি হইতে তথাগতের কণ্ঠাস্থি উদ্ধার করিয়া লংকাদ্বীপে লইয়া আসিলেন। ॥ ৩৭ ॥

সমবেত ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে ভিক্ষু সরভু উক্ত স্তূপে তথাগতের এই অস্থি স্থাপন করিয়া দৈববলে পূর্বতন স্তূপকে বারো হস্ত উচ্চ করিয়া সুবর্ণ বর্ণের প্রস্তরে তথাগতের অস্থি ও চুল সম্বলিত স্তূপকে আচ্ছাদিত

করিলেন। তারপর ভিক্ষু সরভূ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

॥ ৩৮-৩৯ ॥

অতঃপর রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের ভ্রাতুষ্পুত্র উদ্ধচূলাভয় উক্ত মনোরম স্তূপ দেখিয়া উহাকে তিরিশ হস্ত উচ্চ করিলেন। ॥ ৪০ ॥

রাজা দুত্তগামণি দমিলদের* বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে উক্ত প্রদেশে অবস্থান করেন। তিনি উক্ত স্তূপকে আবৃত করিয়া আশী হস্ত উচ্চ একটি স্তূপ স্থাপন করেন।

এইরূপে 'মহিয়ংগন স্তূপ'টির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। ॥ ৪১-৪২ ॥

পরম বীরশ্রেষ্ঠ তথাগত লঙ্কাদ্বীপকে মানুষের বাসের উপযোগী করিয়া বীরবিক্রমে উরুবেলা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ॥ ৪৩ ॥

অতঃপর মহাকারুণিক, বীরশ্রেষ্ঠ, পরিত্রাতা শাস্তা বুদ্ধত্বলাভের পঞ্চম বর্ষে জেতবন উদ্যানে অবস্থানকালে দিব্যজ্ঞানে জ্ঞাত হইলেন যে, একটি রত্নখচিত আসন লইয়া বিবদমান দুই নিকট আত্মীয় নাগ-পরিবার, মাতুল মহোদর এবং ভাগিনেয় চুলোদর ও তাহাদের পরিজনদের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন।

॥ ৪৪-৪৬ ॥

সম্যকসম্বুদ্ধ ইহা জ্ঞাত হইয়া চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের উপসথ দিবসের প্রত্যুষে পাত্র-চীবর লইয়া, নাগদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, নাগদ্বীপ[১৬] অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ॥ ৪৭ ॥

মহোদর নাগ ছিলেন সমুদ্রের নাগ রাজ্যের পরম ঋদ্ধিসম্পন্ন অধিপতি। তাহার রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল অর্ধ হাজার যোজন। তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীকে কন্‌ন্যাবর্ধমান পর্বতের নাগরাজ বিবাহ করেন। তাহাদের ঔরসজাত পুত্র হইল চুলোদর।

চুলোদরের পিতামহ একসময় তাহার মাতাকে একটি রত্নখচিত আসন উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সেই উপহার প্রদান করিবার পূর্বে পিতামহের মৃত্যু হয়। পরে সেই রত্নখচিত আসন চুলেদরের মাতুল তাহার ভগিনীকে প্রদান করিতে অস্বীকার করেন। পিতৃসত্য তিনি পালন করিতে নারাজ। ইহাতে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধ প্রায় আসন্ন। কন্‌ন্যাবর্ধমান পর্বতের নাগরাও পরম ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ॥ ৪৮-৫১ ॥

সমিদ্ধিসুমন নামক এক বৃক্ষদেবতা একসময় জেতবন উদ্যানের এক

---

* তারা ছিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা। ভারত ত্যাগ করে তাদের কিছু লোক প্রাচীনকালে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বসবাস শুরু করে।

রাজায়তন[১৭] বৃক্ষে অবস্থান করিতেন। সেই বৃক্ষের পল্লব ছত্রের ন্যায় ধরিয়া তিনি বীরশ্রেষ্ঠকে ছায়া প্রদান করিতেন। এই দেবতা পূর্বজন্মে নাগদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। ॥ ৫২-৫৪ ॥

তিনি একদিন দেখিলেন, এক পচ্চেকা বুদ্ধ এক রাজায়তন বৃক্ষের পাদদেশে উপবেশন করিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেছেন। পচ্চেকা বুদ্ধের দর্শনে প্রীত হইয়া তিনি উক্ত বৃক্ষের শাখা হইতে পল্লব লইয়া উহা দ্বারা ভিক্ষাপাত্র পরিস্কার করিতে পচ্চেকা বুদ্ধকে প্রদান করিলেন।

এই পুণ্যকর্মের কারণে তিনি মৃত্যুর পর জেতবন উদ্যানের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে অবস্থিত অনুরূপ একটি রাজায়তন বৃক্ষের দেবতা হইয়া উক্ত বৃক্ষে অবস্থান করিতেন। ॥ ৫৫-৫৬ ॥

পরে দেবপতি ইন্দ্র এই দেশের হিতার্থে উক্ত বৃক্ষ-দেবতা সমিদ্ধি-সুমনকে তাঁহার বৃক্ষসহ লঙ্কাদ্বীপে আনয়ন করিলেন। ॥ ৫৭ ॥

রণাঙ্গনের উপরে শূন্যে ভাসমান থাকিয়া তমসাবিদারী শাস্তা নাগদের ঘোর তমিস্রায় আচ্ছন্ন করিলেন। ইহাতে তাহারা সকলে ভীত, সন্ত্রস্ত হইলে তথাগত পুনরায় আলো বিকিরণ করিয়া তাহাদের সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। নাগরা শাস্তাকে শূন্যে ভাসমান দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, শাস্তা নাগদের ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে নাগদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ তখন যুদ্ধ ভুলিয়া মিত্রতার বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ হইয়া, তাহাদের বিবাদের যাহা বিষয়বস্তু সেই রত্নখচিত আসনটি খুশী মনে তাহারা মুনিবরকে[১৮] প্রদান করিলেন। ॥ ৫৮-৬০ ॥

অতঃপর শাস্তা শূন্য হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া উক্ত প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। নাগরাজাগণ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় প্রদান করিয়া তৃপ্ত করিলেন। প্রভু বুদ্ধ সেই স্থলে ভূমি ও সমুদ্রের আশী কোটি নাগদের ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। ॥ ৬১-৬২ ॥

নাগরাজ মহোদর-এর মাতুল কল্যাণীর[১৯] নাগরাজ মনিঅক্খিক ভাগিনেয়র পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া তথাগতের ধর্মদেশনায় মুগ্ধ হইয়া ত্রি-শরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া তথাগতকে বলিলেন, 'হে শাস্তা! আমাদের প্রতি মহাকরুণার কারণে আপনি এই স্থলে আসিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। নতুবা আমরা সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতাম। ॥ ৬৩-৬৫ ॥

হে মহাকারুণিক। আপনি পুনর্বার এই দ্বীপে আসিয়া আমার আবাসস্থলে পদার্পণ করিবেন।' ॥ ৬৬ ॥

প্রভু ইহা শুনিয়া মৌন থাকিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলে উক্ত নাগরাজ স্মারক চিহ্ন স্বরূপ সেই স্থানে জেতবন উদ্যানের সেই রাজায়তন বৃক্ষটি

প্রতিষ্ঠা করিলেন। জগৎপতি[২০] সেই বৃক্ষ ও নাগদের প্রদত্ত সেই আসনটি নাগদের পূজ্যবস্তু হিসাবে নাগদের প্রদান করিয়া বলিলেন, 'নাগরাজগণ! আমার ব্যবহৃত এই আসন এবং ঐ বৃক্ষটি আমার স্মৃতিতে তোমরা পূজা করিবে। ইহাতে তোমাদের সুখ এবং আমার আশীষ তোমরা প্রাপ্ত হইবে।' ॥ ৬৭-৬৯ ॥

তথাগত নাগদের এইরূপ বলিয়া তাহাদের অন্যান্য উপদেশও প্রদান করিলেন।

অতঃপর মহাকারুণিক, পরিত্রাতা তথাগত জেতবনে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ৭০ ॥

উক্ত ঘটনার পর, তৃতীয় বর্ষে নাগরাজ মনিঅক্ষিক সম্যকসম্বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষুসংঘসহ তাহার আবাসে ভিক্ষান্ন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। ॥ ৭১ ॥

বুদ্ধত্বলাভের অষ্টম বর্ষে শাস্তা জেতবন উদ্যানে অবস্থানকালে বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসের পূর্ণিমা তিথিতে, ভিক্ষান্ন গ্রহণের আসন্ন সময়ে পাঁচশত ভিক্ষু দ্বারা পরিবৃত হইয়া পাত্র-চীবর লইয়া ঋদ্ধিবলে কল্যাণী অঞ্চলে নাগরাজ মনিঅক্ষিকের বাসস্থলে উপস্থিত হইলেন। ॥ ৭২-৭৪ ॥

উচ্চ বেদীর উপরে রত্নখচিত শামিয়ানার নীচে ভিক্ষুসংঘসহ শাস্তা যথাযথ আসনে উপবেশন করিলেন। এই স্থানে পরে 'কল্যাণী চৈত্য' স্থাপিত হয়। ॥ ৭৫ ॥

নাগরাজ ও তাহার পারিষদগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পরম বিজয়ীবীর, সত্যদর্শী শাস্তা ও তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে স্বর্গীয়[২১] খাদ্য-পানীয় প্রদান করিলেন। ॥ ৭৬ ॥

আহার সমাপ্ত করিয়া মহাকারুণিক শাস্তা উপস্থিত সকলকে ধর্মদেশনা করিলেন। তারপর প্রভু আসন হইতে উঠিয়া, পদব্রজে, ভূমিতে স্বীয় পদচিহ্ন রাখিয়া, ভিক্ষুসংঘসহ সুমনকূট পর্বত অভিমুখে চলিলেন। ॥ ৭৭ ॥

উক্ত পর্বতের পাদদেশে সমস্ত দিন ইচ্ছানুযায়ী অতিবাহিত করিয়া শাস্তা ভিক্ষুসংঘসহ 'দীঘভাপি'[২২] অভিমুখে চলিলেন। ॥ ৭৮ ॥

দীঘভাপিতে পৌঁছিয়া শাস্তা ভিক্ষুসংঘসহ ভবিষ্যতের চৈত্য স্থলে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এইরূপে সেই স্থানটি শাস্তার স্মৃতিতে পবিত্র হইল। ॥ ৭৯ ॥

অতঃপর শাস্তার ধ্যান সমাপ্ত হইলে, কোন্ স্থান গমনোযোগী এবং কোন্ স্থান গমনোযোগী নয় স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, শাস্তা আসন ত্যাগপূর্বক ভিক্ষু-

সঙ্ঘসহ পরবর্তীকালের 'মহামেঘবনারাম'[২৩]-এ গিয়া উপস্থিত হইলেন।
॥ ৮০-৮১ ॥

শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘসহ যেই স্থানে উপবেশন করিলেন, সেই পবিত্র পুণ্য-স্মৃতি বিজরিত স্থানে পরে পবিত্র বোধিবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শাস্তা যেই স্থানে ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, সেই বিশেষ স্থানে পরে একটি বিশাল স্তূপ[২৪] নির্মাণ করা হয়। পরে সেইস্থানে 'থূপারাম[২৫] চৈত্য' স্থাপন করা হয়।
॥ ৮২ ॥

ধ্যান সমাপ্ত হইলে শাস্তা আসন ত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘসহ যেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে সেই স্মৃতিতে পরে 'শিলাচৈত্য'[২৬] নির্মিত হয়। ॥ ৮৩ ॥

সঙ্ঘনায়ক বুদ্ধ সেই স্থলে বহু দেবতাদের সমাবেশে বুদ্ধত্বে প্রাপ্ত ধর্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া এবং দেবতাদের নানা উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন[২৭]। ॥ ৮৪ ॥

'তথাগতের লঙ্কাদ্বীপে আগমন' সমাপ্ত

এইখানে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল, 'তথাগতের লঙ্কাদ্বীপে আগমন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. কপিলাবস্তুর শাক্য বংশ।

২. লোকমুখে প্রচলিত কাল্পনিক কাহিনী।

৩. গোতমবুদ্ধকে বলা হয়েছে।

৪. চব্বিশজন কাল্পনিক পূর্বতন বুদ্ধ : দীপঙ্কর, কোন্ডনঞ্ঞ, মঙ্গল, সুমন, রেভত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদুম, নারদ, পদুমুত্তর, সুমেধ, সুজাত, পিয়দর্শী, অট্ঠদর্শী, ধম্মদর্শী, সিদ্ধত্ত, তিষ্য, ফুষ্য, বিপস্সী, শিখী, ভেসসভু, ককুসন্দ, কোনাগম, কশ্যপ।

৫. দশ পারামি হলো, বুদ্ধত্বলাভের জন্য যেই সকল গুণ প্রাপ্য হতে হয়। পারামির কথা কোন বৌদ্ধ নিকায় গ্রন্থে নেই। এটা মহাযানী সংযোজন। ধর্মপালের 'চরিয়াপিটক অট্ঠকথায়' পারামির কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধত্বলাভের জন্য বোধিসত্ত্বকে নানা জন্মে দশটি বিশেষ গুণে সমৃদ্ধ হতে হয়, বলেন মহাযানীরা। খুব সম্ভবত, এতে জৈন

ধর্মের নীতি কিছুটা মিশে রয়েছে। মহাযানী গ্রন্থ 'অবদান-কল্পলতা'র কিছু কাহিনীতে যথা, শিবি, সসু, মৎস্য, রুরু, সুতসোম ও ভট্টপোতক এবং জাতক গ্রন্থের 'মহাগোবিন্দচরিয় জাতক' ও 'বানর জাতকে' পারামির উল্লেখ রয়েছে। **Rhys Davids**-এর **'Buddhist India'** (**P. 177**), **B. C. Law**-এর **'Concepts of Buddhism'** (**Ch. II**) এবং **Kern**-এর **'Manual of Indian Buddhism'** (**P. 20 & 66**)-এ এই বিষয়ের বিরূপ সমালোচনা রয়েছে।

৬. বুদ্ধত্বলাভ।

৭. বুদ্ধ ধর্মচক্রপ্রবর্তন (প্রথম ধর্মপ্রচার) করেন ঋষিপত্তনে বা সারনাথে, বারাণসীতে নয়।

৮. মূলে 'জটিলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ হলো জটাধারী সন্ন্যাসী।

৯. উত্তর ভারতের একটি অঞ্চল।

১০. হিমালয় পর্বতের একটি হ্রদের প্রাচীন নাম।

১১. বুদ্ধের সময়ে চন্দ্রবৎসর ছিল এইরূপ ঃ

(i) চিত্ত—ফেব্রুয়ারী, মার্চ
(ii) বেশাখ—মার্চ, এপ্রিল
(iii) জেট্‌ঠ—এপ্রিল, মে
(iv) আসাল—মে, জুন
(v) সাবন—জুন, জুলাই
(vi) পোট্‌ঠপাদ—জুলাই, আগষ্ট
(vii) অস্‌সযুজ—আগষ্ট, সেপ্টেম্বর
(viii) কত্তিক—সেপ্টেম্বর, অক্টোবর
(ix) মগ্‌গসির—অক্টোবর, নভেম্বর
(x) ফুস্‌স—নভেম্বর, ডিসেম্বর
(xi) মাঘ—ডিসেম্বর, জানুয়ারী
(xii) ফাল্গুন—জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী।

১২. পুরাণে কুবেরের অনুচরদের যক্ষ বলা হয়েছে। এখানে পিশাচকে যক্ষ বলা হয়েছে।

১৩. প্রাচীন শ্রীলংকার 'মহাওয়েলিগঙ্গা' নদীর তীরে ছিল এই বন।

১৪. প্রাচীন শ্রীলংকার পার্বত্য অঞ্চল সমৃদ্ধ একটি দ্বীপ।

১৫. শ্রীলংকার **Adam's Peak** পর্বত।

১৬. শ্রীলংকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল।

১৭. এক প্রজাতির গাছ—খুব সম্ভবত 'Buchanania Latifolia'.

১৮. গৌতম বুদ্ধ।

১৯. শ্রীলংকার কইলনি নদী। নদীটি কলম্বোর কাছে সাগরে গিয়ে মিশেছে।

২০. গৌতম বুদ্ধ।

২১. উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য।

২২. খুব সম্ভবত শ্রীলংকার পূর্ব প্রদেশের 'কাণ্ডিয়কটটু' পুষ্করিণী। এইটি বাত্তিকলোয়া থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। প্রাচীন-কালে এই পুষ্করিণীর কাছে একটি বিরাট চৈত্য ছিল বলা হয়।

২৩. শ্রীলংকার প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরের দক্ষিণে ছিল এই 'মহামেঘবন' উদ্যান। রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য এই উদ্যানটি বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে বিশ্রামের জন্য দান করেন বলা হয়।

২৪. অনুরাধাপুরের বিশাল 'রুয়ানওয়ালি' চৈত্য।

২৫. অনুরাধাপুরের বৌদ্ধ মন্দির।

২৬. অনুরাধাপুরের শিলাচৈত্য।

২৭. গৌতমবুদ্ধ কোন কালে শ্রীলংকায় যাননি। কাহিনীটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

২

রাজা মহাসম্মত-এর বংশ

রাজা মহাসম্মত-এর বংশ হইতে উদ্ভূত হইলেন এই মহাঋষি[১]। আদিতে এই জগতের প্রথম রাজা হইলেন রাজা মহাসম্মত। তাঁহার পর রাজা হইলেন রাজা রোজ, বররোজ, কল্যাণ, বড়কল্যাণ এবং উপোসথ ও রাজা মান্ধাতা। ॥ ১-২ ॥

তারপর রাজা হইলেন চরক, উপচরক, চেতিয়, মুচল, মহামুচল, মুচলিন্দ, সাগর ও সাগরদেব। ॥ ৩ ॥

উঁহাদের পরের রাজারা হইলেন ভরত, অঙ্গিরস, রুচি, সুরুচি, পতাপ, মহাপতাপ, পনাদ, মহাপনাদ, সুদর্শন, মহাসুদর্শন, নেরু, মহানেরু ও অচ্চিমা। ॥ ৪-৫ ॥

উক্ত আটাশজন দীর্ঘজীবী রাজাগণ, তাঁহাদের দীর্ঘজীবী পুত্র ও পৌত্রগণ কুশাবতী[২], রাজগৃহ ও মিথিলায়[৩] বাস করিতেন। ॥ ৬-৭ ॥

উক্ত রাজাগণের পর[৪] ছাপান্ন জন রাজা হইলেন। তারপর ষাটজন রাজা হইলেন। তারপর চুরাশি হাজার জন রাজা হইলেন। তারপর ছত্রিশজন রাজা হইলেন। তারপর বত্রিশজন রাজা হইলেন। তারপর আটাশজন রাজা হইলেন। তারপর আরও আটাশজন রাজা হইলেন। তারপর আঠারোজন রাজা হইলেন। তারপর সতেরোজন রাজা হইলেন। তারপর পনেরোজন রাজা হইলেন। তারপর চৌদ্দজন রাজা হইলেন। তারপর নয়জন রাজা হইলেন। তারপর সাতজন রাজা হইলেন। তারপর বারোজন রাজা হইলেন। তারপর পঁচিশজন রাজা হইলেন। তারপর আরও পঁচিশজন রাজা হইলেন। তারপর বারোজন রাজা হইলেন। তারপর আরও বারোজন রাজা হইলেন। তারপর নয়জন রাজা হইলেন। তারপর চুরাশি হাজারজন রাজা হইলেন (এই গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম রাজা ছিলেন রাজা মখাদেব)। তারপর আবার চুরাশি হাজারজন রাজা হইলেন (এই গোষ্ঠীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রাজা 'কলারজনক')। তারপর ষোলজন রাজা হইলেন (এই গোষ্ঠীর শেষ রাজা ছিলেন রাজা ইক্ষ্বাকু)।

রাজা মহাসম্মতের উক্ত উত্তরাধিকারীগণ এইরূপে নানা দলে দলে তাঁহাদের স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজত্ব করেন। ॥ ৮-১১ ॥

রাজা ইক্ষ্বাকুর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন যুবরাজ ইক্ষ্বামুখ। আর নিপুণ, চন্দিমা, চন্দমুখ, শিবিসঞ্জয়, মহারাজ বেসসান্তর, জালি, সীহবাহন, সীহস্‌সর প্রভৃতিরা ছিলেন রাজা ইক্ষ্বাকুর অন্যান্য পুত্র ও পৌত্রগণ।

রাজা সীহস্সরের ছিল বিরাশি হাজার যুবরাজ ও পৌত্রগণ। রাজা জয়সেন ছিলেন সকলের কনিষ্ঠ।

এই সকল পুত্র ও পৌত্রগণ ছিলেন কপিলাবস্তুর[৫] শাক্য রাজাগণ। মহারাজ সীহহনু ছিলেন রাজা জয়সেনের পুত্র। রাজকুমারী যশোধরা ছিলেন রাজা জয়সেনের কন্যা। ॥ ১২-১৬ ॥

দেবদহে[৬] দেবদহ-শাক্য[৭] নামক এক যুবরাজ ছিলেন। তাঁহার অঞ্জন ও কচ্চানা নামক এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কচ্চানা ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা সীহহনুর রাজমহিষী। আর অঞ্জন-শাক্যের স্ত্রী ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা জয়সেনের কন্যা রাজকুমারী যশোধরা।

দেবদহ-শাক্য যুবরাজের পুত্র অঞ্জন-শাক্যের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রেরা হইলেন, দণ্ডপানি ও সুপ্পবুদ্ধ-শাক্য। কন্যারা হইলেন, মায়া ও পজাপতী[৮]।

কপিলাবস্তুর রাজা সীহহনুর ছিল পাঁচপুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রেরা হইলেন, যুবরাজ শুদ্ধদন, ধোতদন, শক্য, শুক্য ও অমিতদন। আর কন্যারা হইলেন, অমিতা ও পমিতা। ॥ ১৭-২০ ॥

দেবদহের সুপ্পবুদ্ধ-শাক্যের রাণী ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজকন্যা অমিতা। তাঁহাদের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। পুত্র হইলেন দেবদত্ত[৯]; আর কন্যা হইলেন ভদ্দকচ্চানা।

দেবদহের অঞ্জন-শাক্যের কন্যাদ্বয়, মায়া ও পজাপতী ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা সীহহনুর যুবরাজ শুদ্ধদনের স্ত্রী (শুদ্ধদন পরে রাজা হন)। আর রাজা শুদ্ধদন ও মায়াদেবীর পুত্র হইলেন সেই বীর শ্রেষ্ঠ[১০] মহাঋষি। ॥ ২১-২২ ॥

রাজা মহাসম্মতের এই অবিচ্ছিন্ন বংশে মহাঋষির জন্ম। তিনি ছিলেন বংশের সকল রাজাদের ঊর্ধ্বে। বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের স্ত্রী ছিলেন দেবদহের সুপ্পবুদ্ধ-শাক্য ও তাঁহার স্ত্রী অমিতার কন্যা ভদ্দকচ্চানা[১১]। সিদ্ধার্থের পুত্র হইলেন রাহুল। ॥ ২৩-২৪ ॥

রাজা বিম্বিসার ছিলেন কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থের বন্ধু[১২]। তাঁহাদের উভয়ের পিতারাও[১৩] বন্ধু ছিলেন। বয়সে সিদ্ধার্থ রাজা বিম্বিসার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

সিদ্ধার্থ বোধিসত্ত্ব উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বুদ্ধত্বলাভ করিয়া রাজা বিম্বিসারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ॥ ২৫-২৭ ॥

পুণ্যবান রাজা বিম্বিসারকে তাঁহার পিতা পনেরো বৎসর বয়সে রাজা-রূপে অভিষিক্ত[১৪] করেন। অতঃপর তাঁহার রাজত্বের ষোড়শ বর্ষে শাস্তা

তাঁহাকে ধর্মে দীক্ষা প্রদান করেন। ॥ ২৮-২৯ ॥

রাজা বিম্বিসার বাহান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। বীরশ্রেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে[১৫] তাঁহার পনেরো বৎসর রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়। বাকি সাঁইত্রিশ বৎসর তিনি তথাগতের জীবদ্দশায় রাজত্ব করেন। ॥ ৩০ ॥

রাজা বিম্বিসারের নির্বোধ পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়া বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে মহামুনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তারপরও রাজা অজাতশত্রু চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩১-৩২ ॥

তথাগত ছিলেন সকল গুণের ঊর্ধ্বে। অনিত্যতার শক্তি জ্ঞাত হইয়া তিনি উহার কবল হইতে মুক্ত হন।

যিনি এই ভীতিপ্রদ অনিত্যতা হইতে মুক্তির ভাবনায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহার দুঃখের অন্ত হইবে। ॥ ৩৩ ॥

'রাজা মহাসম্মত-এর বংশ' সমাপ্ত

এইখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'রাজা মহাসমমত-এর বংশ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. গৌতম বুদ্ধ।
২. প্রাচীন কুশীনগরের আর এক নাম।
৩. প্রাচীন বিদেহ রাজ্য, বর্তমানের 'তিরহুত' অঞ্চল।
৪. রাজা অচ্চিমার পর রাজা ইক্ষ্বাকু অবধি বংশ তালিকা।
৫. বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত 'তিলউরা-কোট' অঞ্চল।
৬. প্রাচীন কপিলাবস্তু থেকে পনেরো মাইলেরও অধিক উত্তরে ছিল দেবদহ নগর। এটা ছিল শাক্যদের বাণিজ্য কেন্দ্র।
৭. ইনি কোন্ রাজার যুবরাজ ছিলেন তার উল্লেখ নেই।
৮. এঁনার নাম ছিল গৌতমি। পজাপতী ওঁনার নাম নয়।
৯, মহাবংশ-এ দেবদত্তকে সিদ্ধার্থের শ্যালক বলা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থে দেবদত্তকে সিদ্ধার্থের দূর সম্পর্কের ভাই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ওঁনার আবাসস্থলও ছিল কপিলাবস্তুতে। শ্যালক হলে ওঁনার আবাসস্থল হয় দেবদহ নগরে। আবার চুল্লবগ্গে দেবদত্তকে

সিদ্ধার্থের আত্মীয় বলা হয়েছে। কীরূপ আত্মীয় তার উল্লেখ নাই। দেবদত্তের আসল পরিচয়টা আজও সঠিক জানা যায়নি।

১০. গৌতম বুদ্ধ।

১১. ভদ্দকচ্চানা ছিলেন দেবদহের সুপ্পবুদ্ধ-শাক্যের মেয়ে। সেই হিসাবে উনি হলেন সিদ্ধার্থের মামাতো বোন বা মামার মেয়ে। আবার ভদ্দকচ্চানা ছিলেন রাজকন্যা অমিতার মেয়ে। সেই হিসাবে উনি হলেন সিদ্ধার্থের পিসীর মেয়ে। শাক্যরা রক্তের শুদ্ধতা রক্ষা করতে নিজেদের মধ্যে বিয়ে করতেন।

১২. রাজা বিম্বিসার পরে গৌতমবুদ্ধের গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। যদিও রাজার সঙ্গে বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে সিদ্ধার্থের সাক্ষাৎ হয়েছিল (সুত্তনিপাত গ্রন্থের 'পব্বজ্জা সুত্ত' দ্রষ্টব্য), কিন্তু সেটা তখন মোটেও বন্ধুত্বে পরিণত হয়নি।

১৩. কথাটা মোটেও ইতিহাস সিদ্ধ নয়।

১৪. ঐতিহাসিকরা কিন্তু তা বলেন না। রাজা বিম্বিসার বারহদ্রথ'দের গদিচ্যুত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন, অনুমান খ্রিঃ পূর্ব ৫৪২ অব্দে। তারপর তিনি 'হরইয়ংক' বংশের গোড়াপত্তন করেন। ইতিহাসে বিম্বিসারের পিতার কোন উল্লেখ নেই। রাজা বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে বসেন সিদ্ধার্থের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর।

১৫. ইতিহাস বলে, রাজা বিম্বিসারের রাজত্বের চতুর্থবর্ষে সিদ্ধার্থের সঙ্গে রাজার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন খ্রিঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে। তারপর তিনি রাজগৃহে আসেন এবং রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রাজা বিম্বিসারের রাজত্বের দশমবর্ষে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভ করেন এবং রাজাকে ধর্মে দীক্ষা দেন। 'মহাবংশে' প্রদত্ত সন তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিতর্ক রয়েছে।

৩

প্রথম মহা ধর্মসম্মেলন

চুরাশি বৎসর বয়সে[১], সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া, পঞ্চচক্ষু[২] বিশিষ্ট অদ্বিতীয় বিজয়ীবীর[৩] বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে কুশীনারায়, যুগল শালবৃক্ষের মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সেইদিন জগতের আলো নিভিয়া গেল। ॥ ১-২ ॥

অগণন ভিক্ষু, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও দেবতাগণ সেই স্থানে সমবেত হইলেন। সাতশত হাজার প্রধান ভিক্ষুগণ সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষু মহাকশ্যপ ছিলেন তখন উক্ত ভিক্ষুগণের প্রধান। ॥ ৩-৪ ॥

দশবলধারী[৪] শাস্তার মরদেহের যে সম্ভ্রম, আচার-অনুষ্ঠান প্রাপ্য, সেইরূপ তাঁহার পবিত্র পূতাস্থির প্রতিও সাতদিন ধরিয়া ভিক্ষু মহাকশ্যপ যথোচিত সম্ভ্রম ও আচার-অনুষ্ঠান করিলেন। ॥ ৫-৬ ॥

অতঃপর তিনি শাস্তার ধর্মকে দীর্ঘদিন স্থায়ী করিবার মানসে বর্ষীয়ান[৫] ভিক্ষু সুভদ্দর অশুভ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভাবিলেন, শাস্তা তাঁহার অঙ্গের পবিত্র চীবর কেবল তাঁহাকেই প্রদান[৬] করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মকে দীর্ঘদিন স্থায়ী করিবার গূঢ় দায়ীত্বও বুঝি শাস্তা এইভাবে তাঁহাকেই অর্পণ করিয়াছেন। অতএব, সেই কারণে শাস্তার পবিত্র ধর্মনীতিসকল একত্রে সংকলন করা দরকার। ইহাতে নিশ্চয়ই সম্যকসম্বুদ্ধের সম্মতি রহিয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের সঠিক ধর্ম অবশ্যই দীর্ঘদিন শুদ্ধ ও স্থায়ী থাকিবে।

॥ ৭-৮ ॥

ভিক্ষু মহাকশ্যপ এই উদ্দেশ্যে পাঁচশত খ্যাতনামা অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদিগকে বাছিয়া এই কর্মে নিয়োগ করিলেন। এই সকল ভিক্ষুগণের শাস্তার নবাঙ্গ শাসন[৭] কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু তবু ভিক্ষু আনন্দ না থাকিলে এই কর্ম অপূর্ণই থাকিবে। ভিক্ষু আনন্দকে সেই কারণে এই কর্মে যুক্ত থাকিতে বারবার অনুরোধ করা হইল। ভিক্ষু আনন্দ অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণের অনুরোধে তাঁহাদের উক্ত উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলেন। কারণ, বুদ্ধের কথিত ধর্মনীতিসকল শুদ্ধভাবে একত্রে সংকলন করা ভিক্ষু আনন্দের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। ॥ ৯-১০ ॥

ইতিমধ্যে অর্ধমাস অতিবাহিত হইয়াছিল। শাস্তার মরদেহের সম্মান প্রদর্শন ও দাহ সম্পন্ন করিতে সাতদিন অতিবাহিত হইল। তারপর তাঁহার পবিত্র পূতাস্থির যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানে উক্ত ভিক্ষুগণ আরেও সাতদিন অতিবাহিত করিলেন। ॥ ১১ ॥

অতঃপর ভিক্ষুগণ স্থির করিলেন যে তাঁহারা বর্ষা ঋতুতে রাজগৃহে অবস্থানকালে সম্যকসম্বুদ্ধের অনুশাসনগুলি সংকলন করিবেন। ভিক্ষু মহাকশ্যপের বাছাই করা পাঁচশত খ্যাতনামা অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু এবং ভিক্ষু আনন্দ ব্যতীত আর কোন ভিক্ষুর সেই ধর্মসভায় প্রবেশাধিকার থাকিবে না। ॥ ১২ ॥

উক্ত ভিক্ষুগণ সমস্ত জম্বুদ্বীপ[৮] পরিভ্রমণ করিয়া নানা স্থানের শোকাতুর জনগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মঙ্গলদায়ী ধর্মের দীর্ঘস্থায়িত্বে অভিলাষী হইয়া আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই নগরে ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয় বিষয়ের[৯] কোন অভাব হইবার নয়।

॥ ১৩-১৪ ॥

ভিক্ষু মহাকশ্যপের নেতৃত্বে সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম-জ্ঞাত, সর্বগুণান্বিত উক্ত ভিক্ষুগণ বর্ষাবাসের জন্য রাজগৃহ নগরে উপস্থিত হইলেন। বর্ষা ঋতুর প্রথম মাসে তাঁহারা নিজেদের আবাসস্থলের সংস্কার[১০] করিলেন।

॥ ১৫-১৬ ॥

আবাসস্থলের সংস্কার করিয়া ভিক্ষুগণ রাজা অজাতশত্রুকে বলিলেন, 'হে রাজন! আমরা রাজগৃহে মহাধর্মসম্মেলন করিতে ইচ্ছুক।' ইহা শুনিয়া রাজা প্রীত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে! ইহা উত্তম প্রস্তাব। এইজন্য আমাকে কী করিতে হইবে, কৃপা করিয়া নির্দেশ দিন।' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'হে রাজন! এই মহাসম্মেলনের জন্য একটি বিশেষ স্থানে সুব্যবস্থা করিয়া দিন।' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! সেই স্থানটি কোথায় হওয়া উচিত?'

ভিক্ষুগণ তখন রাজাকে সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন।

অতঃপর রাজা অজাতশত্রু সেই স্থানে, বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণ গুহার প্রবেশস্থলে[১১], অতি শীঘ্র একটি সুরম্য, দেব ব্যবহার যোগ্য, সুবৃহৎ সভাগৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন। নানাভাবে সভাগৃহটিকে সুশোভিত করিয়া, ভিক্ষুগণের সেই ধর্মসম্মেলনে উপস্থিতির সংখ্যা জ্ঞাত হইয়া, রাজা তাঁহাদের উপবেশনের জন্য সভাকক্ষে মূল্যবান মাদুরের আসন বিছাইয়া দিলেন। ॥ ১৭-২০ ॥

সভাকক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে উত্তরমুখী একটি উচ্চ আসন সভাপতি-ভিক্ষুর জন্য স্থাপন করা হইল। সভাকক্ষের মধ্যস্থলে পূর্বমুখী একটি উচ্চ আসন আবৃত্তিকার ভিক্ষুর জন্য স্থাপন করা হইল। ॥ ২১-২২ ॥

অতঃপর রাজা অজাতশত্রু ভিক্ষুসকলকে বলিলেন, 'হে ভন্তে! আমার কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে। নির্দেশ মান্য করা হইয়াছে। নির্মিত সভাগৃহে আপনারা এইবার ধর্মসম্মেলন করিতে পারিবেন।'

ভিক্ষুগণ রাজার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'হে রাজন! তবে আগামীকল্য হইতেই উক্ত সভাগৃহে মহাধর্মসভা বসিবে।'

তখন ভিক্ষু আনন্দকে উপস্থিত এক ভিক্ষু বলিলেন, 'হে ভিক্ষু আনন্দ! অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণের সহিত একত্রে বসিবার যোগ্যতা আপনার নাই, কারণ আপনি এখনও সেই পরমপ্রাপ্তির অনুশীলনে রহিয়াছেন। আপনি সেই পরমপ্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হউন।'

ইহা শুনিয়া ভিক্ষু আনন্দ দ্বিগুণ প্রচেষ্টায়, কোনরূপ বিশেষ প্রকার ধ্যান অনুশীলন না করিয়া, অতি শীঘ্র অর্হত্বলাভ করিলেন। ॥ ২৩-২৫ ॥

অতঃপর বর্ষা ঋতুর দ্বিতীয় মাসের[১২] দ্বিতীয় দিবসে উক্ত পাঁচশত খ্যাতনামা অর্হত ভিক্ষুগণ রাজা অজাতশত্রুর নির্মিত সুরম্য সভাগৃহের সভাকক্ষে সমবেত হইলেন। পদ-মর্যাদা অনুসারে ভিক্ষুগণ বিছানো আসনগুলির উপর পর পর উপবেশন করিলেন। কিন্তু ভিক্ষু আনন্দের আসনটি শূন্য রহিল। তিনি স্বীয় অর্হতপ্রাপ্তি সভায় প্রকাশ করিতে সকল ভিক্ষুগণের সহিত সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন না। ॥ ২৬-২৮ ॥

ভিক্ষু আনন্দের আসন শূন্য দেখিয়া সভার একজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিলেন, 'ভন্তে! ভিক্ষু আনন্দ কোথায়?'

ভিক্ষু এই কথা বলিবামাত্র, ভিক্ষু আনন্দ বিদ্যুত তরঙ্গের ন্যায় মুহূর্তে সভাকক্ষে তাহার শূন্য আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ঋদ্ধিবলে তিনি যেন ভূমি ভেদ করিয়া বা বাতাসে ভর করিয়া সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুগণ ইহা দেখিয়া বুঝিলেন যে ভিক্ষু আনন্দ অর্হত্বপ্রাপ্ত[১৩] হইয়াছেন। ॥ ২৯ ॥

ধর্মসভা শুরু হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ সকলে একমত হইয়া ভিক্ষু উপালিকে 'বিনয়'[১৪] আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ভিক্ষু আনন্দকে বাকি 'ধর্ম'[১৫] আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। এই দুই ভিক্ষুকে সভার ভিক্ষুগণ এই দুই উদ্দেশ্যে বাছিয়া লইলেন। ভিক্ষু মহাকশ্যপ বিনয় ও ধর্ম সম্বন্ধে ভিক্ষু উপালি ও ভিক্ষু আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিবার গুরুদায়িত্ব[১৬] গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু উপালি ও আনন্দ প্রদত্ত বিষয় সম্বন্ধে বলিতে স্বীকৃত হইলেন। ॥ ৩০-৩১ ॥

ভিক্ষু মহাকশ্যপ সভাকক্ষের দক্ষিণ দিকে স্থাপিত স্বীয় উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভিক্ষু উপালিকে 'বিনয়' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু উপালি স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া সভাকক্ষের মধ্যস্থলের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া 'বিনয়' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

সভায় উপস্থিত সকল ভিক্ষুগণ ভিক্ষু উপালির আবৃত্তি করা পরিচ্ছেদগুলি পুনরায় সমস্বরে আবৃত্তি করিলেন। এইরূপে ভিক্ষু উপালির 'বিনয়'-এর প্রতি দফা আবৃত্তি সভাস্থ ভিক্ষুগণ পুনরায় সমস্বরে দফায় দফায় আবৃত্তি করিলেন। ॥ ৩২-৩৩ ॥

অতঃপর মহাঋষির[১৭] সর্বক্ষণের সহচর, যিনি তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমৃত বচন সকলের অধিক শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি তাঁহার ধর্ম-রত্নাগারের কোষাধ্যক্ষ স্বরূপ[১৮], সেই ভিক্ষু আনন্দকে 'ধর্ম' সম্বন্ধে জানাইতে সভাপতি ভিক্ষু মহাকশ্যপ অনুরোধ করিলেন।

'বিনয়' আবৃত্তি সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষু উপালি সভাকক্ষের মধ্যস্থলের উচ্চ আসন হইতে উঠিয়া সভাকক্ষের স্বীয় আসনে গিয়া উপবেশন করিলে, ভিক্ষু আনন্দ সভাকক্ষের নিজ আসন হইতে উঠিয়া সভাকক্ষের মধ্যস্থলের উচ্চ আসনে গিয়া উপবেশন করিয়া শাস্তার ধর্মসকল সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিলেন। সভাস্থ সকল ভিক্ষুগণ প্রথানুসারে বৈদেহি মহর্ষি'র[১৯] প্রতি দফা আবৃত্তি পুনরায় সমস্বরে দফায় দফায় আবৃত্তি করিলেন। ॥৩৪-৩৬ ॥

জগৎ-এর দুঃখমুক্তিকামী উক্ত অর্হত ভিক্ষুগণ এইভাবে সাত মাস প্রতিদিন অধিবেশন করিয়া তথাগতের প্রদত্ত ধর্ম ও বিনয় সংকলন করিলেন। 'এখন তথাগতের ধর্ম আরও পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হইবে', এইরূপ ভাবিয়া ভিক্ষু মহাকশ্যপ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ॥ ৩৭-৩৯ ॥

উক্ত মহা ধর্মসভা সমাপ্ত হইলে সসাগরা পৃথিবী ছয়বার প্রকম্পিত হইল এবং নানা শুভ নিদর্শন নানাভাবে জগৎ-এ উদয় হইল। ॥ ৪০ ॥

মহাস্থবিরগণের দ্বারা সংকলিত বলিয়া ইহাকে 'স্থবিরবাদ' বলা হইল। যেই সকল ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রথম মহা ধর্মসম্মেলন[২০] করিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাকালে আয়ু সমাপনে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৪১ ॥

জ্ঞানের আলোয় যাঁহারা জগৎ-এর অন্ধকার দূর করিলেন, সেই সকল উজ্জ্বল দীপ্তিময় তামসহরা ভিক্ষুগণ একসময় মৃত্যুর ঝঞ্ঝায় স্বয়ং নির্বাপিত হইলেন। জ্ঞানীগণ ইহা জ্ঞাত হইয়াও কি জীবনের ভোগানন্দ পরিত্যাগ করিবেন না? ॥ ৪২ ॥

প্রথম মহা ধর্মসম্মেলন সমাপ্ত

এইখানে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল, 'প্রথম মহা ধর্মসম্মেলন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. ইতিহাস বলে বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন আশী বৎসর বয়সে। দীঘনিকায়ের 'মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত'-এও তাই রয়েছে। বুদ্ধের জন্ম খ্রিঃ পূঃ ৫৬৭ অব্দে, আর পরিনির্ব্বাণ খ্রিঃ পূঃ ৪৮৭ অব্দে।

২. পঞ্চচক্ষু হলো, মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, সর্বজ্ঞচক্ষু ও বোধিচক্ষু।

৩. গৌতম বুদ্ধ। মা'রকে জয় করেছিলেন তিনি।

৪. সম্যকসম্বুদ্ধের দশবল হচ্ছে, সম্ভব ও অসম্ভব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মবিপাকের হেতু জ্ঞান; সর্বসত্ত্বের হিতকর মার্গ জ্ঞান; নানা স্বভাব মুক্তির জ্ঞান; অন্য সত্ত্বগণের ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা ও দুর্বলতার জ্ঞান; ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির মলিনতা ও শুদ্ধতার জ্ঞান; ইন্দ্রিয়াতীত শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান; পূর্বজন্মের স্মৃতি জ্ঞান; আসব মুক্ত, প্রজ্ঞা ও চিত্ত মুক্ত অবস্থান; পরম জ্ঞানপ্রাপ্ত ও সর্বজ্ঞ।

৫. বৃদ্ধ বয়সে এই ভিক্ষু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

৬. এই ঘটনা ইতিহাস সিদ্ধ নয়।

৭. সুত্ত, গাথা, গীত, ব্যাকরণ, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অদ্ভুত ধর্ম ও বেদল্প। একসময় বুদ্ধের ধর্ম এই নয় ভাগে নাকি বিভক্ত ছিল। এটা মহাযানী উক্তি।

৮. প্রাচীন ভারতবর্ষ।

৯. এটাকে চার পচ্চয়া বলা হয়। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, চীবর, ভিক্ষান্ন, আবাসস্থল ও ঔষধ।

১০. জীর্ণ সংস্কার বা মেরামত করা।

১১. সপ্তপর্ণি গুহার সামনের চাতালে এই সভাগৃহটি ছিল বলা হয়েছে। চাতালের চারধারে পাথরের পাঁচিল দিয়ে হলঘরটি তৈরী হয়েছিল। পাঁচিলের কিছুটা ভগ্নাবশেষ এখনো রয়েছে।

১২. শ্রাবণ মাস। দেখা যাচ্ছে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের চতুর্থ মাসে এই ধর্ম সম্মেলনটি হয়। কিন্তু ইতিহাসে পাই এই প্রথম মহাধর্ম সম্মেলনটি হয়েছিল বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ছ'মাস পরে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে বা তারও পরে।

১৩. প্রবাদ আছে অর্হত্বপ্রাপ্তরা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হয়।

১৪. বিনয়পিটক।

১৫. সুত্তপিটক।

১৬. আবৃত্তিতে কিছু বাদ পড়ে গেলে মনে করিয়ে দেওয়া বা প্রশ্ন করে জানা কিছু বাদ পড়েছে কি না।

১৭. গৌতম বুদ্ধ।

১৮. বুদ্ধের ব্যক্ত করা বাণীর ভাণ্ডার বা সঠিক ধর্মের ভাণ্ডার ছিলেন ভিক্ষু আনন্দ।

১৯. ভিক্ষু আনন্দ কপিলাবস্তুর বাসিন্দা ছিলেন। কোশলের অন্তর্গত এই রাজ্য। তাই ভিক্ষু আনন্দকে বৈদেহ মহর্ষি বলা হয়েছে।

২০. বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গে এই সম্মেলনের কথা রয়েছে।

৪

দ্বিতীয় মহা ধর্মসম্মেলন

পিতৃহন্তা অজাতশত্রুর রাজত্বের ষোড়শ বর্ষে তাঁহার পুত্র উদয়ভদ্দ[১] তাঁহাকে হত্যা করেন। আবার উদয়ভদ্দের পুত্র অনুরুদ্ধ[২] তাঁহার পিতা উদয়ভদ্দকে হত্যা করেন। আবার অনুরুদ্ধের পুত্র মুণ্ড অনুরূপভাবে তাঁহার পিতা অনুরুদ্ধকে হত্যা করেন। এই দুই পিতৃহন্তা মূর্খ রাজারা আট বৎসর রাজ্যশাসন করেন। ॥ ১-৩ ॥

মুণ্ড-এর পুত্র নাগদাসও তাঁহার পিতা মুণ্ডকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই পাপী চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ৪ ॥

সিংহাসনের লোভে রাজবংশের এইরূপ হত্যালীলায় এবং দেশের মানুষদের কোনরূপ মঙ্গল হইতেছে না দেখিয়া রাজ্যবাসীগণ ক্ষুব্ধ হইলেন। তাহারা বলিলেন, 'পাপী পিতৃঘাতক বংশ দেশের কোন উপকারে আসিবে না।' এইরূপ চিন্তায় দেশবাসীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজা নাগদাসকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। উক্ত রাজার মন্ত্রী 'শিশুনাগ' ছিলেন রাজ্যশাসনের যোগ্য ব্যক্তি। ইহা জ্ঞাত হইয়া দেশবাসীগণ একত্রে মন্ত্রণা করিয়া সকলের হিতার্থে উক্ত মন্ত্রী শিশুনাগকে সিংহাসনে বসাইলেন। ॥ ৫-৬ ॥

এই রাজা আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর তাঁহার পুত্র কালাশোক আঠাশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা কালাশোকের রাজত্বের দশম বর্ষে সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনিব্বাণের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। ॥ ৭-৮ ॥

সেই সময় বৈশালীতে বহু বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ সম্যকসম্বুদ্ধ দ্বারা নিষিদ্ধ এবং ভিক্ষুগণের ব্যবহারে অযোগ্য বলা দশটি বিষয়কে[৩] নির্লজ্জের ন্যায় উপযুক্ত এবং ভিক্ষুগণের ব্যবহার যোগ্য বলিয়া প্রচার করিতে-ছিলেন। ॥ ৯-১১ ॥

ব্রাহ্মণ কাকন্ডকু-এর পুত্র, ছয় অভিঞ্ঞা[৪] প্রাপ্ত ভিক্ষু যশ, বজ্জি প্রদেশে বিচরণকালে বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণের উক্ত মতবাদ শুনিয়া বিষয়টির নিষ্পত্তির মানসে সত্বর উক্ত ভিক্ষুগণের 'মহাবন-বিহার'[৫] নামক আবাসস্থলে চলিলেন। ॥ ১২ ॥

সেই বিহারের ভিক্ষুগণ একটি জলপূর্ণ ধাতুর পাত্র বিহারের সভাগৃহে স্থাপন করিয়াছেন। উপাসক-উপাসিকাগণকে সেই পাত্রে কাহাপন[৬] ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুসকল ভিক্ষুগণের জন্য প্রদান করিতে বলিতেছেন।

ভিক্ষু যশ উক্ত বিহারে পৌঁছিয়া বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণের এই কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, 'ইহা বিনয়-সিদ্ধ নয়। ইহা অন্যায়।'

ভিক্ষু যশ এই বলিয়া উপাসক-উপাসিকাদের অর্থ ও মূল্যবান বস্তুসকল দানস্বরূপ ভিক্ষুগণের গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলিলে, বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া এইরূপ কর্মের কারণে উপাসক-উপাসিকাদের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিল। ॥ ১৩-১৪ ॥

ভিক্ষু যশ তখন বিহার হইতে বাহির হইয়া নগর অভিমুখে চলিলেন। বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ তাহাদের একজনকে ভিক্ষু যশকে অনুসরণ করিতে বলিল। ভিক্ষু যশ নগরের উপাসক-উপাসিকাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া বরং বুঝাইতে লাগিলেন যে, বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ যাহা করিতেছে উহা ধর্মনীতি সঙ্গত নয়। মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু দানস্বরূপ ভিক্ষুর গ্রহণ করা বুদ্ধের 'বিনয়' বিরুদ্ধ। অতএব এইরূপ দান ভিক্ষুগণকে প্রদান করিতে তিনি নিষেধ করিলেন। এইরূপ প্রচার করিয়া ভিক্ষু যশ মহাবন-বিহারের স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ১৫ ॥

নগরে গিয়া উপাসক-উপাসিকাদের নিকট ক্ষমা না চাহিয়া বরং ভিক্ষু যশের এইরূপ প্রচারের কথা অনুসরণকারী ভিক্ষুর মুখে শুনিয়া মহাবন-বিহারের বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ বলিলেন যে, ভিক্ষু যশ 'পাচিত্তিয়'[৭] অপরাধ করিয়াছেন। তাহারা ভিক্ষু যশের আবাস-কক্ষ ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে সেই মুহূর্তে বিহার ত্যাগ করিতে বলিল।
॥ ১৬ ॥

ভিক্ষু যশ স্বীয় ঋদ্ধিবলে[৮] কক্ষ হইতে বাহির হইয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশ পথে বজ্জি প্রদেশ হইতে কৌসাম্বিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সত্বর পাবা ও অবন্তিতে অবস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংবাদটি পাঠাইলেন এবং স্বয়ং অহোগংগ[৯] পর্বতে গিয়া তথায় অবস্থিত শাণবাসী[১০] প্রবীন ভিক্ষু সম্ভূতকে সকল কিছু ব্যক্ত করিলেন। ॥ ১৭-১৮ ॥

অতঃপর পাবা হইতে ষাটজন ও অবন্তি হইতে আশীজন অর্হত্বপ্রাপ্ত মহাস্থবির অহোগংগ পর্বতে আসিয়া সমবেত হইলেন। ॥ ১৯ ॥

ইহা ব্যতীত নানা প্রদেশ হইতে মোট নব্বই হাজার ভিক্ষুগণও সেই স্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই সময় ভিক্ষুসংঘের প্রধান ছিলেন 'সোরেয্য'[১১] অঞ্চলের মহাজ্ঞানী, অর্হত ভিক্ষু রেবত। তিনি উক্ত সমাবেশে অনুপস্থিত দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভিক্ষু যশের সহিত তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। ॥ ২০-২১ ॥

মহাজ্ঞানী অর্হত ভিক্ষু রেবত দিব্যশ্রবণ শক্তি দ্বারা ইহা জ্ঞাত হইয়া সত্বর বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ॥ ২২ ॥

নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ভিক্ষু রেবত 'সহজাতি'[১২] নামক স্থানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ভিক্ষু যশ ও অন্যান্য ভিক্ষুগণও সেইস্থানে আসিয়া ভিক্ষু রেবতের সাক্ষাৎ পাইলেন। ॥ ২৩ ॥

প্রবীণ ভিক্ষু সম্ভূতের নির্দেশ মানিয়া ভিক্ষু যশ ভিক্ষুসংঘের প্রধান ভিক্ষু রেবতকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট বুদ্ধের নিষিদ্ধ দশটি বিষয় সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। ভিক্ষু রেবত সেই দশটি বিষয় ভিক্ষু যশকে জ্ঞাত করিয়া উহা ভিক্ষুগণের জন্য নিষিদ্ধ বলিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু যশের নিকট উক্ত দশটি নিষিদ্ধ বিষয় ভিক্ষুগণের গ্রহণযোগ্য বলিয়া বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ বলিতেছে শুনিয়া ভিক্ষু রেবত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, 'বিষয়টির এখনই নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।' ॥ ২৪-২৫ ॥

ধর্মদ্বেষী বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ তাহাদের মতবাদকে ভিক্ষুসংঘের প্রধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে সত্বর তাহারা ভিক্ষু রেবতের সন্ধানে চলিল। শ্রামণ্যের প্রয়োজনীয় বস্তুসকল ভিক্ষুকে ভেট দিয়া তুষ্ট করিতে প্রচুর দান সামগ্রী লইয়া তাহারা 'সহজাতি' অভিমুখে যাত্রা করিল। চলার পথে আহারের সময় তাহাদের সঙ্গে রাখা[১৩] পর্যাপ্ত পরিমাণের সুস্বাদু খাদ্য-সকল তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হৈ-হল্লা করিয়া উপভোগ করিল। ॥ ২৬-২৭ ॥

সাল্হ নামক এক অর্হত ভিক্ষু তখন সহজাতিতে অবস্থান করিতেন। তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে 'পাবা'[১৪] অঞ্চলের ভিক্ষুগণ সঠিক ধর্ম মান্য করিতেছেন। অতঃপর দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উক্ত ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আপনি সঠিক ধর্মে দৃঢ় থাকুন।' ভিক্ষু সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, 'হে দেব! আমি চিরকাল সঠিক ধর্মে দৃঢ় থাকিব!' ॥ ২৮-২৯ ॥

ধর্মদ্বেষী বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ প্রভূত উপহারসকল লইয়া সহজাতিতে গিয়া সংঘপ্রধান ভিক্ষু রেবতের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভিক্ষু রেবতকে উপহার সকল প্রদান করিলে, তিনি সেই উপহার এবং বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণকেও প্রত্যাখ্যান করিলেন। ॥ ৩০ ॥

অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ বৈশালীতে ফিরিয়া গেল। তারপর সেই স্থান হইতে তাহারা পুপ্পপুরে[১৫] গেল। সেইখানে তাহারা রাজা কালাশোককে[১৬] বলিল, 'হে রাজন! আমরা শাস্তার 'মূল-গন্ধকুঠি'[১৭] রক্ষা করিয়া বজ্জি প্রদেশের মহাবন-বিহারে অবস্থান করি। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ভিক্ষুগণ উক্ত বিহারটি নিজেদের জন্য দখল করিবার মানসে

সদলবলে সেই বিহার অধিকার করিতে যাইতেছে। আপনি শীঘ্র উহাদের নিষেধ করুন।' ॥ ৩১-৩৩ ॥

রাজাকে এইভাবে মিথ্যা বলিয়া ভুল নির্দেশ প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া সেই ভিক্ষুগণ বৈশালীতে ফিরিয়া গেল। ॥ ৩৪ ॥

এইদিকে সহজাতিতে এগারো শত ও নব্বই হাজার ভিক্ষুগণ সঙ্ঘপ্রধান ভিক্ষু রেবতের নেতৃত্বে সমবেত হইলেন। তাঁহারা সকলে বিবাদের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে আগ্রহী হইয়া উক্ত স্থানে একত্রিত হইলেন। কিন্তু ভিক্ষু রেবত বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণের অনুপস্থিতিতে, যাহাদের কারণে এই বিবাদের উৎপত্তি, ইহার নিষ্পত্তিতে অনিচ্ছুক হইলেন।

অতঃপর উপস্থিত সকল ভিক্ষুগণ সম্মত হইয়া বৈশালীর পথ ধরিলেন। ॥ ৩৫-৩৬ ॥

মিথ্যায় প্ররোচিত হইয়া রাজা তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়কে মহাবন-বিহারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দেবতাদের কৌশলে তাহারা পথ ভুলিয়া অন্য পথে চালিত হইয়া অন্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। ॥ ৩৭ ॥

সেই রাত্রে রাজা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি 'লোহকুম্ভী' নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভীত সন্ত্রস্ত রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ॥ ৩৮ ॥

রাজার ভগিনী অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী নন্দা তখন ঋদ্ধিবলে বাতাসে ভর করিয়া রাজাকে শান্ত করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, 'তুমি অশুভ কর্ম করিয়াছ। সঠিক ধর্মাবলম্বী মান্যবর ভিক্ষুগণের সহিত তুমি পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন কর। তাঁহাদের পার্শ্বে থাকিয়া ধর্ম রক্ষা কর। এইরূপে তোমার মঙ্গল হইবে।' এই বলিয়া ভিক্ষুণী অন্তর্ধান হইলেন। ॥ ৩৯-৪১ ॥

পরদিন রাজা সত্বর বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাবন-বিহারে পৌঁছিয়া রাজা সেই বিহারে সকল ভিক্ষুগণের এক মহতী সভা করিলেন। উভয় পক্ষের ভিক্ষুগণের বক্তব্য শুনিয়া, সঠিক ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুগণের সহিত পুনরায় সদ্ভাব স্থাপন করিতে, সঠিক সত্যধর্মের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকিতে, রাজা সভার সকল ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'ভন্তে! ধর্মের উন্নতি সাধনে যাহা করণীয় মনে করেন, উহাই করুন।'

অতঃপর রাজা সকল ভিক্ষুগণকে রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ৪২-৪৪ ॥

অতঃপর ভিক্ষুগণ সেই সভায় বিষয়টি লইয়া আলোচনায় বসিলেন। কিন্তু নানা অবান্তর কথায় ভিক্ষুগণ অযথা কালক্ষেপ করিলে সঙ্ঘপ্রধান ভিক্ষু রেবত স্থির করিলেন যে, বাছাই করা কিছু প্রবীণ জ্ঞানী ভিক্ষুগণের

উপর এই বিবাদের মিমাংসার দায়িত্ব দেওয়াই সমীচীন হইবে। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

এইরূপ স্থির করিয়া ভিক্ষু রেবত পূর্ব রাজ্যের চারিজন ভিক্ষু এবং পাবার চারিজন ভিক্ষুকে (মোট আটজন) এই কর্মভার প্রদান করিলেন। পূর্ব রাজ্যের ভিক্ষু সব্বকামী, ভিক্ষু সাল্‌হ, ভিক্ষু খুজ্জশোভিত ও ভিক্ষু বাসবগামীক। এবং পাবর ভিক্ষু রেবত, ভিক্ষু সম্ভূত, ভিক্ষু যশ ও ভিক্ষু সুমন এই গুরুভার সাদরে গ্রহণ করিলেন। ॥ ৪৭-৪৯ ॥

উক্ত আটজন ভিক্ষুগণ সভাস্থল হইতে উঠিয়া শান্ত, নির্জন 'ভালিকারাম'-এ[১৮] গিয়া উপস্থিত হইলেন। অজিত[১৯] নামক এক নবীন ভিক্ষু ভিক্ষুগণের বসিবার জন্য উক্ত স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, মাদুর পাতিয়া মনোরম করিয়া সাজাইয়া দিল। ভিক্ষুগণ সেই রমণীয় স্থানে গিয়া অবস্থান করিলেন। ॥ ৫০-৫১ ॥

সেই স্থানে এই আটজন প্রজ্ঞাবান অর্হত ভিক্ষুগণ একত্রে বসিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহাজ্ঞানী, তার্কিক, ভিক্ষু রেবত সেই দশটি বিতর্কিত বিষয়ের প্রতিটির উপর ভিক্ষু সব্বকামীকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে পর পর বহু প্রশ্ন করিলেন। সেই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া মহাস্থবির ভিক্ষু সব্বকামী স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া বলিলেন, 'ধর্মের প্রচলিত রীতি অনুসারে এই সকল বিনয়-সিদ্ধ নয়।' উপস্থিত অন্য সকল ভিক্ষুগণও ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

॥ ৫২-৫৩ ॥

সর্বসম্মতিতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ভিক্ষুগণ 'ভালিকারাম' ত্যাগ করিয়া মহাবন-বিহারে সমবেত ভিক্ষুগণের মহতী সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা না জানাইয়া তাঁহারা বিতর্কিত বিষয়ের উপর উপস্থিত ভিক্ষুগণকে পুনরায় নানা প্রশ্ন করিলেন। সভায় উপস্থিত জ্ঞানীগুণী, ভিক্ষুগণও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমেত বিতর্কিত বিষয়গুলি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া ধর্মদ্বেষী বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষু-গণের গ্রহণ করা দশটি বিষয়কে বুদ্ধের বিনয় বহির্ভূত এবং ভিক্ষুগণের পরিত্যাজ্য বিষয় বলিয়া রায় দিলেন। ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সঙ্ঘের প্রবীণ ভিক্ষু সব্বকামী সেই সময় তাঁহার উপসম্পদার পর একশত কুড়ি বৎসর ভিক্ষুত্বে অতিবাহিত করিয়াছেন। ॥ ৫৬ ॥

ভিক্ষু সব্বকামী, ভিক্ষু সাল্‌হ, ভিক্ষু রেবত, ভিক্ষু খুজ্জশোভিত, ভিক্ষু যশ ও ভিক্ষু সম্ভূত এই ছয়জন ভিক্ষু ছিলেন ভিক্ষু আনন্দের শিষ্য। আর বাকি দুইজন ভিক্ষু বাসবগামীক ও ভিক্ষু সুমন ছিলেন ভিক্ষু অনুরুদ্ধের[২০] শিষ্য। এই আটজন ভিক্ষু তথাগতকে সচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

॥ ৫৭-৫৯ ॥

উক্ত মহতী সভায় বারো হাজার একশত ভিক্ষুগণ উপস্থিত ছিলেন। সকল ভিক্ষুগণের প্রধান ছিলেন ভিক্ষু রেবত। ॥ ৬০ ॥

অতঃপর সংঘপ্রধান ভিক্ষু রেবত বুদ্ধের সঠিক ধর্মকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে একটি মহা ধর্মসম্মেলন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই সভায় উপস্থিত ভিক্ষুগণের মধ্য হইতে ত্রিপিটক বিশারদ, ধর্মজ্ঞাত, মহাজ্ঞানী সাতশ অর্হত ভিক্ষুগণকে বাছিয়া লইলেন। ॥ ৬১-৬২ ॥

এই সাতশ ভিক্ষুগণ 'ভালিকারামের' সেই মনোরম স্থানে গিয়া রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায়[২১] ও সংঘপ্রধান ভিক্ষু রেবতের নেতৃত্বে মহা ধর্ম সম্মেলন করিয়া বুদ্ধের সঠিক ধর্মের সংকলন[২২] করিলেন। ॥ ৬৩ ॥

স্বয়ং বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত ও বহুল প্রচারিত সঠিক ধর্মনীতিসকল সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার কারণে আটমাসে ভিক্ষুগণ ধর্মনীতির সংকলনকার্য সমাপ্ত করিলেন। ॥ ৬৪ ॥

আসবহীন, স্বনামধন্য এই সকল ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় মহা ধর্ম-সম্মেলন সমাপ্ত করিয়া যথাকালে মৃত্যুতে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৬৫ ॥

সর্বজনীন শাস্তার সম্যক দৃষ্টিপ্রাপ্ত, সার্থক, সর্বলোকের আশীর্বাদক সন্তানগণের[২৩] মৃত্যুতে, সকল উদ্ভূত বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জ্ঞাত হইয়া, আমরা মুক্তির সাধনায় সত্বর সচেষ্ট হইব। ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয় মহা ধর্মসম্মেলন সমাপ্ত

এইখানে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল, 'দ্বিতীয় মহা ধর্মসম্মেলন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. উদয়ভদ্দ বা উদায়ী ছিলেন বুদ্ধের উপাসক। তিনি পিতৃহন্তা ছিলেন না। সম্রাট অজাতশত্রুকে ইনি হত্যা করেননি। ইতিহাস তাই বলে।

২. উদয়ভদ্দ বা উদায়ীকে বাদ দিলে বাকি তিনজন যথা অনুরুদ্ধ, মুণ্ড ও নাগদাস ছিলেন পিতৃহন্তা। ইতিহাসে সেই নিদর্শন আছে।

৩. বুদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের যে দশটি বিষয় সম্বন্ধে নিষেধ করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে, (১) ভিক্ষান্নকে সুস্বাদু করার জন্য নুন জমা রাখা, (২) দ্বিপ্রহরের পর আহার গ্রহণ করা, (৩) ভিক্ষান্ন আহার করার পর গ্রামে যাওয়া ও কেহ আহারের জন্যে বললে আবার আহার করা, (৪) একই প্রদেশে থেকে নানা অঞ্চলে বা বিহারে আলাদা ভাবে উপসথ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা, (৫) গুরু বা শিক্ষ যা করেন তাই করা, (৬) কিছু ভিক্ষুগণের অনুপস্থিতিতে তাদের মতামত পরে নিলেই চলবে ধরে নিয়ে গোষ্ঠী সংক্রান্ত কোন কর্ম করা, (৭) যে প্রহরে আহার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ সেই প্রহরে মন্থন না করা দুধ গ্রহণ করা, (৮) গাঁজিয়া না ওঠা তাড়ি গ্রহণ করা, (৯) কাছাহীন ও অনির্দিষ্ট মাপের আসনে উপবেশন করা, (১০) মুদ্রা, সোনা ও রুপা দানস্বরূপ গ্রহণ করা।

বৈশালীর মহাবন-বিহারের বজ্জি গোষ্ঠীর ভিক্ষুরা বুদ্ধের এইসব নিষেধ অগ্রাহ্য করল। বিশেষ করে অর্থ ও মূল্যবান (সোনা, রুপা ইত্যাদি) বস্তু গ্রহণ না করার নীতি না মেনে তারা সাধারণ উপাসক-উপাসিকার কাছ থেকে এইসব দান গ্রহণ করতে লাগল। অর্থ ও মূল্যবান বস্তু গ্রহণ করে ভিক্ষুরা স্বনির্ভর হতে চাইল। খাদ্যের জন্যে ভিক্ষা করাটা তারা ত্যাগ করে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা নিজেরাই করবে স্থির করল। তাছাড়া, 'বিহারের' সংস্কার ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজে তারা আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাইল না। দেশের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে, রাজানুগ্রহের অভাবে ভিক্ষুরা প্রায় কোনঠাসা হয়ে গেছিল। ভিক্ষাও তাদের তেমন জুটছিল না। দানে প্রদত্ত বিহারগুলোও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে গেছিল। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তখন দেশে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে ভিক্ষুদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভিক্ষুরাপ্রচলিত নীতির কিছুটা প্রয়োজনবোধ পরিবর্তনের করল। কিন্তু প্রচলিত নীতি মেনে ভিক্ষু-সংঘ বজ্জি গোষ্ঠীর এই ভিক্ষুদের ও তাদের পরিবর্তিত নীতিকে অগ্রাহ্য করলেন। ফলে, দ্বিতীয় মহাধর্ম সম্মেলনের পর এই সকল ভিক্ষুরা তাদের পরিবর্তিত আদর্শে বদ্ধমূল থেকে মূল ভিক্ষুসংঘ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নতুন দল গড়ল। তারা নিজেদের দলের নাম দিল 'মহাসাঙ্গিক'। আর মূল স্রোতের ভিক্ষুরা যেহেতু বুদ্ধের প্রদত্ত নীতিতে অনড় রইলেন ও মহাসম্মেলন করে সকল ভিক্ষুর মত

নিয়ে তা করলেন, তাই তারা হলেন 'ভিক্ষুবাদী বা থেরবাদী'। এইভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ ও বৌদ্ধ আদর্শ দুই ভাগে বিভক্ত হল—থেরবাদী ও মহাসাংগিক। মহাবংশ গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে ব্যাপারটা বোঝানো হয়নি।

৪. 'ছলভিঞ্ঞা' বা ছয় অভিঞ্ঞা হচ্ছে, ছয় অভিজ্ঞা বা আদ্যজ্ঞান। এগুলো হলো—(১) ঋদ্ধিশক্তি বা অলৌকিক শক্তি, (২) দিব্য শ্রুতি, (৩) পরচিত্ত জ্ঞান, (৪) পূর্বজন্মের স্মৃতি, (৫) দিব্যদৃষ্টি, (৬) আসবের ক্ষয়।

৫. প্রাচীন বৈশালীর বিহার। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই প্রাচীন বিহারের উল্লেখ রয়েছে। **Beal**-এর **'Buddhist Records of the Western World' (P. 52)** গ্রন্থেও এই বিহারের কথা রয়েছে।

৬. প্রাচীন চৌকো তামার মুদ্রা (৯°৪৮ গ্রাম)।

৭. ভিক্ষুসংঘের অনুমতি না নিয়ে কাজ করা। এটাকে পাচিত্তিয় বলা যায় না। পাচিত্তিয় হচ্ছে খুবই কঠিন অপরাধের শাস্তি।

৮. অলৌকিক শক্তি।

৯. বৈশালী থেকে কয়েক মাইল পূর্বে এই পাহাড়।

১০. শণ দ্বারা তৈরী চীবর পড়তেন বলে এই ভিক্ষুকে শাণবাসী ভিক্ষু বলা হতো। বুদ্ধ ছয় প্রকার বস্তুতে তৈরী চীবর ব্যবহারের অনুমতি দেন—খাম (তিসি), কপ্পাসিকো (সুতো), কোসেয্য (রেশম), কম্বলো (পশম) শাণ (শণ) ও ভঙ্গ (পাট)।

১১. এই অঞ্চল ছিল তক্ষশিলার কাছে।

১২. বৈশালীর পথে প্রাচীন একটি অঞ্চল।

১৩. বুদ্ধের প্রদত্ত বিধান অমান্য করেই ভিক্ষুরা খাদ্য সংগ্রহ করে জমা রাখল।

১৪. পাবা বা কুশীনারা অঞ্চল ছিল মল্লদের বাসস্থান। আর বজ্জিরা ছিল লিচ্ছবি রাজ্যের বাসিন্দা।

১৫. পুপ্পপুর বা ফুলের নগরী। এটাও ছিল পাটলিপুত্রের আর একটি প্রাচীন নাম। তখন এই পাটলিপুত্র ছিল মগধের রাজধানী।

১৬. রাজা কালাশোকের অংশটি বিনয়পিটকে নেই।

১৭. সঠিক ধর্মের সুবাসিত আগার। অর্থাৎ বুদ্ধের সঠিক ধর্মের ভাণ্ডার।

১৮. বৈশালীতে কোন বালুকাময় অঞ্চল।

১৯. বিনয়পিটকে বলা হয়েছে দশ বছরের এই নবীন ভিক্ষু ভিক্ষুসংঘে পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করতো। তাকেই ভিক্ষুরা ভালিকারামটিকে রমণীয় করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২০. পূর্বাশ্রমে ইনি ছিলেন সিদ্ধার্থের বৈমাত্র ভাই, অর্থাৎ গোতমীর পুত্র।

২১. বিনয়পিটকে এর উল্লেখ নেই।

২২. খুব সম্ভবত বিনয়পিটক, সুত্ত বিভঙ্গ, পাতিমোক্ষ প্রভৃতি এই সম্মেলনে নতুন করে সংকলন করা হয়।

২৩. ভিক্ষুদের বলা হয়েছে।

৫

তৃতীয় মহা ধর্মসম্মেলন

প্রথমেই মহাস্থবির ভিক্ষু মহাকশ্যপ ও অন্যান্য মহাস্থবির ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সঠিক ধর্মের সংকলন করিয়াছিলেন। ইহাকে 'স্থবিরবাদ' বলা হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রথম শতবর্ষে ভিক্ষুগণ উক্ত ঐতিহ্য মান্য করিয়া ঐক্যবন্ধ ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ধর্মের অন্য সকল মতবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হইল। ধর্মদ্বেষী সেই দশ হাজার ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় মহা ধর্মসম্মেলনে পরাভূত হইয়া নিজেদের মূল ভিক্ষুসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজেদের 'মহাসাংগিক' বলিয়া এক নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব করিল।

॥ ১-৪ ॥

এই মহাসাংগিক ভিক্ষুগণের দল হইতে পরে 'গোকুলিক' ও 'একব্যবহারিক' ভিক্ষুদলের উদ্ভব হইল। পরে 'গোকুলিক' দল হইতে 'পঞ্ঞত্তিবাদী' ও 'বহুলিকা' গোষ্ঠীর উদয় হইল এবং এই দুই দল হইতে পরে 'চেতীয়' ভিক্ষুদলের উদ্ভব হইল। এইরূপে মহাসাংগিক দলসহ মোট ছয়টি ভিক্ষু গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল। ॥ ৫-৬ ॥

আবার স্থবিরবাদী ভিক্ষুসংঘ হইতেও দুইটি নতুন দলের সৃষ্টি হইল,—মহিশাসকা ও বজ্জিপুত্তক ভিক্ষুসংঘ। ॥ ৭ ॥

আবার বজ্জিপুত্তক গোষ্ঠী হইতে ধম্মুত্তরিয়, ভদ্রযানিক, চন্দাগারিক ও সম্মিতি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল (বজ্জিপুত্তক সহ পাঁচটি দল হইল), এবং মহিশাসকা দল হইতে নতুন দুইটি দলের উদ্ভব হইল যথা, সব্বতথ ও ধম্মগুত্তিক (মহাশাসকা সহ তিনটি দল হইল)।

॥ ৮-৯ ॥

সব্বতথ ভিক্ষুগণের মধ্য হইতে কশ্যাপিয় নামক ভিক্ষুগণের উদ্ভব হইল। আবার তাঁহাদের মধ্য হইতে 'সংকন্তিক' ও পরে 'সুত্ত' নামক গোষ্ঠীর উদয় হইল। (সব্বতথ সহ চারটি দল হইল)।

এইরূপে স্থবিরবাদ গোষ্ঠী বারোটি দলে বিভক্ত হইল। আর মহাসাংগিক গোষ্ঠী ছয়টি দলে বিভক্ত হইল। বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘ মোট আঠেরোটি মতবাদী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া গেল। ॥ ১০ ॥

প্রথম মহা ধর্মসম্মেলনের পরের দ্বিতীয় শতাব্দীতে আঠেরোটি মতবাদী ভিক্ষু গোষ্ঠীর উদ্ভবের পর সৃষ্টি হইল হেমবতা, রাজগিরিয়া, সিদ্ধথকা, আদি সেলিয়, অন্য সেলিয় ও বাজিরিয়া নামক ছয়টি স্বতন্ত্র ভিক্ষু গোষ্ঠীর। জম্বুদ্বীপে এই ছয়টি গোষ্ঠীর ভিক্ষুগণ অন্যান্য

ভিক্ষুসংঘ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইল। আর লংকাদ্বীপে ধম্মরুচি ও সাগলিয়া গোষ্ঠীদ্বয়ও এইরূপ সম্পূর্ণ পৃথক হইল। ॥ ১১-১৩ ॥

রাজা কালাশোকের ছিল দশটি সন্তান। তাঁহারা বাইশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাঁহাদের পর নন্দবংশের নয়জন রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব করেন। তাঁহারাও বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ১৪-১৫ ॥

অতঃপর ব্রাহ্মণ চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত নামক এক মহিমময় যুবককে সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন। 'মৌরিয়' বংশসম্ভূত এই মহান রাজা প্রচণ্ড ঘৃণায় নন্দবংশের নবম রাজা ধননন্দকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ॥ ১৬-১৭ ॥

চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার পুত্র বিন্দুসার আঠাশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা বিন্দুসার ছিলেন একশত এক পুত্রের পিতা। তাঁহাদের মধ্যে শৌর্যে, বীর্যে, জাঁকজমকে ও ক্ষমতায় সুউচ্চ ছিলেন অশোক। তিনি অন্য বিভিন্ন মাতার গর্ভজাত নিরানব্বই-জন ভ্রাতাদের হত্যা[১] করিয়া সমগ্র জম্বুদ্বীপের সার্বভৌম অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রূপে স্বীকৃত হন। শাস্তার পরিনির্বাণের দুইশত আঠারো বর্ষে অশোক রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ॥ ১৮-২১ ॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রূপে স্বীকৃত হইবার চারি বৎসর পর খ্যাতিমান অশোক পাটলিপুত্র নগরে রাজারূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। অভিষিক্ত হইতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে বহু যোজন অবধি ছড়াইয়া পড়িল। ॥ ২২-২৩ ॥

প্রতিদিন দেবতাগণ, আটব্যক্তি বহন করিতে পারে এইরূপ পরিমাণ, পবিত্র নির্মল জল 'অনোতত্ত' হ্রদ[২] হইতে আনিয়া রাজপ্রাসাদে পৌঁছাইয়া দিতেন। রাজা উহার কিছু অংশ বিতরণ করিতেন। দেবতাগণ হিমালয় অঞ্চল হইতে হাজার হাজার নাগলতার[৩] পল্লব দন্তমার্জনের জন্য এবং ঔষধিরূপ হরীতকী, আমলকী, আর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুস্বাদু, সুমিষ্ট, মনোহরা সুবাসযুক্ত, উজ্জ্বল বর্ণের নানা প্রকার পক্ক আম ও অন্যান্য ফল রাজাকে প্রদান করিতেন। ॥ ২৪-২৬ ॥

মরুতগণ ছদ্দন্ত[৪] হ্রদের সুমিষ্ট পবিত্র নির্মল পানীয় জল রাজাকে প্রদান করিতেন। পঞ্চবর্ণের পোষাক, হলুদ বর্ণের রুমাল প্রভৃতিও তাঁহারা রাজাকে দিতেন। ॥ ২৭ ॥

নাগগণও প্রতিদিন রাজাকে নাগলোকের জুঁইফুল বর্ণের সুতোহীন সূক্ষ্ম চাদর, প্রসাধনের জন্য সুবাস, কাজল, অনুলেপন ও স্বর্গীয় পদ্ম প্রভৃতি প্রদান করিতেন। ॥ ২৮ ॥

টিয়া পাখিরা প্রতিদিন ছদ্দন্ত হ্রদের নিকটস্থ ক্ষেত্র হইতে নব্বই শকটপূর্ণ পরিমাপের ধান রাজাকে নিবেদন করিত। রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য সেই ধান ইঁদুরগণ, না ভাঙিয়া, খোসা ছাড়াইয়া চাউলে রূপান্তরিত করিত। ॥ ২৯-৩০ ॥

মৌমাছিরা রাজার জন্য প্রতিনিয়ত মধু সংগ্রহ করিত। কামারশালায় ভাল্লুকগণ[৫] হাতুড়ি চালাইয়া রাজার বর্ম নির্মাণে সাহায্য করিত। করভীক[৬] পাখিরা সুমিষ্ট কূজনে রাজাকে সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করিত। ॥ ৩১-৩২ ॥

অভিষিক্ত রাজা অশোক এইভাবে লালিত হইলেন। রাজ সিংহাসনে বসিয়া রাজা অশোক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (নিজ মাতার গর্ভজাত) তিষ্যকে রাজ-প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিলেন। ॥ ৩৩ ॥

রাজা অশোকের পিতা রাজা বিন্দুসার প্রতিদিন ষাট হাজার ব্রহ্মবাদী তীর্থিয়গণকে অন্ন প্রদান করিতেন। রাজা অশোকও তিন বৎসর উক্ত তীর্থিয়গণের সেবা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ অসংযত, নিয়ম শৃঙ্খলাহীন; তাঁহারা আহার গ্রহণকালে উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত ব্যবহার করেন, তখন তিনি মন্ত্রীগণকে বলিলেন, 'হে রাজন্যগণ! এখন হইতে আমি স্বয়ং আমার পছন্দমত সন্ন্যাসীগণকে অন্ন প্রদান করিব।' এইরূপ বলিয়া বিচক্ষণ রাজা অশোক তাঁহার মন্ত্রীগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ উপস্থিত হইলে রাজা অশোক তাঁহাদের পৃথকভাবে যাচাই করিয়া পছন্দমত সন্ন্যাসীগণকে প্রতিদিন পানাহার প্রদান করিয়া বিদায় করিতেন। ॥ ৩৪-৩৬ ॥

একদিন রাজা অশোক গবাক্ষে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে, এক শান্ত সৌম্য শ্রমণ ধীর গতিতে রাজপথ দিয়া চলিতেছেন। শ্রমণকে দেখিয়া রাজার মনে স্নেহের উদ্রেক হইল। এই শ্রমণ নিগ্রোধ ছিলেন রাজা বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ সুমন-এর পুত্র। ॥ ৩৭-৩৮ ॥

কথিত আছে, একসময় রাজা বিন্দুসার কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলে তাঁহার পুত্র অশোক পিতৃদত্ত উজ্জয়িনীর শাসনভার ছাড়িয়া সত্বর পুষ্পপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পিতা রাজা বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে তিনি পিতার পূর্বের মতানুসারে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ সুমন ইহাতে আপত্তি করিয়া নিজে রাজা হইতে চাহিলে অশোক তাঁহাকে হত্যা[৭] করেন এবং সার্বভৌম রাজা হন। ॥ ৩৯-৪০ ॥

যুবরাজ সুমনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা প্রধান মহিষী সুমনা নিজের প্রাণ বাঁচাইতে তৎক্ষণাৎ গোপনে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া নগরের পূর্বদ্বার দিয়া নগরের বাহিরে পলায়ন করিলেন। নগরের বাহিরে কিছুদূরে অবস্থিত চণ্ডালগণের গ্রামে মহিষী সুমনা আশ্রয় লইলেন। সেই গ্রামের এক নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতা সুমনাকে আশ্রয় দিয়া সেই বৃক্ষের নীচে তাঁহাকে একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিলেন। সেই কুটিরে সুমনা আশ্রয় লইলেন। সেই দিনই সুমনা একটি সুদর্শন পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। মা সেই সন্তানের নাম রাখিলেন 'নিগ্রোধ'। ॥ ৪১-৪৩ ॥

মা ও সদ্যজাত শিশুকে দেখিয়া চণ্ডালগণের প্রধানের বড় মায়া হইল। তিনি তাঁহাদের নিজের আপনজনের ন্যায় সাত বৎসর সসম্মানে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন। ॥ ৪৪ ॥

অতঃপর একদিন ভিক্ষু মহাবরুণ উক্ত বালকের শরীরে কিছু লক্ষণ (উপনিসসয়) দেখিয়া তাঁহার মাতার অনুমতি লইয়া তিনি বালক নিগ্রোধকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডনকালেই নিগ্রোধ অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

প্রব্রজ্যার পর একদিন শ্রমণ নিগ্রোধ বিহার হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মাতাকে দেখিতে যাইতে চণ্ডালগ্রামের পথ ধরিতে অপরূপ পুপ্‌ফপুর নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া নগরের পূর্বদ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির হইতে রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া চলিলেন। সেই সময় রাজা অশোক প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে শ্রমণের শান্ত সৌম্য ধীর স্থির পদচারণ লক্ষ্য করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। পূর্বজন্মে উভয়ের নৈকট্যের কারণেও রাজার মনে শ্রমণের প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইল। ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অতীতে (পূর্বজন্মে) তিন মধু ব্যবসায়ী ভ্রাতাদের মধ্যে মধুর প্রীতি সম্পর্ক ছিল। তাহাদের একজন মধু বিক্রি করিতেন আর বাকি দুইজন বনে গিয়া মধু সংগ্রহ করিতেন। সেই সময় এক পচ্চেকাবুদ্ধ শরীরের এক ক্ষতের কারণে অসুস্থ হইলে, অন্য এক পচ্চেকাবুদ্ধ সেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মধু কামনা করিয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় এক যুবতী নদী হইতে জল আনিতে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিল। সেই যুবতী উক্ত পচ্চেকাবুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তিনি মধুর জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ইহা জ্ঞাত হইয়া যুবতী উক্ত মধু ব্যবসায়ীদের গৃহের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল, 'ঐ স্থানে মধুর দোকান। আপনি সেই স্থানে যান।' ॥ ৪৯-৫২ ॥

অতঃপর সেই পচ্চেকাবুদ্ধ সেই স্থানে গিয়া মধু ভিক্ষা করিলেন।

মধু বিক্রেতা ভ্রাতা গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে অধিক পরিমাণ মধু ঢালিয়া দিল। সেই মধু পাত্র পূর্ণ হইয়া উপছাইয়া পড়িল।

প্রদত্ত মধু যখন পাত্র ছাপাইয়া ভূমিতে পড়িতেছিল, তখন সেই মধু বিক্রেতা মনে মনে সংকল্প করিল 'এইরূপ দানের পুণ্যফলে আমি যেন সমগ্র জম্বুদ্বীপের অপ্রতিদ্বন্দ্বি রাজা হই এবং আমার খ্যাতি যেন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।' ॥ ৫৩-৫৫ ॥

বাকি দুই ভ্রাতা মধু সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলে এই ভ্রাতা তাহাদের এই দানের কথা জানাইল, কারণ যে মধু সে দান করিয়াছে উহা তাহাদেরও অধিকারভুক্ত। ॥ ৫৬ ॥

ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈর্ষার কারণে বলিল, 'সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই চণ্ডাল ছিল, কারণ চণ্ডালরাই গৈরিক বসন পরিধান করে।' দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিল, 'তোমার পচ্চেকাবুদ্ধকে সাগরে ফেল।' কিন্তু যখন সেই ভ্রাতা তাহাদের জানাইল যে এই দানের পুণ্যের অংশ তাহারাও লাভ করিবে, তখন তাহারা সেই দানে সম্মতি জানাইল। ॥ ৫৭-৫৮ ॥

যেই যুবতী পচ্চেকাবুদ্ধকে মধু প্রাপ্তির স্থানের নির্দেশ করিয়াছিল, সেই যুবতী মনে মনে সংকল্প করিল, যেন সে রাজরানী হইতে পারে এবং সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারিণী হয়। ॥ ৫৯ ॥

পরজন্মে সেই মধুদাতা ভ্রাতা হইলেন রাজা অশোক। তাঁহার মহিষী 'অসন্ধিমিত্তা' ছিলেন সেই যুবতী। যেই ভ্রাতা পচ্চেকাবুদ্ধকে চণ্ডাল বলিয়াছিল, সে হইল শ্রমণ নিগ্রোধ। আর যেই ভ্রাতা পচ্চেকাবুদ্ধকে সাগরে নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিল, সে হইল রাজা অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্য। ॥ ৬০ ॥

পচ্চেকাবুদ্ধকে চণ্ডাল বলিবার কারণে সেই ভ্রাতার জন্ম হয় চণ্ডাল গ্রামে। কিন্তু পরে দানে সম্মতি প্রদানের কারণে সে জন্মের সপ্তম বর্ষে শ্রমণ হইয়া চণ্ডাল গ্রাম ত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়। ॥ ৬১ ॥

রাজা অশোক শ্রমণ নিগ্রোধকে দেখিয়া স্নেহবশতঃ তাঁহার নিকট শ্রমণকে সত্বর আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। শ্রমণ নিগ্রোধ উক্ত নির্দেশ মানিয়া ধীর স্থির ও শান্ত চরণে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ॥ ৬২ ॥

রাজা শ্রমণকে বলিলেন, 'হে ভন্তে! আপনি যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন।' সেই স্থানে অন্য কোন আসন দেখিতে না পাইয়া শ্রমণ নিগ্রোধ কিছুদূরে অবস্থিত রাজ-সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। যখন

তিনি সিংহাসনের দিকে পা বাড়াইলেন, তখন রাজা ভাবিলেন, 'এই শ্রমণ দেখিতেছি অদ্য আমাদের প্রভু হইবেন।' ॥ ৬৩-৬৫ ॥

রাজার হস্তে ভর করিয়া কয়েক ধাপ পাদানি অতিক্রম করিয়া শ্রমণ নিগ্রোধ শ্বেত চন্দ্রাতপের নীচে অবস্থিত রাজ-সিংহাসনে গিয়া বসিলেন

রাজা ভাবিলেন, 'এই শ্রমণ নিশ্চয়ই সঙ্ঘের উচ্চ পদাধিকারী। তাই তিনি উক্ত রত্নখচিত রাজ-আসনকেই তাঁহার যোগ্য আসন বলিয়া মনে করিয়াছেন।' রাজা উচ্চ পদাধিকারী শ্রমণকে তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া রাজা অতীব প্রীত হইলেন। ॥ ৬৬ ॥

অতঃপর রাজা নিজের জন্য প্রস্তুত আহার্য খাদ্য-পানীয় শ্রমণকে প্রদান করিলেন। তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে রাজা এক পার্শ্বে বসিয়া শ্রমণের নিকট সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। শ্রমণ রাজাকে ধম্মপদ-এর 'অপপ্মাদ বগ্গ' আবৃত্তি করিয়া ও সহজভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। ॥ ৬৭-৬৮ ॥

বুদ্ধের উক্ত ধর্মোপদেশ শ্রমণের মুখে শুনিয়া জগৎপতি অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আমি আপনার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় আট প্রকার বস্তুসকল[৮] প্রদান করিব।' ইহা শুনিয়া শ্রমণ বলিলেন, 'হে রাজা! সেই সকল বস্তু আমার উপাধ্যায়ের প্রাপ্য।' রাজা ইহা শুনিয়া আরও একপ্রস্ত অনুরূপ বস্তুসকল প্রদানের কথা বলিলেন। শ্রমণ বলিলেন, 'হে রাজা! সেই সকল বস্তু সঙ্ঘের অন্যান্য ভিক্ষুগণের প্রাপ্য।' অতঃপর রাজা তিনপ্রস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসকল শ্রমণকে প্রদান করিবেন বলিলে শ্রমণ উহা জ্ঞাত হইয়া উক্ত দান অতঃপর গ্রহণযোগ্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। ॥ ৬৯-৭১ ॥

পরদিন রাজার অনুরোধে শ্রমণ নিগ্রোধ বত্রিশজন ভিক্ষুসহ রাজ-প্রাসাদে গেলেন। রাজা স্বহস্তে সকলকে খাদ্য-পানীয় প্রদান করিলেন। আহার সমাপ্ত হইলে শ্রমণ নিগ্রোধ রাজাকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শোনাইলেন। রাজা অশোক বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনিয়া উহা অনুমোদন করিয়া ত্রি-রত্নে শরণ[৯] লইলেন। ॥ ৭২ ॥

অতঃপর রাজা অশোক ধর্মের প্রতি প্রীত হইয়া প্রতিদিন দ্বিগুণ সংখ্যক ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পানাহার প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে একসময় নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণের সংখ্যা ষাট হাজারে পৌঁছিল। পূর্বের ষাট হাজার তীর্থিয়গণের পরিবর্তে রাজা অশোক প্রতিদিন রাজপ্রাসাদে ষাট হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে পানাহার প্রদান করিতেন। ॥ ৭৩-৭৪ ॥

একদিন রাজা ভিক্ষুগণের জন্য রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালায় দুর্লভ খাদ্যসকল প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিয়া, সারা নগর আনন্দোজ্জ্বলভাবে সজ্জিত করিয়া স্বয়ং ভিক্ষুসংঘের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাদরে আহ্বান করিয়া প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। প্রাসাদে রাজা তাঁহাদের উত্তম সুস্বাদু পানাহার ও প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করিলেন।

অতঃপর রাজা বিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! শাস্তার প্রদত্ত ধর্ম কত ভাগে বিস্তৃত?'

ব্রাহ্মণ মোগ্গলির পুত্র ভিক্ষু তিষ্য বলিলেন, 'মহারাজ! শাস্তার ধর্ম চুরাশি হাজার ভাগে বিস্তৃত।'

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আমি প্রতিটি ভাগকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে সেই সংখ্যক বিহার নির্মাণ করিব।' ॥ ৭৫-৭৮ ॥

রাজা অশোক ছিয়ানব্বই কোটি মুদ্রা ব্যয়ে রাজ্যের চুরাশি হাজার নগরে সেই সকল প্রদেশের রাজাগণের তত্ত্বাবধানে চুরাশি হাজার বিহার নির্মাণ করিলেন এবং স্বয়ং তদারক করিয়া পাটলিপুত্রে 'অশোকারাম' নামক বিহারটি নির্মাণ করিলেন। ॥ ৭৯-৮০ ॥

ধর্মের সমর্থনে রাজা বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে, শ্রমণ নিগ্রোধকে এবং অসুস্থ ভিক্ষুগণকে প্রতিদিন একশত হাজার মুদ্রা দান করিতেন। ধর্মের কারণে সেই মুদ্রায় ভিক্ষুগণ দেশের বহু বিহারে স্থাপিত স্তূপগুলির প্রতিদিন পূজা করিতেন। উপাসক-উপাসিকাগণ সেই মুদ্রায় ধর্মজ্ঞ ভিক্ষুগণকে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল প্রস্তুত করিয়া দিতেন[১০]। ॥ ৮১-৮৩ ॥

অনোতত্ত হ্রদ হইতে যে পবিত্র নির্মল জল প্রতিদিন রাজার নিকট আসিত, চারি পাত্র পরিমাণ সেই জল রাজা প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিতেন। এক পাত্র পরিমাণ জল রাজমহিষী অসন্ধিমিত্তাকে প্রদান করা হইত। এক পাত্র পরিমাণ জল ত্রিপিটক বিশারদ ষাটজন ভিক্ষুকে প্রদান করা হইত। আর কেবল দুই পাত্র পরিমাণ জল রাজা নিজের জন্য রাখিতেন। ॥ ৮৪-৮৫ ॥

রাজাকে প্রদত্ত নাগলতার পল্লব হইতে যথেষ্ট পরিমাণ পল্লব রাজা ষাট হাজার ভিক্ষুগণকে এবং রাজপ্রাসাদের ষোল হাজার মহিলাগণকে দন্তমার্জনের জন্য প্রদান করিতেন। ॥ ৮৬ ॥

একদিন রাজা অশোক 'মহাকাল' নামক এক অলৌকিক শক্তিধর নাগ রাজার কথা শুনিলেন। কথিত আছে, সেই নাগরাজা চারিটি যুগে আবির্ভূত চারিটি বুদ্ধকে সচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ॥ ৮৭ ॥

এইরূপ শুনিয়া রাজা অশোক সেই নাগরাজাকে সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ

করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিতে নির্দেশ দিলেন। রাজার উক্ত নির্দেশে নাগরাজাকে সুবর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে আনা হইলে, রাজা অশোক তাঁহাকে শ্বেত চন্দ্রাতপের নীচে অবস্থিত সিংহাসনে বসাইয়া ফুল, মালা ইত্যাদি দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজপ্রাসাদের ষোল হাজার মহিলা দ্বারা পরিবৃত করিয়া রাজা অশোক তাঁহাকে বলিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি তথাগতকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ মহর্ষি, যিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সশরীরে আমাদের দেখান।' ॥ ৮৮-৯০ ॥

নাগরাজ মহাকাল তখন বত্রিশটি মহালক্ষণ যুক্ত ও আশীটি ক্ষুদ্রলক্ষণ যুক্ত বুদ্ধের একটি অবয়ব সৃষ্টি করিলেন। উঁহার শীর্ষ উজ্জ্বল অগ্নিশিখাসম মুকুটে শোভিত ও ছয় ফুট পরিমাণ দৈর্ঘ্য উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি উহার সারা শরীরকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ॥ ৯১-৯২ ॥

বুদ্ধের উক্ত অবয়ব দেখিয়া রাজা অশোক বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজা মহাকালের সৃষ্ট বুদ্ধের চেহারা যদি এইরূপ উজ্জ্বল হয়, তবে না জানি তথাগত সশরীরে আরও কীরূপ দীপ্তিময় ছিলেন। ॥ ৯৩ ॥

এইরূপ চিন্তায় রাজা অশোকের উদ্বেলিত আনন্দ আরও বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অলৌকিক শক্তিধর নাগরাজা, ক্ষান্ত না হইয়া, তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া, বুদ্ধের সেই সৃষ্ট অবয়ব সাতদিন ধরিয়া রাখিয়া দিলেন। সেই অবয়ব ঘিরিয়া যে উৎসব হইল উহাকে 'অক্ষিপূজা' বলা হইল। ॥ ৯৪ ॥

কথিত আছে, এই প্রবল শক্তিমান ধর্মানুরাগী রাজা এবং মোগ্‌গলিপুত্র ভিক্ষু তিষ্য, উভয়েই পূর্বের বহু জন্মে সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। ভিক্ষু তিষ্যের কাহিনী এইরূপ :

দ্বিতীয় মহা ধর্মসম্মেলনের সময়, রাজা কালাশোকের কালে, ভিক্ষুগণ ধর্মের পতন নিশ্চিত জানিয়া উহার উন্নতিকল্পে কোন বিশেষ ব্যক্তির সন্ধান করিতে লাগিলেন যিনি ধর্মের এই পতন রোধ করিতে সমর্থ হইবেন। ভিক্ষুগণ সেই কারণে চারিদিক অবলোকন করিয়া দিব্যদৃষ্টিতে ব্রহ্মলোকে তিষ্যকে দেখিতে পাইলেন। ॥ ৯৫-৯৭ ॥

ভিক্ষুগণ ব্রহ্মলোকে গিয়া তিষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধর্মের পতন রোধ করিতে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন[১১]।
॥ ৯৮ ॥

ধর্ম পুনরায় উজ্জ্বল হউক এইরূপ বাসনায় তিষ্য ভিক্ষুগণের প্রার্থনা

মঞ্জুর করিলেন। ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইবার সময়ও তখন তাঁহার আসন্ন।
॥ ৯৯ ॥

এক প্রবীণ মহাজ্ঞানী মুনি একসময় দুই যুবক—সিগ্‌গভ ও চন্দবজ্‌জিকে ভবিষ্যত বাণী করিয়াছিলেন যে, 'একশ আশী বৎসর পর বুদ্ধের ধর্মের পতন শুরু হইবে। আমরা ইহা দেখিতে তখন বাঁচিয়া থাকিব না। ভিক্ষুগণের কারণেই এই পতন হইবে। ভিক্ষুগণকে ইহার শাস্তিও পাইতে হইবে। সেই কাহিনী এইরূপ ঃ

ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য মহাজ্ঞানী তিষ্য ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে ব্রাহ্মণ মোগ্‌গলির পুত্র হইয়া পুনরায় জন্মলাভ করিবে। যথাসময়ে তোমাদের একজন সেই বালককে ধর্মে দীক্ষা দিবে ও অন্যজন যত্ন সহকারে তাহাকে বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষা দিবে।' ॥ ১০০-১০৩ ॥

ভিক্ষু উপালির 'দাসক' নামক এক শিষ্য ছিল। সেই শিষ্য সোনককে ধর্মে দীক্ষা দেন। দাসক ও সোনক উভয়ে ভিক্ষু উপালির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বের কাহিনী এইরূপ ঃ ॥ ১০৪ ॥

একসময় বৈশালীতে দাসক নামক এক মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি তাঁহার গুরুর তিনশত শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বার বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদ শিক্ষা সমাপ্ত হইল তিনি অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় 'ভালিক বিহার'-এ[১২] অবস্থিত ভিক্ষু উপালির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।
॥ ১০৫-১০৬ ॥

ভিক্ষু উপালির নিকট উপবেশন করিয়া দাসক তাঁহাকে বেদের কিছু কঠিন অংশ লইয়া প্রশ্ন করেন। ভিক্ষু উপালি সেই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করেন। ভিক্ষু উপালি ইহার পর দাসককে বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! সকল মতবাদকে অতিক্রম করিয়া যে মতবাদ রহিয়াছে, উহাতে সকল মতবাদ গিয়া মিশিয়াছে। কী সেই মতবাদ?' ॥ ১০৭-১০৮ ॥

ভিক্ষু এইরূপে সম্যকসম্বুদ্ধের সত্যধর্মের কথা বলিলে, যুবক ব্রাহ্মণ ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! ইহা কী মতবাদ?' ভিক্ষু উপালি বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! ইহাই বুদ্ধের ধর্ম।' তখন দাসক বলিলেন, 'ভন্তে! এই ধর্মজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।' ভিক্ষু উপালি বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! প্রব্রজিত পীতবসনা ভিক্ষুকেই কেবল উহা প্রদান করা হয়।' ॥ ১০৯-১১০ ॥

ভিক্ষু উপালির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যুবক দাসক তাঁহার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তিনশত ব্রাহ্মণ যুবকসহ ভিক্ষু উপালির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ১১১ ॥

অর্হত্বলাভ করিয়া ভিক্ষু দাসক ভিক্ষু উপালির হাজার অর্হত্বপ্রাপ্ত শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম হইলেন। ভিক্ষু উপালি তাঁহাকে ত্রিপিটক বিশারদ করিলেন। ধর্ম বহির্ভূত আর্যগণ ও অন্য ব্যক্তিরা এই ভিক্ষুর নিকট ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিতেন। ॥ ১১২-১১৩ ॥

তৎকালে কাশীপ্রদেশে সার্থবাহকগণের পথপ্রদর্শকের পুত্র সোনক বাস করিতেন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ব্যবসার জন্য তাঁহার পিতা-মাতাসহ গিরিব্রজে চলিয়া আসেন। সেই সময় একদিন তিনি পঞ্চান্নজন ব্রাহ্মণ যুবক সহ 'বেণুবন' বিহারে গেলেন। সেই বিহারে শিষ্যগণ পরিবৃত ভিক্ষু দাসককে দেখিয়া সোনক-এর মনে ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তিনি সেই মুহূর্তে ভিক্ষু দাসক-এর নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষু দাসক তাঁহাকে পিতা-মাতার অনুমতি লইতে বলিলেন। ॥ ১১৪-১১৬ ॥

সোনক ফিরিয়া গিয়া তিনবেলা উপবাস করিয়া পিতা-মাতার অনুমতি আদায় করিয়া উক্ত বিহারে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষু দাসক-এর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি উপসম্পদাও প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গী পঞ্চান্নজন ব্রাহ্মণ যুবকগণও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনিও ত্রিপিটক-বিশারদ হইলেন। অর্হত্বলাভ করিয়া ভিক্ষু সোনক ভিক্ষু দাসক-এর হাজার অর্হত্বপ্রাপ্ত শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম হইলেন। ॥ ১১৭-১১৯ ॥

পাটলি ফুলের নাম সম্বলিত যে নগর, সেই পাটলিপুত্র নগরে সিগ্গভ নামক এক ধনাঢ্য মন্ত্রীর পুত্র বাস করিতেন। তিনি ঋতু অনুযায়ী তিন ঋতুতে তিন প্রাসাদোপম গৃহে অবস্থান করিতেন। আঠারো বৎসর বয়সকালে তিনি একদিন তাঁহার প্রিয় মিত্র মন্ত্রীপুত্র চন্দবজ্জিসহ পাঁচশত অনুচরে পরিবৃত হইয়া 'কুক্কুটরাম বিহার'-এ গিয়া ভিক্ষু সোনক-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। ॥ ১২০-১২২ ॥

তাঁহারা দেখিলেন সেই সময় ভিক্ষু সোনক তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া গভীর ধ্যানে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর ভিক্ষু দিলেন না। ইহার কারণ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'গভীর ধ্যানে ডুবিয়া থাকিলে বাহ্যিক কিছুই জ্ঞাত হয় না।' তখন তাঁহারা ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনি কখন পুনরায় স্বাভাবিক হইবেন?' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'ধ্যান সমাপ্ত হইলে বা মৃত্যু আসন্ন হইলে বা অন্তরের তাগিদে বা গুরুর পূর্বের নির্দেশে বা সঙ্ঘের কারণেই কেবল তিনি পুনরায় স্বাভাবিক হইবেন।' ॥ ১২৩-২২৫ ॥

ভিক্ষুগণ বুঝিলেন, এই সকল যুবকগণ মুক্তিকামী, তাই ভিক্ষু সোনক-

এর নিকট আসিয়াছে। ইহা বুঝিয়া ভিক্ষুগণ মনে মনে ভিক্ষু সোনককে ধ্যানভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভিক্ষু সোনক ভিক্ষুগণের তাগিদ অন্তরে অনুভব করিয়া ধ্যান সমাপ্ত করিলেন। ॥ ১২৬ ॥

অতঃপর মন্ত্রীপুত্রদ্বয় ভিক্ষু সোনককে বলিলেন, 'ভন্তে! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ না করিয়া আপনি কিসে বিভোর ছিলেন?' ভিক্ষু সোনক বলিলেন, 'হে যুবকগণ! যে প্রীতিসুখ আমাদের প্রাপ্য, আমি সেই সুখেই বিভোর ছিলাম।'

যুবকগণ বলিলেন, 'ভন্তে! সেই সুখ আমরাও উপভোগ করিব।'

ভিক্ষু সোনক বলিলেন, 'হে যুবকগণ! আমাদের ন্যায় না হইলে সেই সুখ উপভোগ করা যায় না।' ॥ ১২৭-১২৮ ॥

ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই সকল যুবকগণ তাঁহাদের পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া ভিক্ষু সোনক-এর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা উপসম্পদাও প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষু সিগ্গভ ও ভিক্ষু চন্দবজ্জি ভিক্ষু সোনক-এর নিকট ত্রিপিটক শিক্ষা করিলেন ও পরে অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ছয়প্রকার ঋদ্ধিশক্তিও লাভ করিলেন। ॥ ১২৯-১৩০ ॥

অতঃপর ভিক্ষু সিগ্গভ জানিলেন যে ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া তিষ্য মনুষ্যলোকে জন্মলাভ করিয়াছেন। যেই গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই গৃহে ভিক্ষু সিগ্গভ সাত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ভিক্ষান্নের জন্য যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোনদিন তিনি সেই গৃহে ভিক্ষান্ন লাভ করেন নাই। এমনকি, 'অন্য গৃহে যাও' এই কথাও তিনি সেই গৃহে কোনোদিন শোনেন নাই। তবু ভিক্ষু সিগ্গভ সেই গৃহে প্রতিদিন ভিক্ষান্নের জন্য যাইতেন।

অষ্টম বর্ষে একদিন ভিক্ষু সিগ্গভ সেই গৃহ হইতে শুনিলেন, 'অন্য গৃহে যাও।' ইহা শুনিয়া সেইদিন যখন তিনি সেই গৃহ হইতে ফিরিতে-ছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মণ মোগ্গলি স্বগৃহে যাইতে ভিক্ষুকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি তাঁহার গৃহে কিছু পাইয়াছেন কি না। ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ, পাইয়াছি।'

ইহার পর ব্রাহ্মণ মোগ্গলি স্বগৃহে গিয়া জানিলেন যে ভিক্ষুকে কিছুই দেওয়া হয় নাই এবং ভিক্ষু তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়াছেন।

পরদিন এই কারণে ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিলে ভিক্ষুর উত্তর শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সেইদিন হইতে ভিক্ষুকে সেই গৃহ হইতে প্রতিদিন যৎসামান্য ভিক্ষান্ন দেওয়া শুরু হইল এবং পরে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে আসনে বসাইয়া যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে পর্যাপ্ত পানাহার প্রদান করিতেন।

এইরূপে সময় অতিবাহিত হইলে যুবক তিষ্য ষোল বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন ও ত্রিবেদজ্ঞ হইলেন। ॥ ১৩১-১৩৭ ॥

ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহারা বসিবার আসনগুলি যত্নসহকারে দেওয়ালের একপাশে আঁকড়ায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন।

তিষ্যকে যাচাই করিতে ভিক্ষু সিগ্‌গভ একদিন ঋদ্ধিবলে ব্রাহ্মণের গৃহের সকল আসন অদৃশ্য করিয়া কেবল তিষ্যের প্রিয় আসনটি রাখিলেন। ইহার পর ভিক্ষু সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলে ভিক্ষুকে আসন প্রদান করিতে যথাস্থানে আসন না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং বাধ্য হইয়া তিষ্যের প্রিয় আসনটি ভিক্ষুকে উপবেশনের জন্য প্রদান করিলেন। ॥ ১৩৮-১৪০ ॥

গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিষ্য দেখিলেন যে এক ভিক্ষু তাঁহার প্রিয় আসনে বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া তিষ্য কুপিত হইয়া ভিক্ষুর প্রতি অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিলেন।

ভিক্ষু ইহাতে শান্তভাবে তিষ্যকে বলিলেন, 'হে যুবক! তুমি কি ধর্ম জ্ঞাত আছ?' তিষ্য বলিলেন, 'ভন্তে! আপনি কি উহা জ্ঞাত আছেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ যুবক! আমি উহা জ্ঞাত আছি।' তিষ্য তখন ভিক্ষুকে বেদের কিছু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ভিক্ষু সিগ্‌গভ পূর্বাশ্রমে ত্রিবেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি যুবক তিষ্যকে বেদের সেই কঠিন অংশগুলি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। (তাছাড়া, যিনি 'চতুরপটিসম্ভিদা'[১৩] জ্ঞাত, তাঁহার নিকট ইহা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নয় কি?) ॥ ১৪১-১৪৪ ॥

অতঃপর ভিক্ষু সিগ্‌গভ 'চিত্তযমক'[১৪] হইতে তিষ্যকে এই প্রশ্নটি করিয়া উহার ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলেন, 'যাহার চিন্তার উদয় হয় এবং ক্ষয় হয় না, তাহার চিন্তার ক্ষয় হইবে, উদয় হইবে না। কিন্তু যাহার চিন্তার ক্ষয় হইবে এবং উদয় হইবে না, তাহার চিন্তার পুনরায় উদয় হইবে, ক্ষয় হইবে না।'[১৫] ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

এই প্রশ্ন শুনিয়া তিষ্যের সম্মুখে যেন রাত্রির ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিল। বিহ্বল হইয়া তিনি ভিক্ষুকে প্রশ্ন করিলেন, 'ভন্তে! ইহা কীরূপ চিন্তা?' ভিক্ষু সিগ্‌গভ বলিলেন, 'হে তিষ্য! ইহাই বুদ্ধের ধর্ম।' তিষ্য তখন বলিলেন, 'ভন্তে! এই ধর্মশিক্ষা আমাকে প্রদান করুন।' ভিক্ষু বলিলেন, 'হে তিষ্য! পীতবসনা প্রব্রজ্যিতকেই কেবল ইহা প্রদান করা সম্ভব।' ॥ ১৪৭ ॥

অতঃপর তিষ্য ধর্মশিক্ষার জন্য স্বীয় পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া

ভিক্ষু সিগ্‌গভের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু ইহার পর তিষ্যকে ধ্যানের বিধি শিক্ষা দিলেন। সেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষু তিষ্য ধ্যানে বসিয়া সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর ভিক্ষু সিগ্‌গভ তাঁহাকে ভিক্ষু চন্দবজ্‌জির নিকট সুত্তপিটক ও অভিধর্মপিটক শিখিতে পাঠাইলেন। ভিক্ষু তিষ্য সেই ভিক্ষুর নিকট গিয়া সুত্তপিটক ও অভিধর্ম-পিটক জ্ঞাত হইলেন। ॥ ১৪৮-১৫০ ॥

ভিক্ষু সিগ্‌গভ যথাসময়ে ভিক্ষু তিষ্যকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া বিনয়পিটক শিক্ষা দিলেন এবং পরে বাকি দুই পিটকও পুনর্বার শিখাইলেন। এইরূপে ভিক্ষু তিষ্য ত্রিপিটক-বিশারদ হইলেন। ॥ ১৫১ ॥

অতঃপর ভিক্ষু তিষ্য সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে ছয় অভিঞ্‌ঞা[১৬] সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ভিক্ষু হইলেন। চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতির ন্যায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সম্যকসম্বুদ্ধের বাণী যেমন সকলে মান্য করিতেন, সেইরূপ এই ভিক্ষুর উপদেশও সকলে গ্রহণ করিতেন। ॥ ১৫২-১৫৩ ॥

একদিন রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য (রাজা অশোকের ভ্রাতা) বনে মৃগয়া করিতে গিয়া দেখিলেন যে হরিণরা আনন্দে মাতিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই মনোরম দৃশ্য দেখিয়া তিষ্যের মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, 'বনের হরিণরা কেবল তৃণভোজন করিয়াও আনন্দে মাতিয়া থাকে। তবে ভিক্ষুগণ উত্তম আহার ও বাসস্থানের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিয়াও আনন্দে উৎফুল্ল হয় না কেন?' ॥ ১৫৪-১৫৫ ॥

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য রাজা অশোককে তাহার উক্ত ভাবনার কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা ভ্রাতাকে শিক্ষা দিবার জন্য এক সপ্তাহের জন্য রাজ্যশাসনের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, 'হে ভ্রাতা তিষ্য! এই এক সপ্তাহ তুমি রাজসুখ উপভোগ করিয়া লও, কারণ সপ্তাহ শেষে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।' ॥ ১৫৬-১৫৭ ॥

এক সপ্তাহ পর রাজা অশোক রাজ-প্রতিনিধি ভ্রাতা তিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে তিষ্য! তোমাকে অমন শীর্ণ দেখাইতেছে কেন? এই এক সপ্তাহ রাজসুখ উপভোগ করিয়াও তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হইলে না?'

ইহাতে রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য বলিলেন, 'না মহারাজ! আসন্ন প্রাণদণ্ডের ভয়ে আমি এক সপ্তাহ কোনরূপ আনন্দ ও সুখলাভ করি নাই।'

রাজা বলিলেন, 'হে ভ্রাতা তিষ্য! সাতদিন পর তোমার মৃত্যু হইবে, এই চিন্তায় রাজ্যভার পাইয়াও সারা সপ্তাহ তুমি কোনরূপ আনন্দ ও সুখ-

লাভ কর নাই। তবে ভিক্ষুগণ প্রতিনিয়ত 'মরণসতি' ভাবনায় থাকিয়া কীরূপে আনন্দে মাতিয়া থাকিবে?' ॥ ১৫৮-১৫৯ ॥

রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্ত উপদেশ শুনিয়া বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ॥ ১৬০ ॥

পরে আর একদিন রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য বনে মৃগয়ায় গেলে দেখিলেন আত্ম-সংযমী ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিত এক বৃক্ষতলে একাকী বসিয়া আছেন এবং এক বিষধর গোখুরা সর্প ভিক্ষুকে শালবৃক্ষের পল্লবঘন একটি ডাল দিয়া বাতাস করিতেছে। এই অবিশ্বাস্য মৈত্রীসুলভ দৃশ্য দেখিয়া রাজ-প্রতিনিধি তিষ্যের মনের ভাবান্তর হইল। তিনি ভাবিলেন, 'হায়! কবে আমি বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা লইয়া এই ভিক্ষুর ন্যায় মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া নির্জনে এইরূপ পরম শান্তিতে অবস্থান করিব?' ॥ ১৬১-১৬২ ॥

সেই সময় এক ভিক্ষু রাজ-প্রতিনিধি তিষ্যকে ধর্মে দীক্ষা দিবার জন্য শূন্যে বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া আসিয়া পুষ্করিণীর জলের উপর দাঁড়াইয়া নিজের বসন ছাড়িয়া উহা শূন্যে উড়াইয়া দিয়া অবগাহনের জন্য জলে ডুব দিলেন।

এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাজ-প্রতিনিধি তিষ্যের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। তিনি আনন্দের সহিত সংকল্প করিলেন, 'অদ্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সংকল্প করিয়া তিষ্য সত্বর রাজার নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য রাজার নিকট সসম্মানে অনুমতি ভিক্ষা করিলেন।

॥ ১৬৩-১৬৫ ॥

রাজ-প্রতিনিধি তিষ্যকে তাহার সংকল্প হইতে ফিরাইতে পারিবেন না বুঝিয়া রাজা অশোক সম্মতি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে লইয়া এবং বহু সভাসদ ও প্রজাগণসহ 'অশোকারাম' বিহারে চলিলেন।

সেই বিহারে ভিক্ষু মহাধর্মরক্ষিত রাজ-প্রতিনিধি ও রাজার ভ্রাতা তিষ্যকে এবং ষাট হাজার প্রজাগণকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। তাহার পরেও কতজন যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন সেই সংখ্যা জানা নাই।

॥ ১৬৬-১৬৯ ॥

রাজা অশোকের কন্যা সংঘমিত্তার স্বামী ছিলেন অগ্গিব্রহ্ম। তাহাদের পুত্রের নাম সুমন। রাজার এই জামাতাও রাজার অনুমতি লইয়া তিষ্যের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ১৭০ ॥

রাজ-প্রতিনিধি ও রাজভ্রাতা তিষ্যের মঙ্গলময় প্রব্রজ্যা হয় রাজা অশোকের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু তিষ্য সেই বর্ষে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় এক সময় অর্হত্বপ্রাপ্ত হইয়া ছয় অভিজ্ঞা লাভ করিলেন। ॥ ১৭১-১৭২ ॥

রাজা অশোকের নির্দেশে যেই সকল নগরে মনোরম বিহারগুলি নির্মাণের প্রস্তুতি চলিতেছিল, সেই সকল নগরে বিহারগুলির নির্মাণ কার্য তিন বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হইল। ভিক্ষু ইন্দগুত্তের বিস্ময়কর ক্ষমতায় ও তত্ত্বাবধানে 'অশোকারাম' বিহারটি সত্বর নির্মিত হইল। বুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিতে রাজা অশোক নানা মনোরম চৈত্যও স্থাপন করলেন। একই দিনে চতুর্দিকের চুরাশি হাজার নগর হইতে সংবাদ আসিল, 'বিহার নির্মিত হইয়াছে।' ॥ ১৭৩-১৭৬ ॥

এই সংবাদ পাইয়া মহামহিমময়, মহাশক্তিধর, শৌর্যবান মহারাজা প্রতিটি বিহারে সত্বর মহাউৎসব করিবার বাসনায় ভেরীর শব্দে রাজ্যে ঘোষণা করিলেন, 'অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজ্যের চুরাশি হাজার নব নির্মিত প্রতিটি বিহারে নগরবাসীগণ মহাউৎসব করিবে। মহাউৎসবের উপযোগী সকল কিছু করিবে। বিহার ও তৎসংলগ্ন গ্রাম, গঞ্জ, নগর, সড়ক প্রভৃতি ফুল-মালায় ও প্রদীপে সুশোভিত করিতে হইবে। রাজ্যের প্রতিটি যোজনে অবস্থিত অর্থবান ব্যক্তিগণ অর্থ প্রদান করুক। প্রতিটি বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুগণকে সময়োপযুগী যথাসাধ্য দান করা হউক। সকল প্রকার গীতবাদ্যে নগর সকল মুখরিত হউক। আর উপসথ দিবসের ন্যায় রাজ্যবাসীগণ এইদিন ধর্মোপদেশ শ্রবণ করুন ও দানাদি প্রদান করুন।'

॥ ১৭৭-১৮২ ॥

রাজ্যের সকল স্থানে প্রজাগণ দেবলোকের ন্যায় গৌরবময় মহাধর্ম উৎসব পালন করিলেন। রাজা যেইরূপ অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছিলেন, প্রজাগণ উহার অধিক করিলেন। ॥ ১৮৩ ॥

সেইদিন মহারাজ অশোক সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত হইয়া পরিবার-পরিজন ও সভাসদসহ বৃহৎ সৈন্য সামন্তে পরিবৃত হইয়া ভূমি প্রকম্পিত করিয়া স্বীয় বিহারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অবনত মস্তকে রাজা উপস্থিত আশীকোটি ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিলেন। সেই ভিক্ষুসংঘে একশত হাজার অর্হত ভিক্ষুগণও ছিলেন। সেই বিহারে তখন নব্বই লক্ষ ভিক্ষুণীগণও ছিলেন। উহাদের মধ্যে এক হাজার অর্হত ভিক্ষুণীরাও ছিলেন। ॥ ১৮৪-১৮৭ ॥

যাহাতে রাজা ধর্মাশোকের আর কোনরূপ রূপান্তর না হয়, বিহারের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তাঁহাকে 'বিশ্বরূপ দর্শন'[১৭] নামক এক অলৌকিক দৃশ্য দেখাইলেন।

পূর্বে রাজা অশোককে তাঁহার দুষ্কর্মের কারণে 'চণ্ডাশোক'[১৮] বলা হইত। পরবর্তীকালে সুকর্মের কারণে তিনি 'ধর্মাশোক' বলিয়া খ্যাত হন। ॥ ১৮৮-১৮৯ ॥

রাজা চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সাগর পরিবৃত জম্বুদ্বীপের উৎসব মুখরিত ও সুসজ্জিত বিহারগুলির কথা চিন্তা করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। আসন গ্রহণকালে রাজা ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! তথাগতের ধর্মের প্রতি বদান্যতা আমার চাহিতে আর কাহার অধিক হইতে পারে?' ॥ ১৯০-১৯১ ॥

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মোগ্গলির পুত্র ভিক্ষু তিষ্য বলিলেন, 'মহারাজ! তথাগতের সময়েও ধর্মের প্রতি আপনার ন্যায় এইরূপ বদান্য আর কেহও ছিলেন না।'

রাজা ভিক্ষুর কথায় অধিক প্রীত হইয়া ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'ভন্তে! তবে আমার ন্যায় বৌদ্ধধর্মের পরমআত্মীয় আর কেহ নাই।'

॥ ১৯২-১৯৩ ॥

উপস্থিত এক ধর্মধর প্রবীণ ভিক্ষু রাজার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্তার ভবিষ্যত দেখিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা ধর্মের নবঅভ্যুদয় হইবে জ্ঞাত হইয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার ন্যায় এইরূপ প্রচুর দানেও কেহ ধর্মের পরমআত্মীয় হয় না। এইরূপ দানে কেবল তিনি মহাদায়ক হইতে পারেন। কিন্তু যিনি স্বীয় পুত্র-কন্যাকে সংঘে প্রদান করেন, তিনিই ধর্মের পরমআত্মীয় ও মহাদায়ক।' ॥ ১৯৪-১৯৭ ॥

ধর্মের পরমআত্মীয় হইবার বাসনায় রাজা তখন নিকটে দণ্ডায়মান পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আমার প্রিয় পুত্র-কন্যাদ্বয়! তোমরা কি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাও?' পিতার কথা শুনিয়া উভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'হে পিতা! আপনার সম্মতি থাকিলে আমরা অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে চাই। ইহাতে আপনার ও আমাদের মঙ্গল হইবে।' ॥ ১৯৮-২০০ ॥

রাজা অশোকের এই দুই পুত্র-কন্যার মধ্যে যুবরাজ মহেন্দ্র খুল্লতাত তিষ্যের প্রব্রজ্যাকালেই স্বয়ং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। রাজকন্যা সংঘমিত্তা ও তাঁহার স্বামী অগ্গিব্রহ্মার প্রব্রজ্যাকালেই স্বয়ং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি তিষ্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে রাজা যুবরাজ মহেন্দ্রকে পরবর্তী রাজ-প্রতিনিধি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেও তিনি ভাবিলেন, 'প্রব্রজ্যার মর্যাদা শ্রেষ্ঠতর'। এইরূপ ভাবনায় রাজা অশোক তাঁহার পরম মেধাবী, শক্তিমান ও সুদর্শন পুত্র-কন্যাকে[১১] প্রব্রজ্যা গ্রহণের সম্মতি প্রদান করিলেন। ॥ ২০১-২০৩ ॥

সেই সময় যুবরাজ মহেন্দ্রের বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর এবং রাজকন্যা সংঘমিত্তা অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী। যুবরাজ মহেন্দ্র সেইদিন একই দিনে

প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। রাজকন্যা সেইদিন প্রব্রজ্যার পর উপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পরে উপসম্পদা লাভ করেন।

॥ ২০৪-২০৫ ॥

ভিক্ষু মহেন্দ্রের উপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্মণ মোগ্গলির পুত্র ভিক্ষু তিষ্য এবং ভিক্ষু মহাদেব ছিলেন তাঁহার দীক্ষা গুরু। সেই প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক। ভিক্ষু মহেন্দ্র উপসম্পদা লাভে অর্হত হন ও ছয় অভিজ্ঞা লাভ করেন। ॥ ২০৬-২০৭ ॥

ভিক্ষুণী সংঘমিত্তার উপাধ্যায় ছিলেন ভিক্ষু আয়ুপাল এবং প্রখ্যাত ভিক্ষু ধম্মপাল ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু। ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাও পরে অর্হত হন।

ধর্মের এই দুই আলোকবর্তিকা লঙ্কাদ্বীপের পরম হিতৈষী, মঙ্গলদায়ী ছিলেন। রাজা ধর্মাশোকের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে তাঁহারা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ॥ ২০৮-২০৯ ॥

ভিক্ষু মহেন্দ্র ও ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা তিন বৎসরের মধ্যে স্বীয় উপাধ্যায়গণের নিকট ত্রিপিটক অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। পরে তাঁহারা সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় লঙ্কাদ্বীপের আকাশে ধর্মের আলো বিকিরণ করেন।

॥ ২১০-২১১ ॥

পূর্বকালে এক অরণ্যবাসী কুন্তি নামক এক বন-পরীর সহিত প্রেমে উপগত হয়। তাহাদের মিলনে কুন্তির দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল তিষ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল সুমিত্ত। পরে এই দুইজন ভিক্ষু মহাবরুণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। এই দুই ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করিয়া ছয় অভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ॥ ২১২-২১৪ ॥

এক সময় অশোকারাম বিহারের এক প্রবীণ ভিক্ষু বিষাক্ত পোকার কামড়ে তাঁহার পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। সেই সময় কুন্তির কনিষ্ঠ পুত্র ভিক্ষু সুমিত্ত ছুটিয়া আসিয়া ভিক্ষুকে কী রূপে পরিচর্যা কারবেন জানিতে চাহিলে, সেই ভিক্ষু তাঁহার যন্ত্রণার উপশমের জন্য কিঞ্চিত ঘৃতের প্রয়োজন জানাইলেন। কিন্তু দ্বিপ্রহরে ভিক্ষায় বাহির হওয়া ভিক্ষুগণের বিনয়-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি ভিক্ষুকে ঘৃতের জন্য ভিক্ষায় যাইতে বলিলেন না। তাছাড়া, রাজার নিকট কোন কিছু যাচনা করাও ধর্মের বিধান বহির্ভূত। ইহা সত্ত্বেও ভিক্ষু সুমিত্ত ঘৃতের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইতে গেলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিক্ষু তিষ্য বুঝিলেন যে, অসময়ে

ভিক্ষায়প্রাপ্ত ঘৃত সেই ভিক্ষু গ্রহণ করিবেন না। তাই তিনি ভিক্ষু সুমিত্তকে বলিলেন, 'ঘৃত পাইলে উহা প্রথমে আমার নিকট আ.নবে।'
॥ ২১৫-২১৭ ॥

ভিক্ষু সুমিত্ত ভিক্ষায় গিয়াও কোথায়ও এক বিন্দু ঘৃত পাইলেন না। এইদিকে সেই ভিক্ষুর যন্ত্রণা বাড়িয়া চলিল। যন্ত্রণা এমন অবস্থায় পেঁছিল যে শত পাত্র ঘৃতে উহা বুঝি আর উপশম হইবার নয়। ভিক্ষু তখন অসহ্য যন্ত্রণায় প্রায় মৃত্যুমুখী। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ভিক্ষু তখন নির্বাণের সংকল্পে ধ্যানস্থ হইলেন। প্রচণ্ড মনোবলে ও স্বীয় প্রচেষ্টায় ভিক্ষু সেই আসনে মহাশূন্যে ভাসিয়া উঠিয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শরীরের মহাতেজঃ তখন শরীর হইতে বাহির হইবামাত্র অগ্নিতে রূপান্তরিত হইয়া উহা ভিক্ষুর নির্বাণপ্রাপ্ত নশ্বর দেহকে শূন্যে ভস্মভূত করিল। ভিক্ষুর শরীরের অস্থিসকল কেবল শূন্যে ভাসিয়া রহিল। ॥ ২১৮-২২১ ॥

রাজা অশোক ভিক্ষুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সৈন্যদল পরিবৃত হইয়া সত্বর অশোকারাম বিহারে গিয়া পেঁছিলেন। রাজা রাজহস্তীর পিঠে উঠিয়া শূন্য হইতে ভিক্ষুর ভাসমান অস্থিসকল নামাইয়া উহার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও যথাবিহিত করিলেন। ॥ ২২২-২২৩ ॥

অতঃপর রাজা উক্ত ভিক্ষুর রোগের কারণ জানিতে চাহিলেন। ঔষধের অভাবে যন্ত্রণায় ভিক্ষুর এই মৃত্যুবরণের কাহিনী শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি নগরের চতুর্দ্বারের সন্নিকটে চারিটি আধার স্থাপন করিয়া উহাতে নানাবিধ রোগনাশক ঔষধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে প্রজাগণ বিনামূল্যে সহজে প্রয়োজনীয় ঔষধসকল সময়ে পাইতে পারে। আর প্রতিটি বিহারে প্রতিদিন ভিক্ষুসংঘের জন্য রাজা ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। রোগনাশক কোন ঔষধ কোন প্রজা বা ভিক্ষুর নিকট যেন দুষ্প্রাপ্য না হয়, রাজা অশোক সেই ব্যবস্থা করিলেন।
॥ ২২৪-২২৫ ॥

ভিক্ষু সুমিত্ত অশোকারাম বিহারের প্রাঙ্গণে পদচারণ করিয়া ধ্যানের সময় নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। এই আশ্চর্য ঘটনায় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বহু মানুষ ধর্মে দীক্ষা লইলেন। কুন্তির আর এক পুত্র ভিক্ষু তিষ্যও নির্বাণ লাভ করিলেন। রাজা অশোকের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে এই দুই ভিক্ষু নির্বাণ লাভ করিলেন। ॥ ২২৬-২২৭ ॥

এই সময় হইতে ভিক্ষুসংঘের আয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গেল। উপাসক-উপাসিকার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুগণের আয়ও বর্ধিত হইল। ইহার ফলে অন্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণের আয় এবং সম্মান কমিয়া গেল।

তখন এই সকল ব্যক্তিগণ অধিক আয়ের লোভে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ও পীত চীবর পরিধান করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিচয়ে সমস্ত বিহারগুলিতে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুদের সহিত মিশিয়া বিহারগুলিতে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা নিজেদের ধর্ম ও আদর্শকে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন বলিয়া জাহির করিয়া নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বিধানকে বুদ্ধের বিধান বলিয়া নিজেদের সঠিক ভিক্ষু বলিয়া প্রকাশ করিল। ॥ ১২৮-২৩০ ॥

ধর্মের অঙ্গে এইরূপ দুষ্ট বিষ ফোঁড়ার উদয় দেখিয়া দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃঢ়চেতা ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য ধর্মের হানি না করিয়া ইহাদের সমূলে উচ্ছেদের জন্য সঠিক সময় ও সুযোগের প্রতিক্ষায় থাকিবার কথা চিন্তা করিলেন। তিনি ভিক্ষু মহেন্দ্রকে বিহারের ভিক্ষুসংঘের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গঙ্গাতীরের নিকটস্থ অহোগঙ্গা পর্বতে গিয়া একাকী নির্জনে ধ্যান করিয়া সাত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ॥ ২৩১-২৩৩ ॥

অন্য মতবাদী সেই সকল ভিক্ষুগণ ছিল অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। তাহারা সংখ্যায়ও ছিল অধিক। তাহাদের বিনয়ের বিধানে সংযত রাখাও সম্ভব নয়।

বিহারগুলিতে এইরূপ অবস্থার কারণে সাত বৎসর ধরিয়া জম্বুদ্বীপের কোন বিহারে ভিক্ষুগণ উপসথ বা প্রবারণা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিতে পারিলেন না। ॥ ২৩৪-২৩৫ ॥

রাজা ধর্মাশোক শুনিলেন যে ভিক্ষুগণের মধ্যে কোন্দলের কারণে অশোকারাম বিহারের ভিক্ষুগণ কোন উপসথ বা প্রবারণা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন না। ইহা শুনিয়া রাজা এক অমাত্যকে উক্ত বিহারে পাঠাইয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুগণের কোন্দল মিটাইয়া ভিক্ষুগণকে আমার 'আরামে' উপসথ অনুষ্ঠান করিতে বলুন।' ॥ ২৩৬-২৩৭ ॥

কিন্তু এই নির্বোধ অমাত্য রাজার নির্দেশ না বুঝিয়া ও বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝিয়া অশোকারাম বিহারে গিয়া ভিক্ষুগণকে ডাকিয়া একত্রিত করিয়া নির্দেশ দিলেন 'আপনারা উপসথ অনুষ্ঠান করুন।' ॥ ২৩৮ ॥

ভিক্ষুগণও সেই অমাত্যকে বিষয়টির গুরুত্ব না বুঝাইয়া বলিলেন 'আমরা বিধর্মী ভিক্ষুগণের সহিত একত্রে উপসথ পালন করিব না।'

এইরূপ অবাধ্যতার কারণে সেই নির্বোধ অমাত্য ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার নিষ্কাশিত তরবারির আঘাতে পর পর কয়েকজন ভিক্ষুর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া বলিলেন 'আমি উপসথ অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য করিব।' রাজভ্রাতা ভিক্ষু তিষ্য এই নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখিয়া, এবং আরও কয়েকজন ভিক্ষুকে এই অমাত্য হত্যা করিতে পারে বুঝিয়া, মুহূর্তে তিনি সেই অমাত্যের সম্মুখে গিয়া আসন পাতিয়া বসিলেন। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেই অমাত্য

ভিক্ষুর দিকে অগ্রসর হইয়া ভিক্ষু তিষ্যকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তখন ক্ষান্ত হইয়া রাজার নিকট গিয়া ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানাইলেন।
॥ ২৩৯-২৪২ ॥

রাজা অমাত্যের মুখে ঘটনাটি শুনিয়া মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তৎক্ষণাৎ বিহারে ছুটিয়া গিয়া বিক্ষুব্ধ চিত্তে ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই অপরাধের মূল অপরাধী কে?' ভিক্ষুগণ রাজার প্রশ্নের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া কয়েকজন ভিক্ষু বলিয়া উঠিলেন, 'মহারাজ! অপরাধী আপনি নিজে।' আর কিছু ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'ঘাতক ও নির্দেশক রাজা উভয়েই অপরাধী।' কিন্তু যে সকল প্রবীণ ভিক্ষুগণ রাজার প্রশ্নটি বুঝিলেন, তাঁহারা বলিলেন, 'না মহারাজ! আপনি অপরাধী নন।'
॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

রাজা সন্তুষ্ট না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! এমন কোন ভিক্ষু আছেন কি যিনি আমার মনের সংশয় দূর করিতে পারিবেন?' ॥ ২৪৫ ॥

এক প্রবীণ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! সেইরূপ ভিক্ষু আছেন। ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য আপনার সংশয় দূর করিয়া আপনাকে সঠিক সত্য দেখাইতে পারিবেন।' ইহা শুনিয়া রাজা আশ্বস্ত হইলেন! ॥ ২৪৬ ॥

অতঃপর রাজা ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্যকে অহোগঙ্গা পর্বত হইতে ফিরাইয়া আনিতে চারিজন ভিক্ষু ও চারিজন অমাত্য ফুল মালাসহ, ভিক্ষুর নিকট পাঠাইলেন। তাহারা ভিক্ষুর নিকট গিয়া রাজার অনুরোধ জানাইলেও ভিক্ষু তিষ্য অবিচল রহিলেন। ॥ ২৪৭-২৪৮ ॥

রাজা এইবার ভিক্ষুর নিকট আটজন ভিক্ষু ও আটজন অমাত্য ফুল, মালাসহ পাঠাইলেন। তাহারা ভিক্ষুর নিকট গিয়া রাজার অনুরোধ জানাইলেন। ভিক্ষু এইবারও রাজার অনুরোধে ফিরিয়া আসিলেন না।
॥ ২৪৯ ॥

রাজা হতাশ হইয়া ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে ভন্তে! আপনারা বলুন। কী করিলে ভিক্ষু ফিরিয়া আসিবেন।'

প্রধান ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! কেহ যদি ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্যকে বলেন, ধর্মের মঙ্গলের জন্য আমরা সকলে আপনার সাহায্যপ্রার্থী। তবে তিনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবেন'।' ॥ ২৫০-২৫১ ॥

রাজা সেইমত ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্যকে বলিতে বলিয়া ষোলজন ভিক্ষু ও ষোলজন অমাত্য, ফুলমালাসহ ভিক্ষুর নিকট পাঠাইলেন। রাজা তাহাদের আরও বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! এই ভিক্ষু বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি পথের ধকল সহ্য নাও করিতে পারেন। অতএব তাঁহাকে কোনরূপ

চক্রযুক্ত যানে না আনিয়া গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে তাঁহাকে পাটলিপুত্রে লইয়া আসিবেন।'

উক্ত ভিক্ষু ও অমাত্যগণ ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যের নিকট গিয়া রাজা যেইরূপ বলিতে বলিয়াছিলেন সেইরূপ বলিয়া তাঁহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। ইহা শুনিবামাত্র ভিক্ষু ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ।। ২৫২-৫৩ ।।

অমাত্যগণ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে সেই নৌকায় করিয়া পাটলিপুত্রে ফিরাইয়া আনিলেন। রাজা অশোক সংবাদ পাইয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া ভিক্ষুকে সাদরে আহ্বান করিতে স্বয়ং হাটু পরিমাণ জলে অবতরণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভিক্ষুর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। ভিক্ষু রাজার প্রতি অনুকম্পাবশতঃ রাজার সেই প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

।। ২৫৪-২৫৬ ।।

রাজা ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে 'রতিবড্‌ডন' নামক প্রমোদ উদ্যানে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুর পদযুগল ধুইয়া দিয়া আসনে বসাইয়া রাজা স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুর অলৌকিক শক্তি যাচাই করিতে রাজা ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! আমি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিতে ইচ্ছুক।' রাজা কীরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে ইচ্ছুক ভিক্ষু জানিতে চাহিলে রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! কোনরূপ ভূমিকম্প হইলে হইবে।' ভিক্ষু পুনরায় রাজার নিকট জানিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! কীরূপ ভূমিকম্প? সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া না শুধুমাত্র কোন এক অঞ্চল লইয়া?' রাজা এই প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! কীরূপ ভূমিকম্প ঘটানো অধিক কঠিন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! একটি অঞ্চলে কেবল উহা সীমিত রাখাই অধিক কঠিন।' ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! সেই সীমিত কঠিন কর্মই আমি দেখিতে ইচ্ছুক।' ।। ২৫৭-২৬০ ।।

ভিক্ষু এক যোজন অবধি বিস্তৃত এক ভূখণ্ডের এক প্রান্তে এবং উহার সম্মুখভাগে একটি শকট, একটি অশ্ব, একটি মানুষ ও একটি জলপূর্ণ পাত্র দুই ভাগ করিয়া দুই ভাগে রাখিলেন। ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে ভূমিটি প্রকম্পিত করিলেন। উহাতে স্থাপিত বস্তুগুলির অর্ধেক ভাগ কম্পিত হইল। রাজা উহা স্বীয় আসনে বসিয়া দেখিলেন।

।। ২৬১-২৬২ ।।

অতঃপর রাজা অশোক ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে সেই দিনের হত্যাকাণ্ডের কথা বলিয়া জানিতে চাহিলেন যে উহাতে রাজার কোনরূপ

অপরাধ হইয়াছে কিনা। ভিক্ষু সেইদিনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হইয়া রাজাকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিলেন, 'অকুশল অভিপ্রায় ব্যতীত কাহাকেও কোন কর্মের কারণে অপরাধী বলা যায় না।' এই বলিয়া ভিক্ষু রাজাকে 'তিত্তির জাতক' এর কাহিনী ব্যক্ত করিলেন।

॥ ২৬৩-২৬৪ ॥

ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য উক্ত মনোরম রাজোদ্যানে সাতদিন অবস্থান করিয়া রাজাকে সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদান করিলেন। সেই সময় রাজা দুই যক্ষকে চতুর্দিকে পাঠাইয়া রাজ্যের বিহারগুলির সকল ভিক্ষুসংঘকে অশোকারাম বিহারে একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তম দিবসে রাজা ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে লইয়া মনোরম অশোকারাম বিহারে গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত রাজ্যের সকল বিহারের সকল ভিক্ষুসংঘের এক মহতী সমাবেশের আয়োজন করিলেন। ॥ ২৬৫-২৬৭ ॥

রাজা সভাগৃহের একপ্রান্তে পর্দার আড়ালে ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য-সহ উপবেশন করিয়া উপস্থিত প্রতিটি বিহারের সকল ভিক্ষুগণকে এক এক করিয়া তাঁহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রশ্ন করিলেন, 'ভন্তে! তথাগত কীরূপ ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কীরূপ মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন?' অনেকে ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাশ্বতবাদ ইত্যাদির কথা বলিলেন। এইরূপে ছদ্মবেশী ভিক্ষুগণ বুদ্ধের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলিতে পারিলেন না। আর সঠিক ভিক্ষুগণ রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'মহারাজ! তথাগত বিভজ্‌জবাদের[২০] প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সেইরূপ ধর্মদর্শন প্রচার করিয়াছিলেন।' রাজা ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে বলিলেন, 'ভন্তে! সম্যকসম্বুদ্ধ কি বিভজ্‌জবাদের প্রবক্তা ছিলেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ।' ভিক্ষুর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা সঠিক ভিক্ষুগণকে সনাক্ত করিতে পারিলেন।

রাজা প্রশ্নের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণকে ভিক্ষুসংঘের মধ্য হইতে বাছিয়া লইলেন। এইরূপে তিনি ষাট হাজার ছদ্মবেশী ভিক্ষুকে ভিক্ষু-সংঘের মধ্য হইতে বাহির করিয়া বিতারিত করিলেন। ॥ ২৬৮-২৭২ ॥

রাজা আনন্দিত হইয়া ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে বললেন, 'ভন্তে! ভিক্ষুসংঘকে যখন পরিশুদ্ধ করা হইল, তখন ভিক্ষুগণের উপসথ উদ্‌যাপনে আর আপত্তি কোথায়?' ॥ ২৭৩ ॥

এই বলিয়া রাজা ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যকে ভিক্ষুসংঘের অভি-ভাবকরূপে নিযুক্ত করিয়া আনন্দে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ভিক্ষুসংঘও ইহার পর নিয়মিত উপসথ উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন।
॥ ২৭৪ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য অসংখ্য ভিক্ষুসংঘের মধ্য হইতে এক হাজার মহাজ্ঞানী, ছয় অভিজ্ঞা প্রাপ্ত, ত্রিপিটক বিশারদ ও বিদ্বান ভিক্ষুগণকে সঠিক ধর্মের সংকলনের জন্য বাছিয়া লইলেন। ভিক্ষু তিষ্য এই সকল ভিক্ষুগণের সহিত অশোকারাম বিহারে সমবেত হইয়া বুদ্ধের সঠিক ধর্মের সংকলন করিলেন।

পূর্বতন ভিক্ষু মহাকশ্যপ ও ভিক্ষু যশ যেইরূপ মহা ধর্মসম্মেলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যও এই মহা ধর্মসম্মেলন করিলেন। ॥ ২৭৫-২৭৭ ॥

এই মহা ধর্মসম্মেলনে ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য অন্য মতবাদ খণ্ডন করিয়া 'কথাবত্থুপকরণ' সংকলন করিলেন। এই মহা ধর্মসম্মেলন এক হাজার ভিক্ষুর উপস্থিতিতে, ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্যের নেতৃত্বে এবং রাজা অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় নয় মাস ধরিয়া চলিল।
॥ ২৭৮-২৭৯ ॥

রাজা অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে দ্বিসপ্ততিতম বর্ষীয় মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য এক মহতী প্রবারণা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মহা ধর্মসম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। ধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রশংসা করিতে যেন বসুন্ধরা মহারবে সেইদিন প্রকম্পিত হইল। ॥ ২৮০-২৮১ ॥

ধর্মের প্রতি কর্তব্যের কারণে যদি এই মহামানব গৌরবোজ্জ্বল ব্রহ্ম-লোক ত্যাগ করিয়া এই ঘৃণ্য মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্মের প্রতি স্বীয় কর্তব্য করিতে পারেন, তবে কোন্ ব্যক্তি ধর্মের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করিবেন? ॥ ২৮২ ॥

তৃতীয় মহা ধর্মসম্মেলন সমাপ্ত

এইখানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'তৃতীয় মহা ধর্মসম্মেলন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. কাহিনীটি ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ঐতিহাসিকরা বলেন যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে অশোক ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে ঝগড়া বাধে। সেই ঝগড়ার নিষ্পত্তি হতে চার বছর লাগে। সেই কারণে অশোক রাজা

হিসাবে স্বীকৃত হলেও তাঁর অভিষেক হয় চার বছর পরে। অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ২৬৯ সালে।

২. কাল্পনিক শীতল জলের পুষ্করিণী।

৩. চম্পক ফুলের গাছ

৪. বৃহৎ জলাশয়

৫. খালি গায়ের শক্তিশালী লোমশ কর্মীদের বোঝানো হয়েছে।

৬. কোকিল

৭. ঐতিহাসিকরা কথাটি অস্বীকার করেন। সম্রাট অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতে দেখি, সম্রাট তাঁর 'ভ্রাতাদের' ভগিনীদের ও আত্মীয়দের' ভালোভাবে পরিচর্যার কথা বলেছেন। জ্যেষ্ঠ ভাইকে হত্যার কথা কোথায়ও নেই।

৮. ভিক্ষুর আটপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু হ'ল—ত্রি-চীবর, ক্ষুর, কোমর-বন্ধনী, জল ছাকনি, ভিক্ষাপাত্র ও সূচ-সূতা।

৯. মহাবংশ-এ বলা হলো সম্রাট অশোক ভিক্ষু নিগ্রোধ-এর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন। 'দিব্যাবদান' ও 'অশোকাবদান' কিন্তু অন্য কথা বলে। সেখানে বলা হলো, ভিক্ষু সমুদ্র রাজাকে ধর্মে দীক্ষা দেন। তবে এটা ঠিক বোঝা যায় যে, সম্রাট অশোক অভিষেকের সপ্তম বর্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

মহাবংশ-এ বলা হয়েছে সুমনের পুত্র নিগ্রোধের জন্মের সাত বছর পর ভিক্ষু মহাবরুণ সেই বালককে প্রব্রজ্যা দেয়। অতঃপর নিগ্রোধের সাত বছর বয়সের কয়েকদিন পর রাজা অশোককে দীক্ষা দেয়া হয়। যেইদিন নিগ্রোধের জন্ম হয় সেইদিন রাজা অশোক রাজারূপে অভিষিক্ত হন। এইভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সম্রাট অশোক অভিষেকের সপ্তম বর্ষের কিছুদিন পর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। অন্ততঃ 'মহাবংশ' গ্রন্থ তাই বলে। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হলে দেখা যায়, সম্রাট অশোকের তেরো নম্বর শিলালিপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাজা অশোক তাঁর রাজত্বের নবম বর্ষে অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ২৬০ সালে যুদ্ধ করে কলিঙ্গ জয় করেন। তাই যদি হয়, তবে সম্রাটঅশোক কলিঙ্গ-যুদ্ধ করেছিলেন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পর, তার আগে নয়। (কলিঙ্গ যুদ্ধের কোন কথা মহাবংশ গ্রন্থে নেই। অন্য কোন 'বংশ' গ্রন্থেও নেই।) অবশ্য এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

১০. কথাটি ঠিক নয়। ভিক্ষুদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে উপাসক-

উপাসিকারা এইরূপ কাজ করবেন বিশ্বাস হয় না। তারা স্বেচ্ছায় করবেন।

১১. এইখান থেকে শুরু করে তিষ্যের দীক্ষা অবধি তিষ্যকে নিয়ে যে কাহিনী রয়েছে, সেটা আমরা দেখতে পাই 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থেও। ভিক্ষু নাগসেনের দীক্ষাও অনুরূপ। একই কাহিনী রয়েছে সেই গ্রন্থেও।

১২. কোন নদীর তীরে নির্মিত কোন প্রাচীন বিহার।

১৩. সকল বিষয়ের সার জ্ঞাত হওয়া। **'A transcendent faculty in grasping the meaning of a text or subject (attha) ; in grasping the Law of all things as taught by the Buddha (dhamma) ; in exegesis (nirutti) ; readiness in expounding and discussion (patibhana)' Wilhelm Geiger.**

১৪. অভিধম্ম পিটকের 'যমকপ্রকরণের' অংশ বিশেষ।

১৫. 'যিনি সত্য জ্ঞাত, তাঁহার বোধশক্তি নিব্বাণপ্রাপ্ত হয় এবং উহা আর ফিরিয়া আসিবার নয়। কিন্তু যিনি সত্য অজ্ঞাত এবং সঠিক ধর্মদর্শন পালন করেন না, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় এবং তিনি মুক্ত হইতে পারেন না।'

১৬, ছয়রূপ ঋদ্ধিশক্তি।

১৭. মহাভারত-এর ছায়া এইখানে স্পষ্ট।

১৮. সবটাই শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কল্পনা। অবশ্য এই কথা চীনা পরিব্রাজকদ্বয় ফা-হেইন, হিউ-এন-সাঙও বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিকরা এই কথা নাকচ করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেছেন, **'This portrayal of Ashoka as an extremely wicked man suddenly converted to a life of piety, we may safely regard as a fabrication of the Buddhist authors. It naturally increased the value of his piety as a Buddhist if he could be described as a thoroughly unworthy man prior to his conversion'. (Asoka and the Decline of the Mauryas—Page-29)**।

১৯. পুত্র মহেন্দ্রও কন্যা সংঘমিত্রা ছিলেন বিদিশার এক বণিকের কন্যা 'দেবী'র গর্ভজাত সন্তান। অশোকের প্রতি সেই কন্যা প্রণয়াসক্তা হলে তাদের জন্ম হয়। সম্রাট অশোক দেবীকে বিয়ে করেননি।

দেবী কখনও পাটলিপুত্রে যাননি। তিনি রাণী হবার দাবীও করেননি। অশোক উক্ত পুত্র-কন্যাকে পাটলিপুত্রে স্বীয় রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। তবে পুত্র-কন্যাদ্বয় মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। রাজপ্রাসাদে তাদের সম্মানও তেমন ছিল না। সংঘমিত্তার সঙ্গে রাজা অশোকের এক ভাগনে অগ্গিব্রহ্মার বিয়ে হয়। সেই বিয়েও সুখের ছিল না। এইসব নানা কারণে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্তা গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কায় যাবার প্রাক্কালে মহেন্দ্র বিদিশায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। দেবীর জীবনকাহিনী খুবই করুণ।

২০. যুক্তিবাদী দর্শন। **'Religion of logic and reason'—Geiger.** থেরবাদও তাই।

৬

বিজয়ের লঙ্কায় আগমন

একদা বঙ্গদেশের এক রাজা তাঁহার রাজধানী বঙ্গতে বাস করিতেন। কলিঙ্গরাজার[১] কন্যা ছিলেন তাঁহার রাজমহিষী। সেই রাণীর গর্ভে রাজার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যা সম্বন্ধে এক দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎবাণী[২] করেন যে, এই কন্যার সহিত এক পশুরাজ[৩] সিংহের মিলন হইবে।

রাজার কন্যা ছিল অতীব সুন্দরী ও প্রণয়শীলা। স্নেহ বশতঃ পিতা-মাতা কন্যাকে কোনরূপ শাসন করিতেন না। ॥ ১—৩ ॥

স্বাধীনচেতা এই রাজকন্যা বাধাহীন জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে একদিন রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া একাকী পথে বাহির হইলেন। সেই সময় পথ দিয়া এক সার্থবাহক দল মগধ দেশের উদ্দেশ্যে চলিতেছিল। রাজকন্যা সেই দলে যোগ দিলেন। দলের কেউ তাঁহাকে চিনিতে না পারায় রাজ-কন্যার পক্ষে ইহা সহজ হইল।

সেই সার্থবাহক দল যখন লাঢ়[৪] দেশের জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলিতেছিল সেই সময় এক পশুরাজ সিংহ তাহাদের অতর্কিতে আক্রমণ করিল। সকলে ভয়ে ইতস্ততঃ ছুটিয়া পলায়ন করিলে, রাজকন্যা ভুলবশতঃ সেই পশুরাজের আস্তানার দিকেই ছুটিলেন। ॥ ৪-৫ ॥

পশুরাজ শিকার সমাপ্ত করিয়া সেইস্থান ত্যাগ করিয়া তাহার আস্তানার দিকে চলিলে, দূর হইতে সে রাজকন্যাকে দেখিতে পাইল। রাজকন্যাকে দেখিয়া সে তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইল। সে রাজকন্যার নিকটে আসিয়া নানাভাবে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিল। রাজকন্যার তখন তাঁহার শোনা দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে পড়িল। সেই বাণীতে বিশ্বাস করিয়া রাজকন্যা পশুরাজের ভয়ে ভীত না হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ॥ ৬-৭ ॥

রাজকন্যার স্পর্শে পশুরাজের[৫] কামনার উদ্রেক হইল। সে তখন রাজকন্যাকে তাহার পিঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে তাহার গুহায় গিয়া রাজকন্যার সহিত মিলিত হইল। এই মিলনে রাজকন্যা যথাকালে একই সঙ্গে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিলেন। পুত্রের হস্তপদদ্বয় সিংহের[৬] ন্যায় ছিল। তাই রাজকন্যা তাহার নাম রাখিলেন—সীহবাহু। আর কন্যার নাম রাখিলেন ‘সমুবলী’। ॥ ৮-১০ ॥

রাজকন্যার পুত্র সীহবাহুর বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন সংশয়ের কারণে সে একদিন তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা! তোমার এবং পিতার স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্নরূপ কেন? ইহার উত্তরে রাজকন্যা পুত্রকে তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা বলিলেন। তখন সীহবাহু তাহার মাতাকে বলিল, 'মা! আমরা এইস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছি না কেন?' রাজকন্যা বলিলেন 'পুত্র! তোমার পিতা গুহার মুখ ভারী পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া পুত্র সীহবাহু গুহার মুখের পাথরটি স্বচ্ছন্দে কাঁধে তুলিয়া লইয়া পঞ্চাশ যোজন পথ একই দিনে যাওয়া-আসা করিল। ।। ১১-১৩ ।।

অতঃপর একদিন পশুরাজ শিকারে বাহির হইলে, তখন সীহবাহু তাহার মাতাকে কাঁধে লইয়া ও ভগিণীকে বাম কক্ষে লইয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া পলায়ন করিল। ।। ১৪-১৫ ।।

এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে সীহবাহু একসময় তাহার মাতা ও ভগিণীকে লইয়া বনের প্রান্তে অবস্থিত এক লোকালয়ের নিকটে আসিয়া পেঁীছিল। বঙ্গরাজার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এই রাজকন্যার মাতুলের পুত্র। রাজা তাঁহাকে এই প্রান্তিক গ্রামগুলিরও দায়িত্বে রাখিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি তখন এক বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া বনের প্রান্তে অবস্থিত এই গ্রামের ক্ষেতের কাজকর্মের তদারকি করিতেছিলেন। ।। ১৬ ।।

তিনি সীহবাহু ও তাহার মাতা এবং ভগিনীকে বন হইতে আসিতে দেখিয়া তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল 'আমরা বনবাসী।' তাহাদের শরীর তখন বৃক্ষের[৭] পল্লবে আচ্ছাদিতও শাখায় ছিল।

সেই ব্যক্তির নির্দেশে গ্রামবাসীগণ তাহাদের সামান্য কাপড়-চোপড় আনিয়া দিলেন। পল্লব ছাড়িয়া সেই সামান্য কাপড়-চোপড়ে তাহারা দেহ ঢাকিলে, মুহূর্তে উহা সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদে পরিণত হইল। সেই ব্যক্তি পত্রপুটে তাহাদের সামান্য কিছু খাদ্য প্রদান করিলে, মুহূর্তে উহা সুবর্ণথালায় প্রদত্ত সুস্বাদু আহার্যে পরিণত হইল। এই সকল হইল তাহাদের পূর্বজন্মে কৃত সুকর্মের[৮] কারণে! ।। ১৭-১৮ ।।

এই সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক সেই ব্যক্তি তাহার নিজের পরিচয় দিয়া তাহাদের আসল পরিচয় জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যা এইবার সেই সেনাধ্যক্ষকে নিজের নাম, গোত্র, বংশ পরিচয় ইত্যাদি দিলেন। সেই সেনাধ্যক্ষ বুঝিলেন যে ইনি তাহাদের হারানো রাজকন্যা। ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই সেনাধ্যক্ষ রাজকন্যাকে তাহার পুত্র-কন্যাসহ রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। পরে সেই সেনাধ্যক্ষের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। ।। ১৯-২০ ।।

এইদিকে পশুরাজ শিকারশেষে শীঘ্র তাহার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শোকে কাতর হইল। সে দুঃখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। শোকে দুঃখে একসময় সে পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর সন্ধানে বনের প্রান্তে অবস্থিত গ্রামগুলিতে গিয়া তাহাদের খোঁজ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ পশুরাজকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন এবং শেষে তাহারা রাজার স্বারস্থ হইলেন। তাহারা এই পশুরাজের কবল হইতে পরিত্রাণের জন্য রাজাকে মিনতি করিলেন। রাজা এই কাজের জন্য কোন সাহসী বীরকে না পাইয়া শেষে রাজহস্তীর পৃষ্ঠে হাজার মুদ্রা রাখিয়া নগর পরিক্রমা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ সেই পশুরাজকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন, তবে সেই ব্যক্তি এই হাজার মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন।
।। ২১-২৪ ।।

কিন্তু তবু কোন ব্যক্তি ইহাতে আগ্রহ দেখাইলেন না দেখিয়া, রাজা পুরস্কারের অর্থ দ্বিগুণ ও পরে তিনগুণ করিলেন। রাজকন্যার পুত্র সীহবাহু এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাইলে, তাহার মাতা তাহাকে বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুইবার মাতার নিষেধ মানিলেও পরে সে উক্ত কাজে সম্মতি প্রকাশ করিল। নগরবাসীগণ ইহা শুনিয়া সীহবাহুকে রাজার সম্মুখে লইয়া গেলেন। রাজা উক্ত কাজে তাহার সম্মতি শুনিয়া বলিলেন, 'হে সীহবাহু! তুমি যদি সেই পশুরাজকে হত্যা করিতে পার, তবে আমি তোমাকে আমার রাজ্য প্রদান করিব।' ।। ২৫-২৭ ।।

অতঃপর সীহবাহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একাকী সেই বনে প্রবেশ করিয়া সেই গুহা অভিমুখে চলিল। পিতা দূর হইতে পুত্রকে আসিতে দেখিয়া স্নেহে আকুল হইয়া আনন্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইলে, সীহবাহু তাহার উপর শর নিক্ষেপ করিল। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহের কারণে পুত্রের নিক্ষিপ্ত শর পশুরাজের কপাল হইতে ছিটকাইয়া গিয়া পুত্রের নিকটে ভূমিতে গিয়া পড়িল। তিনবার পুত্র পিতার উপর শর নিক্ষেপ করিল, আর তিনবারই সেই শর ছিটকাইয়া গিয়া পুত্রের নিকটে ভূমিতে গিয়া পড়িল। পুত্রের বারবার আক্রমণে পিতার স্নেহ উবিয়া গিয়া মনে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হইল। সেই ক্রোধের কারণে এইবার সীহবাহুর নিক্ষিপ্ত শর পশুরাজের বক্ষছেদন করিল। সীহবাহু তখন পশুরাজের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া তাহাকে হত্যা[১] করিল। পশুরাজের কেশর ধরিয়া কাটা মুণ্ডটি হাতে করিয়া সীহবাহু রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। ।। ২৮-৩১ ।।

ইহার ঠিক সাতদিন পর বঙ্গদেশের রাজা পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। অমাত্যগণ সীহবাহুকে রাজকন্যার পুত্র ও পরলোকগত রাজার দৌহিত্র জানিয়া, তাহার বীরত্বে প্রীত হইয়া, তাহাকে

বঙ্গদেশের রাজা হইতে অনুরোধ করিলেন। ।। ৩২-৩৩ ।।

সীহবাহু অমাত্যগণের অনুরোধে কেবল রাজসেবক হইতে সম্মত হইয়া তাহার বিপিতাকে রাজত্বের ভার অর্পণ করিয়া ভগিনী সিম্বলীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাহাদের জন্মস্থানে চলিয়া গেল।

।। ৩৪ ।।

সেই বনে সীহবাহু 'সীহপুর' নামক এক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই নগরের চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত অঞ্চলে বহু গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইল। লাঢ় রাজ্যের অন্তর্গত এই সীহপুরে সীহবাহু তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পরে তাঁহার ভগিনী সিম্বলী তাঁহার রাজমহিষী[১০] হয়। কালক্রমে সীহবাহুর ঔরসে সিমবলী ষোলবার দুইটি করিয়া বত্রিশটি যমজ পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই বত্রিশজন পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র হইল "বিজয়"। তাহার পর হইল সুমিত্ত। যথাকালে রাজা সীহবাহু তাঁহার পুত্র বিজয়কে রাজ-প্রতিনিধিরূপে অভিষিক্ত করেন। ।। ৩৫-৩৮ ।।

সীহবাহুর পুত্র বিজয় ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাহার অনুচরগণও ছিল তদ্রূপ। তাহারা রাজ্যে বহু অসহ্য হিংসাত্মক ক্রিয়াকর্ম করিল। ইহাতে প্রজাগণ কোপিত হইয়া রাজার নিকট গিয়া বিজয় ও তাহার অনুচরগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। রাজা প্রজাগণকে শান্ত করিতে স্বীয় পুত্রকে সকল কিছুর জন্য দায়ী করিলেও পুত্রের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার প্রজাগণ বিজয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াও কোন ফল পাইলেন না। বিজয়ের এবং তাহার অনুচরগণের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিল। ।। ৩৯-৪০ ।।

অতঃপর প্রজাগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি যুবরাজকে প্রাণদণ্ড প্রদান করুন।'[১১]

।। ৪১ ।।

রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুবরাজ বিজয় এবং তাহার অনুচরগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের মস্তক অর্ধমুণ্ডন[১২] করিয়া একটি জলযানে সকলকে উঠাইয়া দিয়া, দেশ হইতে নির্বাসন দিতে, তাহাদের সমুদ্রযাত্রার নির্দেশ দিলেন। অনুচরগণের পরিবার এবং পুত্রকন্যাগণকেও রাজা দলে দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন জলযানে উঠাইয়া দিয়া সমুদ্রযাত্রার নির্দেশ দিয়া, দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন। ।। ৪২-৪৩ ।।

বিভিন্ন জলযানের আরোহীগণ বিভিন্ন দ্বীপে গিয়া পেঁীছিল। সেই সকল দ্বীপে তাহারা পৃথক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ।। ৪৪ ।।

নির্বাসিতদের শিশুগণ ভিন্নজলযানে যে দ্বীপে গিয়া পেঁীছিল তাহাকে 'নগ্নদ্বীপ'[১৩] বলা হইল। আর মহিলাগণ ভিন্নজলযানে যে দ্বীপে গিয়া পেঁীছিল তাহাকে 'মহিলাদ্বীপ' বলা হইল। ॥ ৪৫ ॥

যুবরাজ বিজয় ও তাহার অনুচরগণ ভিন্নজলযানে 'সুপ্পারক'[১৪] নামক এক পোতাশ্রয়ে গিয়া পেঁীছিল। স্থানটি তাহাদের বিপজ্জনক মনে হইলে, তাহারা নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল।

॥ ৪৬ ।

অতঃপর অসীম সাহসী এই যুবরাজ বিজয় তাহার অনুচরগণসহ লংকাদ্বীপের যে অঞ্চলে আসিয়া পেঁীছিল উহাকে তাহারা 'তম্বপনি'[১৫] নামে অবিহিত করিল। যেইদিন তাহারা উক্ত স্থানে আসিয়া অবতরণ করিল, ঠিক সেইদিন তথাগত দুইটি শালবৃক্ষের মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া পরিনিব্বাণ[১৬] প্রাপ্ত ইহলেন। ॥ ৪৭ ॥

বিজয়ের লংকায় আগমন সমাপ্ত

এইখানে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'বিজয়ের লংকায় আগমন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

যে সময়ের কথা বলা হয়েছে সে সময় কলিঙ্গে রাজতন্ত্র ছিল না। নানা উপজাতি গোষ্ঠীর নেতারা একত্র হয়ে রাজ্য চালাতো। সম্রাট অশোকের সময়ও কলিঙ্গের শাসনভার ছিল এদেরই হাতে।

প্রাচীনকালে দৈবজ্ঞরা একরকম হেঁয়ালিতে আসল কথা বলতেন। ব্যাপারটায় চমক লাগানোর জন্যে দৈবজ্ঞরা এটা করতেন। এইরকম অতিকথায় ঢাকা থাকতো তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ বাণীটি। বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' স্যামসন-ডেলাইলার কাহিনীতে, মোসেজের সমুদ্রভাগের কাহিনীতে এবং আরও নানা অংশে এইরূপ অসংখ্য 'অতিকথা' রয়েছে। শেক্সপীয়ারও তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকে দৈবজ্ঞের এইরূপ হেঁয়ালিতে ঢাকা অতিকথার উদাহরণ দিয়েছেন। এইখানেও আসল কথাটা অতিকথার আড়ালে রয়েছে। টীকাকারদের উচিৎ ছিল পাঠকদের সুবিধার জন্য রহস্যের উন্মোচন করা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ তা করেন নি। ফলে সত্যটা মিথ্যার আড়ালে রয়েই গেল।

৩. তৎকালে কোন কোন জঙ্গলে, বণিকদের আসা-যাওয়ার চলার পথে, ডাকাতরা লুকিয়ে থাকতো। তারা অতর্কিতে বণিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করতো। প্রয়োজনে তারা খুনও করতো। এইসব সমাজবিরোধীদের মানুষ না বলে 'পশু' বলা হয়েছে, যা সচরাচর আজকালও আমরা বলে থাকি। এইখানে এহেন এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকা কোন দুর্ধর্ষ, হিংসাত্মক, কুখ্যাত, প্রধান ডাকাতকে 'পশুরাজ সিংহ' বলা হয়েছে। এই ডাকাত জঙ্গলের চলার পথে বণিকদের উপর আক্রমণ করতো। এটাকে পশুরাজের 'শিকার' বলা হয়েছে। সে শিকার করে কিন্তু নরমাংস খায় না, যা সত্যিকারের সিংহ করবে। সে কেবল বণিকদের আক্রমণ করে লুটতরাজ করে নিজের ডেরায় পালায়। জঙ্গলেই তার অবস্থান এবং ক্রিয়াকলাপ। সে গুহায় লুকিয়ে থাকে। তার স্বভাব উগ্র এবং চেহারা ভীষণ আকৃতির। তার নাম 'সীহল্'। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে দৈবজ্ঞ কোন সত্যিকারের সিংহকে বোঝাননি। তিনি পশুরাজ সিংহ বলতে কোন কুখ্যাত দুর্ধর্ষ ডাকাতকে বুঝিয়েছেন। এহেন ডাকাত নারীহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি করবে তাতে আর বিচিত্র কি? বনের সত্যিকারের পশু তা করবে না। এই ডাকাত রাজকুমারীকে হরণ করে নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে সে রাজকুমারীকে বহুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। এই কাহিনীটি 'অতিকথার' আড়ালে রেখে বলা হয়েছে।

৪. বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী প্রাচীন অঞ্চল।

৫. জঙ্গলে অবস্থান করা কোন কুখ্যাত দুর্ধর্ষ ডাকাতকে বোঝানো হয়েছে।

৬. সুগঠিত শক্তসমর্থ হস্তপদ বোঝানো হয়েছে।

৭. রেশম-তুলার গাছ।

৮. এটা মহাযানী আদর্শ। বুদ্ধ কর্মফলের এমন ব্যাখ্যা করেননি। এই মহাযানী আদর্শের ভিত্তিতেই গুপ্তযুগে 'জাতক' লেখা হয়।

৯. পুত্র মায়ের কলঙ্কের প্রতিশোধ নিল।

১০. প্রাচীনকালে ভাই-বোনদের মধ্যেও বিয়ে হতো। শাক্যকুলেও এক-সময় তা হয়েছিল। দীঘনিকায়ের 'অম্বটঠ সুত্তে' এইরূপ উদাহরণ রয়েছে।

১১. প্রজাদের এইর্‌্প উক্তিতে বোঝা যায় রাজা কির্‌্প প্রজাবৎসল ছিলেন।

১২. প্রাচীনকালে অপরাধীদের তাই করা হতো। এটা তাদের কাছে খ্‌্বই লজ্জার বিষয়।

১৩. নেড়া দ্বীপ।

১৪. খ্‌্ব সম্ভবত প্রাচীন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্‌্ব' উপক্‌্লবর্তী কোন বন্দর অঞ্চল।

১৫. খ্‌্ব সম্ভবত বর্তমানের 'তলাইমন্নর' অঞ্চল (শ্রীলঙ্কা)।

১৬. ঐতিহাসিকরা বলেন গৌতমব্‌্দ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন্‌ প্রাচীন কুশীনগরের শালবনে, খ্‌্ব সম্ভবত খ্রিঃ প্‌্ঃ ৪৮৩ সালে। মহাবংশ-এ বলা হয়েছে সেই সময় য্‌্বরাজ বিজয় সিংহ লঙ্কায় পৌঁছায়। অর্থাৎ খ্রিঃ প্‌্ঃ ৪৮৩ সালে।

বাংলার কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত য্‌্বরাজ বিজয়সিংহকে 'বাঙ্গালী' বলেছেন। **কথাটি** সঠিক নয়। ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নানা তত্ত্বের সাহায্যে বলেছেন যে, য্‌্বরাজ বিজয়সিংহ মোটেও 'বাঙ্গালী' ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভর্‌্কচ্ছের বাসিন্দা অর্থাৎ গ্‌্জরাতি। এই ভয়্‌্কচ্ছের বন্দর থেকেই তিনি লঙ্কাদ্বীপে গেছিলেন। আর এই অধ্যায়ে যে জঙ্গলের কথা রয়েছে সেটা ছিল খ্‌্ব সম্ভবত প্রাচীন 'গির' জঙ্গল। এইজঙ্গল প্রাচীনকালেও অভয়ারণ্য ছিল।

৭

বিজয়ের অভিষেক

বিশ্বজনের পথ-প্রদর্শক মুক্তিপথের নির্দেশ করিয়া শেষে দেবগণের মহতী-সমাবেশ পরিবৃত হইয়া যখন পরম শান্তিতে নির্বাণ-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন সেই মহান মহর্ষী নিকটে দণ্ডায়মান দেবরাজ ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হে দেবরাজ! রাজা সীহবাহুর পুত্র 'বিজয়' তাহার অনুচরগণসহ লাঢ় দেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছে। সে লঙ্কা-দ্বীপে আমার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহাকে, তাহার অনুচরগণকে এবং লঙ্কাদ্বীপকে সুরক্ষিত করুন।' ॥ ১-৪ ॥

তথাগতের উক্ত নির্দেশ শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের প্রতি এবং তাঁহার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ উক্ত কর্মে উৎপল[১] বর্ণের এক দেবতাকে নিযুক্ত করিলেন। ॥ ৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ তীরবেগে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ॥ ৬ ॥

যুববাজ বিজয় ও তাহার অনুচরগণ সন্ন্যাসীকে বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সন্ন্যাসী! এই দ্বীপের নাম কী'? সন্ন্যাসী বলিলেন, 'এইটি লঙ্কাদ্বীপ'। যুবরাজ বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সন্ন্যাসী! কীরূপ মানুষ এই দ্বীপে আছেন?' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'ইহা জনশূন্য দ্বীপ। তবে এইখানে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা তোমাদের কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই।' এই বলিয়া সেই সন্ন্যাসী তাঁহার ভৃঙ্গার হইতে তাহাদের উপর মঙ্গলসূচক বারি ছিটাইয়া দিয়া তাহাদের সকলের হস্তে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দিয়া শূন্যে বিলীন হইলেন। ॥ ৭-৮ ॥

ইহার পর কুবর্ণা নামক এক যক্ষীর[২] পরিচারিকা, সিমপাতি নামের এক যক্ষী, কুকুরের দেহ ধারণ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ॥ ৯ ॥

যুবরাজ বিজয়ের এক অনুচর নিষেধ সত্ত্বেও কুকুর দেখিয়া তাহার পশ্চাদধাবন করিল। সে ভাবিল, 'এই কুকুর নিশ্চয়ই কোন নিকটবর্তী লোকালয় হইতেই আসিয়াছে'। এইরূপ ভাবিয়া কুকুরের পশ্চাদধাবন করিয়া সে কিছুদূর অগ্রসর হইল। সেই সময় কুবর্ণা যক্ষী এক আশ্রম-বাসিনী বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া একটি মনোরম পুষ্করিণীর তীরে

'অবস্থিত বৃক্ষের নীচে বসিয়া চড়কায় সূতা কাটিতে লাগিল।

॥ ১০-১১ ॥

বিজয়ের উক্ত অনুচর এই বৃদ্ধা আশ্রমবাসিনীকে পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া সূতা কাটিতেছে দেখিয়া পরম নিশ্চন্তে পুষ্করিণীতে নামিয়া অবগাহন করিয়া, কিছুটা জল পান করিয়া, পদ্মের কচি নাল তুলিয়া লইয়া এবং পদ্মপাতায় জল ভরিয়া উঠিয়া আসিলে, সেই বৃদ্ধা বলিয়া উঠল, 'থাম যুবক। তুমি আমার শিকার, আমার খাদ্য।' এইরূপ বলিলে সেই ব্যক্তি হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার নড়িবার আর শক্তি নাই। কে যেন তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তাহার হস্তে মঙ্গলসূত্র থাকায় যক্ষী তাহাকে ভক্ষণ করিতে পারিল না। যক্ষী তাহাকে মঙ্গলসূত্র খুলিয়া ফেলিতে বারবার বলিলেও সেই ব্যক্তি উহা খুলিয়া ফেলিল না। তখন যক্ষী তাহাকে ধরিয়া, তাহার চীৎকার উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। সেই যক্ষী এইরূপে যুবরাজ বিজয়ের সাতশত অনুচরগণকে একে একে সেই গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিল।

॥ ১২-১৫ ॥

অনুচরণগণ ফিরিয়া আসিতেছে না দেখিয়া যুবরাজ বিজয়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে তখন পঞ্চ অস্ত্রে[৩] সজ্জিত হইয়া তাহাদের অন্বেষণে ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়া যুবরাজ বিজয় সেই মনোরম পুষ্করিণীটি দেখিতে পাইলেন। এবং সেই বৃদ্ধাকে উহার তীরে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া চড়কায় সূতা কাটিতেছে দেখিলেন। তাহার সন্নিকটে ভূমিতে বহু ব্যক্তির সিক্ত পদচিহ্ন দেখিলেও সেই সকল পদচিহ্ন অন্য কোন দিকে গিয়াছে দেখা গেল না। ইহা দেখিয়া যুবরাজ বিজয় বুঝিলেন যে এই বৃদ্ধা নিশ্চয়ই কোন অশুভ প্রেতাত্মা। সেই তাহার অনুচরগণকে বন্দি করিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া যুবরাজ সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আশ্রম-বাসিনী! আপনি কি আমার অনুচরগণকে দেখিয়াছেন?' বৃদ্ধা বলিল, 'হে যুবরাজ! অনুচরের কী প্রয়োজন? তৃষ্ণার্ত হইলে এই পুষ্করিণীর নির্মল জল পান করুন, অবগাহন করুন।' ॥ ১৬-১৮ ॥

এইরূপ উত্তর শুনিয়া যুবরাজের দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে এই বৃদ্ধা নিশ্চয়ই যক্ষী, নইলে সে তাহার পরিচয় জানিল কী করিয়া? যুবরাজ তৎক্ষণাৎ অসি উন্মোচন করিয়া সেই যক্ষীর সন্নিকটে গিয়া বাম হস্তে তাহার মস্তকের চুল টানিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের উন্মুক্ত অসি আঘাতের জন্য উত্তোলন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'রাক্ষুসী। এই মুহূর্তে আমার অনুচরদের ফিরাইয়া দাও, নচেৎ মৃত্যুবরণ কর।' যক্ষী ভীত সন্ত্রস্ত হইয় যুবরাজের নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিয়া বলিল, 'হে যুবরাজ!

আমায় হত্যা করিবেন না। আমি আপনাকে রাজ্য প্রদান করিব এবং নিজে ক্রীতদাসী হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ হইব।' যুবরাজ যক্ষীকে এই ব্যাপারে শপথ করাইলেন, এবং শীঘ্র তাঁহার অনুচরগণকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। যক্ষী যুবরাজের সেই আদেশ মান্য করিয়া অনুচরগণকে সত্বর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

॥ ১৯-২৩ ॥

যুবরাজ যক্ষীকে বলিলেন 'আমার অনুচরগণ ক্ষুধার্ত'। তাহাদের আহার্য প্রদান কর।' যক্ষী পূর্বে বহু বণিকদের ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহাদের পরিত্যক্ত জলযান হইতে যক্ষী নানাপ্রকার খাদ্য আনিয়া দিল। যক্ষীর প্রদত্ত সেই সকল অপক্ক খাদ্যসামগ্রী অনুচরগণ রন্ধন করিয়া উহার কিছু অংশ তাহারা প্রথমে যুবরাজকে দিল। অবশিষ্ট পক্ক খাদ্য অনুচরগণ আহার করিল। ॥ ২৪-২৫ ॥

যুবরাজ তাঁহার ভাগ হইতে এক অংশ খাদ্য যক্ষীকে প্রদান করিলেন। যক্ষী উহার কিছুটা আহার করিয়া যুবরাজের প্রতি অতীব প্রসন্ন হইল। প্রীত হইয়া যক্ষী মুহূর্তে এক সালংকারা সুন্দরী ষোড়শী যুবতীতে রূপান্তরিত হইয়া যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার অলৌকিক শক্তিতে এক বৃক্ষের নীচে চতুর্দিক পরিবৃত একটি তাঁবু স্থাপিত হইল। উহার মধ্যে চন্দ্রাতপের নীচে একটি আরামদায়ক শয্যা যুবরাজের জন্য যক্ষী প্রস্তুত করিল। সেই সুন্দর শয্যা দেখিয়া যুবরাজ সেই অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার শয্যাসঙ্গিনী করিয়া সেই শয্যায় পরম সুখে বিশ্রাম করিলেন। আর অনুচরগণ যুবরাজের তাঁবুর চারিধারে তাহাদের শিবির স্থাপন করিল। ॥ ২৬-২৯ ॥

রাত্রি অধিক হইলে যুবরাজ দূর হইতে ভাসিয়া আসা সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। পার্শ্বে শয়নরত যক্ষীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যক্ষীর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল, 'প্রভুকে আমি রাজ্য প্রদান করিব বলিয়াছি। তবে সেই জন্য দ্বীপের সকল যক্ষ-যক্ষীগণকে প্রথমে হত্যা করিতে হইবে। না হইলে তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। তাহারা বলিবে, আমিই যুবরাজকে ও তাঁহার অনুচরগণকে লংকাদ্বীপে অবস্থান করিতে সাহায্য করিয়াছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া যক্ষী যুবরাজকে বলিল, 'হে প্রভু! এই দ্বীপে 'সিরীষবত্থু' নামক একটি যক্ষনগর আছে। সেই নগরে লংকাদ্বীপের যক্ষপতির[৪] কন্যার বিবাহ হইবে। সেই কারণে কন্যা[৫] ও তাহার মাতাকে[৬] উক্ত যক্ষ-নগরে আনয়ন করা হইয়াছে। সাত দিন ধরিয়া বহু যক্ষ-যক্ষীর সমাবেশে সেই নগরে বিবাহের উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসবের সঙ্গীতই ভাসিয়া আসিতেছে।

'হে প্রভু! এই সকল যক্ষ-যক্ষীগণকে শেষ করিবার এখনই সুবর্ণ সুযোগ। দ্বীপের সকল যক্ষ-যক্ষীগণ এখন সেই উৎসবস্থলে একত্রিত হইয়াছে। পরে এই সুযোগ আর আসিবে না।' ॥ ৩০-৩৫ ॥

যুবরাজ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু ইহা কী করিয়া সম্ভব হইবে? যক্ষগণ অশরীরী। তাহাদের সশরীরে না দেখিলে কী করিয়া হত্যা করিব? যক্ষী বলিল, 'হে প্রভু! তাহারা যেই স্থানে থাকিবে, আমি সেই স্থান হইতে অদৃশ্য থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিব। আমার চীৎকার শুনিয়া সেই দিকে আপনি শর নিক্ষেপ করিবেন। অলৌকিক ক্ষমতায় আমি সেই শর যক্ষগণের শরীরে প্রবিষ্ট করাইব।' ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর যুবরাজ বিজয় যক্ষীর নির্দেশ মানিয়া বীরবিক্রমে যক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া উপস্থিত সকল যক্ষ-যক্ষীগণকে নিহত করিলেন। যক্ষ-পতিকে নিধন করিয়া যুবরাজ তাহার বর্ম নিজের অঙ্গে ধারণ করিলেন। অনুচরগণও অন্যান্য নিহত যক্ষগণের বর্ম পরিধান করিলেন।

॥ ৩৭-৩৮ ॥

এই ঘটনার পর যুবরাজ বিজয় উক্ত নগরে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। পরে তিনি তাঁহার শয্যাসঙ্গিনী ও অনুচরগণসহ 'তম্বপনি'তে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেইস্থানে তিনি 'তম্বপন্নি[৭]' নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই নগরে যুবরাজ, অনুচরগণ এবং যক্ষীসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। " ৩৯ ॥

যুবরাজ বিজয় তাঁহার অনুচরগণসহ যখন জলযান হইতে এই দ্বীপে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। অনুচরগ ও শ্রান্ত শরীরে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাদের সকলের হস্তপদ ও শরীর ভূমির তামাটে ধূলায় রঞ্জিত হইয়াছিল। ধূলায় তাহাদের হস্তপদ রঞ্জিত হইলে তাহারা সেই স্থানকে 'তম্বপনি' বলিল। ॥ ৪০-৪১ ॥

যুবরাজ বিজয়ের পিতা রাজা সীহবাহু সিংহকে হত্যা করিয়াছিলেন। সেই সিংহের নাম ছিল 'সীহল্'। সেই সীহল্ সিংহের হত্যাকারীর পুত্রের অনুচরগণ সেই সূত্রে হইল 'সীহলি'। ॥ ৪২ ॥

যুবরাজ বিজয়ের অমাত্যগণ লঙ্কাদ্বীপের নানা স্থানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিল। অনুরোধ নামক এক অমাত্য কদম্ব নদীর[৮] নিকটে অনুরাধ গ্রাম[৯] স্থাপন করিল। সেই গ্রামের উত্তরে উপতীষ্য নামক এক যাজক গম্ভীর নদীর[১০] কূলে উপতিষ্য গ্রাম[১১] স্থাপন করিলেন। অন্যান্য কিছু

অমাত্য উজ্জয়িন, উরুবেল[১২] ও বিজিত[১৩] নামক তিনটি নগর প্রতিষ্ঠা করিল। ।। ৪৩-৪৫ ।।

এইরূপে লঙ্কাদ্বীপে নানা নগর ও গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিবার পর অমাত্য-গণ সকলে একত্রিত হইয়া যুবরাজের নিকট গিয়া বলিল, 'হে যুবরাজ! এইবার আমরা আপনাকে লঙ্কাদ্বীপের রাজারূপে অভিষিক্ত করিতে চাই। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।'

যুবরাজ বিজয় অমাত্যগণের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন 'হে অমাত্যগণ! যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যাকে আমার রাণী করিতে পার, তবে আমি উক্ত কন্যাসহ রাজা-রাণী রূপে একই সঙ্গে অভিষিক্ত হইব।'
।। ৪৬-৪৭ ।।

অমাত্যগণ যুবরাজকে লঙ্কাদ্বীপের রাজারূপে অভিষিক্ত করিবার পরম আগ্রহে, যুবরাজের সংকল্প অনুযায়ী, এই কঠিনকর্মে ব্রতী হইয়া দক্ষিণ ভারতের মধুরা[১৪] নগরের রাজা পণ্ডুর বিদুষী কন্যাকে যুব-রাজের রাণী করিতে, তাহাদের এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বহু মূল্যবান ধনরত্নের সম্ভারসহ সেই রাজার নিকট পাঠাইল। অমাত্যগণ তাহাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যান্য পোষ্যদের জন্য বিবাহযোগ্যা কন্যার সন্ধান করিতেও সেই ব্যক্তিকে অনুরোধ করিল। ।। ৪৮-৫০ ।।

সেই ব্যক্তি সমুদ্রপথে নৌকাযোগে সত্বর মধুরায় পৌঁছিয়া সেই দেশের রাজা পণ্ডুকে যুবরাজ বিজয়ের প্রদত্ত উপহার স্বরূপ বহুমূল্য ধনরত্ন প্রদান করিয়া উক্ত যুবরাজের রাণীরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে রাজার বিদুষী কন্যাকে যাচনা করিল।

রাজা পণ্ডু তাঁহার অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কাদ্বীপে পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়া কন্যার সঙ্গীস্বরূপ যুবরাজের অমাত্য-গণের জন্য একশত বিবাহযোগ্যা সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যাগণের সন্ধানে নগরে ভেরীর শব্দ করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন, 'যাহারা তাহাদের বিশ্বাস-যোগ্যা কন্যাকে বিবাহের জন্য লঙ্কাদ্বীপে পাঠাইতে আগ্রহী, রাজা তাহাদের সেই কন্যা এবং তাহার সহিত প্রদত্ত বস্তুসম্ভারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দ্বিগুণ সম্পদ তাহাদের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিবেন।'
।। ৫১-৫৪ ।।

এইরূপে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া রাজা পণ্ডু নির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহ-যোগ্যা কন্যা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কন্যাকে সালংকারা করিয়া পথের পাথেয় স্বরূপ বহুকিছু প্রদান করিয়া, কন্যার পরিচারিকা এবং সেই সকল প্রাপ্ত বিবাহযোগ্যা কন্যাগণকে, এবং রাজোচিত হস্তী, অশ্ব, নানা কারিগরগণ,

আঠারটি বণিক সমবায়সংঘের এক হাজার পরিবার ইত্যাদি রাজ-প্রতিনিধিসহ সেই ব্যক্তির সহিত জলপথে লংকাদ্বীপে পাঠাইলেন।
॥ ৫৫-৫৭ ॥

এই সকল প্রেরিত পশু ও মানুষগণ সমুদ্রপথে লংকাদ্বীপে পৌঁছিয়া যেই মহাঘাটে অবতরণ করিলেন, পরে সেই স্থানের নাম হইল 'মহাতিত্থ'!
॥ ৫৮ ॥

যক্ষীর গর্ভে যুবরাজ বিজয়ের একটি পুত্র এবং পরে একটা কন্যা জন্মলাভ করে। মধুরার রাজকন্যা লংকাদ্বীপে পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইয়া যুবরাজ বিজয় যক্ষীকে বলিলেন, 'হে যক্ষী! পুত্র-কন্যাকে রাখিয়া এইবার তুমি প্রস্থান কর।'

যুবরাজের এই নির্দেশে যক্ষী নিজেকে অসহায়বোধ করিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইল। তাহাকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া যুবরাজ বলিলেন, 'হে যক্ষী! আর দেরি নয়, তুমি যাও। তোমাকে আমি প্রতিদান স্বরূপ হাজার মুদ্রা মূল্যের 'বলি' প্রদান করিব।' যক্ষী সেই প্রতিদান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে বিদায় না দিতে যুবরাজকে বারবার মিনতি করিল। কিন্তু যুবরাজ অটল রহিল।

অগত্যা যক্ষী তাহার পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া, তাহার মাতুলের নিকট যাইতে, লংকাপুর নগর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ॥ ৫৯-৬২ ॥

লংকাপুর নগরে পৌঁছিয়া যক্ষী তাহার পুত্রকন্যাকে নগরের বাহিরে রাখিয়া নিজে নগরে প্রবেশ করিল। সেই নগরে কিছু যক্ষ-যক্ষীগণ তখনও ছিল। তাহারা কুবর্ণা যক্ষীকে দেখিয়া ভাবিল, 'যুবরাজ নিশ্চয়ই এই যক্ষীকে তাহাদের সন্ধান জানিতে পাঠাইয়াছেন।' তাহারা কুবর্ণার ভয়ে ভীত হইয়া নিজেদের মধ্যে সোরগোল করিতে লাগিল। তখন এক অতি হিংস্র যক্ষ সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য এক প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাতে কুবর্ণা যক্ষীকে সেই মুহূর্তে হত্যা করিল। ॥ ৬৩-৬৪ ।

অতঃপর কুবর্ণার মাতুল নগর হইতে বাহির হইলে যক্ষীর পুত্র-কন্যাকে বাহিরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কাহার পুত্র-কন্যা?' তাহারা বলিল, 'আমরা কুবর্ণার পুত্র-কন্যা।' ইহা শুনিয়া যক্ষীর মাতুল ভীত হইয়া তাহাদের বলিল, 'নগরে অবস্থিত যক্ষগণ তোমাদের মাতাকে হত্যা করিয়াছে। তোমাদেরও তাহারা হত্যা করিবে। অতএব তোমরা এই মুহূর্তে এই স্থান হইতে দ্রুত পলায়ন কর।'
॥ ৬৫-৬৬ ॥

ইহা শুনিয়া শোকে-দুঃখে কুবর্ণা যক্ষীর পুত্র-কন্যা সত্বর সেই স্থান

ত্যাগ করিয়া সুমনকূট[১৫]-এ গিয়া পৌঁছিল। তাহারা সেই স্থানে অবস্থান করিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুবর্ণার পুত্র তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিল। তাহাদের পুত্রকন্যাসহ পরে তাহারা মলয় প্রদেশে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতেই এক সময় পুলিন্দ[১৬] গোষ্ঠীর উদ্ভব হইল। ॥ ৬৭-৬৮ ॥

মধুরার রাজাপণ্ডুর প্রতিনিধি, মধুরার রাজকন্যা ও অন্যান্য কন্যাগণকে রাজার প্রেরিত নানা উপহার সহ যুবরাজ বিজয়কে অর্পণ করিলেন। যুবরাজ বিজয় পণ্ডুরাজার প্রেরিত প্রতিনিধিকে সাদরে আতিথেয়তা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আনিত কন্যাগণকে বংশ মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন অমাত্যগণকে এবং পোষ্যদের তাহাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রদান করিলেন। প্রথানুসারে অমাত্যগণ পূর্ণসভায় যুবরাজ বিজয়কে লংকাদ্বীপের রাজারূপে অভিষিক্ত করিয়া মহা উৎসব করিলেন। ॥ ৬৯-৭১ ॥

অতঃপর রাজাবিজয় রাজাপণ্ডুর কন্যাকে গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে তাঁহার রাজমহিষীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। ॥ ৭২ ॥

রাজা বিজয় তাঁহার অমাত্যগণকে ধনসম্পদ প্রদান করিলেন। প্রতি বৎসর রাজা তাঁহার শ্বশুরের নিকট দুই হাজার মুদ্রা মূল্যের ঝিনুকের মুক্তা উপহারস্বরূপ পাঠাইতেন। ॥ ৭৩ ॥

ইহা সর্বজনবিদিত যে, পূর্বের দুষ্কৃতকর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া লোকপতি রাজা বিজয় তমবপন্নিতে অবস্হান করিয়া, সমগ্র লংকা-দ্বীপের অধিপতি হইয়া, শান্তি ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

বিজয়ের অভিষেক সমাপ্ত

এইখানে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'বিজয়ের অভিষেক'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. নীল বর্ণের পদ্ম।
২. পুরাণে যক্ষরা হচ্ছে কুবেরের অনুচর। এখানে রাক্ষসকে 'যক্ষ' বলা হয়েছে।
৩. পঞ্চ অস্ত্র হচ্ছে, ধনুক, অসি, বর্শা, কুড়ুল ও খঞ্জর।
৪. টীকাকার যক্ষপতির নাম বলেছেন, 'মহাকাল সেন'।
৫. টীকাকার কন্যার নাম বলেছেন, 'পালমিত্তা'।
৬. টীকাকার মায়ের নাম বলেছেন 'গোণ্ডা'।
৭. খুব সম্ভবত বর্তমানের 'তলাইমন্নর' অঞ্চল।
৮. বর্তমানের 'মলওয়টুটে-ওয়ে' নদী।
৯. প্রাচীন অনুরাধাপুর।
১০. নদীটি অনুরাধাপুরের আট মাইল উত্তরে।
১১. 'মলওয়টুটে-ওয়ে' নদীর দক্ষিণকূলে ছিল এই প্রাচীন গ্রাম।
১২. অনুরাধাপুরের পশ্চিমে সমুদ্রের কূলে ছিল এই প্রাচীন নগর।
১৩. অনুরাধাপুরের ২৪ মাইল দক্ষিণে এক জঙ্গলের মধ্যে এই প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ আজও রয়েছে।
১৪. দক্ষিণ ভারতের বর্তমান 'মাদুরাই' শহর।
১৫. **Adam's Peak,** দক্ষিণ শ্রীলঙ্কায়।
১৬. শবর জাতি।

৮

পণ্ডু-বাসুদেব'এর অভিষেক

জীবনের অন্তিম বর্ষে মহারাজ বিজয়ের মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অথচ আমার কোন সন্তান নাই। যে কঠিনতার মধ্যে প্রজাগণকে আমি প্রতিপালন করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর তাহারা আরও গভীর সমস্যায় পড়িতে পারে। অতএব, আমি বরং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্তকে আনিয়া এই রাজ্যের শাসনভার তাহাকে অর্পণ করি।' এই বিষয়ে অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মহারাজা দূত মারফত সুমিত্তকে পত্র পাঠাইলেন।

ইহার কিছুদিনের মধ্যেই রাজা বিজয় ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহন করিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যগণ যুবরাজ সুমিত্তর প্রতিক্ষায় উপতিষ্য গ্রামে অবস্থান করিয়া নিজেরা রাজ্যশাসন করিলেন। এই যুবরাজের প্রতিক্ষায় লঙ্কাদ্বীপ এক বৎসর নৃপতিহীন ছিল। ॥ ১-৫ ॥

রাজা সীহবাহুর মৃত্যুর পর যুবরাজ সুমিত্ত সীহপুরের রাজা হইয়াছিলেন। মদ্দরাজার[১] কন্যার গর্ভে এই রাজার তিনটি পুত্রসন্তান হয়। লঙ্কাদ্বীপের রাজদূত সীহপুরে গিয়া রাজা সুমিত্তকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্র প্রদান করিলে রাজা উহা পাঠ করিয়া পুত্রদের ডাকিয়া বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই বয়সে সমুদ্রযাত্রা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তোমাদের একজনকে অনুকূল সুরম্য লঙ্কাদ্বীপে যাইতে হইবে। উহা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্য। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই মনোরম দ্বীপের সার্বভৌম রাজা হইয়া রাজত্ব করিবে।' ॥ ৬-৯ ॥

পিতার নির্দেশ শুনিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পণ্ডু-বাসুদেব ভাবিলেন, 'আমি সেই দেশে যাইব'। এইরূপ মনস্থ করিয়া তিনি দৈবজ্ঞের নিকট গিয়া তাঁহার যাত্রা শুভ হইবে জ্ঞাত হইয়া, পিতার অনুমতি লইয়া, অমাত্যগণের বত্রিশজন পুত্রসহ সমুদ্রপথে লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে লঙ্কাদ্বীপের মহাকন্দর[২] নদীর মোহনায় জলযান হইতে অবতরণ করিলেন। সেই স্থানের বাসিন্দাগণ পরিব্রাজক সন্ন্যাসীগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ॥ ১০-১২ ॥

অদৃশ্য দেবগণের সুরক্ষায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশধারী যুবরাজ পণ্ডু-বাসুদেব এবং তাঁহার অনুচরগণ রাজধানীর অন্বেষণ করিতে করিতে উপতিষ্য গ্রামের দিকে চলিলেন। ॥ ১৩ ॥

পূর্বে আগত রাজদূতের নিকট সীহপুরের যুবরাজ পণ্ডু-বাসুদেব'-এর আগমন হইবে এই বার্তা শুনিয়া অমাত্যগণ তাহাদের একজনকে দৈবজ্ঞের নিকট ইহার শুভাশুভ জ্ঞাত হইতে পাঠাইয়াছিলেন।

সেই দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, 'ঠিক সপ্তম দিবসে যুবরাজ পণ্ডু-বাসুদেব লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করিবেন। সেই রাজ-পরিবারের কোন একজন বুদ্ধের ধর্ম এই দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিবেন। অতএব যুবরাজের আগমন মঙ্গলদায়ী।' ॥ ১৪-১৫ ॥

এইরূপ ভবিষ্যৎবাণীর পর অমাত্যগণ সপ্তম দিবসে একদল পরিব্রাজক সন্ন্যাসীগণকে আসিতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন যে রাজা সুমিত্তর পুত্র পণ্ডু-বাসুদেব তাঁহার সঙ্গীগণের সহিত উক্ত ছদ্মবেশে লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছেন। অমাত্যগণ যুবরাজকে সনাক্ত করিয়া তাঁহার উপর লঙ্কাদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহার কোন পত্নী নাই, তিনি তখন রাজারূপে অভিষিক্ত হইলেন না। ॥ ১৬-১৭ ॥

শাক্যরাজ্যের যুবরাজ শাক্যপণ্ডু ছিলেন শাক্যরাজা অমিতোদনের পুত্র। একদিন তিনি দৈবজ্ঞের নিকট জানিতে পারিলেন যে শাক্যরাজ্য শীঘ্রই ধ্বংস[৩] হইবে। ইহা জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহার অনুচরগণসহ শাক্যরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা নদীর অপর পারে চলিয়া গিয়া, সেই স্থানে একটি নগর স্থাপন করিয়া সেই অঞ্চলের রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাতজন পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। ॥ ১৮-১৯ ॥

রাজা পণ্ডুর সর্বকনিষ্ঠ কন্যার নাম ছিল সুভদ্দকচ্চানা। তাহার সুললিত সুবর্ণকান্তির সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠব ছিল বহু রাজার কামনার ধন। তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সাতজন রাজা তাহার পিতাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দৈবজ্ঞ রাজাকে তাহার কন্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, 'রাজকন্যার ভাগ্যে মহা মঙ্গলদায়ী সমুদ্রযাত্রা রহিয়াছে। ইহার কারণে রাজকুমারী মহারাণী-রূপে অভিষিক্ত হইয়া খ্যাতিলাভ করিবেন।' ॥ ২০-২১ ॥

এই শুভপ্রদ ভবিষ্যৎবাণী জ্ঞাত হইয়া এবং পাণিপ্রার্থী রাজাগণের আক্রোশ হইতে কন্যাকে দূরে রাখিতে, শাক্যরাজা পণ্ডু সত্বর গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া রাজকন্যা সুভদ্দকচ্চানাকে তাহার বত্রিশজন সখীসহ সেই নৌকায় তুলিয়া দিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'যাহার সাধ্য সে আমার কন্যাকে গ্রহণ করুক।' কিন্তু কেহ গঙ্গাবক্ষে এই জলযানের নাগাল পাইলেন না। রাজকন্যাকে লইয়া সেই জলযান তীরবেগে ছুটিল। ॥ ২২-২৩ ॥

যাত্রার দ্বিতীয় দিনেই রাজকন্যা লংকাদ্বীপের 'গোণগামক'[৪] নামক পোতাশ্রয়ে গিয়া পৌঁছিলেন। রাজকন্যা ও তাঁহার সখীগণ সন্ন্যাসিনীর বেশে সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। তাহারাও রাজধানীর সন্ধান করিতে করিতে অদৃশ্য দেবগণের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া একসময় উপতিষ্য গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। ।। ২৪-২৫ ।।

দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী জ্ঞাত এক অমাত্য সন্ন্যাসিনীগণকে দেখিয়া বুঝিলেন যে শাক্যরাজা পণ্ডুর কন্যা ও তাহার সখিগণ অজানা দ্বীপে আসিতে নিজেদের রক্ষার্থে এই রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি সত্বর সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজকন্যা দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করিয়া রাজাকে নিজের ও সখিগণের আসল পরিচয় প্রদান করিলেন। ।। ২৬-২৭ ।।

বিশ্বস্ত ধর্মপ্রাণ অমাত্যগণ এইবার রাজা পণ্ডু-বাসুদেবকে সমগ্র লংকাদ্বীপের রাজারূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাজকন্যা সুভদ্দকচ্চানা-র অনুমতি লইয়া তাঁহাকে রাজা পণ্ডু-বাসুদেব-এর রাজমহিষী রূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা তাঁহার পোষ্যগণের সহিত রাণীর সহিত আগত সখিগণের বিবাহ দিলেন। রাজা পণ্ডু-বাসুদেব এই রাণীকে লইয়া সুখে বাস করিলেন। ।। ২৮ ।।

পাণ্ডু-বাসুদেব'এর অভিষেক সমাপ্ত

এইখানে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'পণ্ডু-বাসুদেব'এর অভিষেক'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. বর্তমান মাদ্রাজ।
২. শ্রীলংকার প্রাচীন নাগদ্বীপের উত্তরে এই নদীর মোহনায় ছিল প্রাচীন বন্দর।
৩. কোশলরাজ 'বিদুদ্ধব' একসময় শাক্যরাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। টীকাকার বলেছেন, এই সংবাদটি দৈবজ্ঞের মারফত যুবরাজ শাক্য পণ্ডু পূর্বেই জেনেছিলেন। ব্যাপারটা পূর্বে জেনে থাকলে তিনি সকলকে সাবধান করলেন না কেন, বোঝা গেল না।
৪. অনুরাধাপুরের পশ্চিমে ছিল এই প্রাচীন বন্দর।

৯

অভয়-এর অভিষেক

রাণী সুভদ্দকচ্চানার গর্ভে রাজা পাণ্ডু-বাসুদেব'এর দশটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মলাভ করিল। সর্বজ্যেষ্ঠ হইলেন পুত্র অভয় এবং সর্ব-কনিষ্ঠা হইলেন কন্যা চিত্তা। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণৎকারগণ রাজকন্যা চিত্তা সম্বন্ধে গণনা করিয়া বলিলেন, 'এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজ্য-লাভের জন্য তাহার মাতুলগণকে হত্যা করিবে।' ইহা শুনিয়া যুবরাজগণ স্থির করিলেন যে তাহারা ভগিনী চিত্তাকে হত্যা করিবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয় তাহাদের এই পাপ করিতে দিলেন না। ॥ ১—৩ ॥

অতঃপর যুবরাজগণ পরে চিত্তাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একাকী থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেই প্রকোষ্ঠে তাহার এক পরিচারিকা ভিন্ন আর কাহারও প্রবেশের অধিকার রহিল না। রাজার শয়নকক্ষের মধ্য দিয়াই ছিল সেই প্রকোষ্ঠের একমাত্র প্রবেশদ্বার।

রাজকন্যা চিত্তা ছিল অপরূপ মোহময়ী সুন্দরী রমণী। তাহাকে দেখিলে মানুষ প্রায় মদমত্ত হইয়া উঠিত। এই কারণে রাজকুমারীকে 'উন্মাদ করা চিত্তা' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ॥ ৪-৫ ॥

সুভদ্দকচ্চানা লংকাদ্বীপের রাজার রাজমহিষী হইলে, তাঁহার মাতা তাহার পুত্রগণকে সেই দ্বীপে যাইতে উৎসাহিত করিলেন। যুবরাজগণ উৎফুল্ল হইয়া সাতজনের মধ্যে ছয়জনই লংকাদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ॥ ৬ ॥

লংকাদ্বীপে পৌঁছিয়া সেই ছয়জন শাক্যযুবরাজ রাজা পণ্ডু-বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের ভগিনী রাণী সুভদ্দকচ্চানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজকুমারী চিত্তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। রাজার সাদর আতিথেয়তা কিছুদিন উপভোগ করিয়া তাঁহারা রাজার অনুমতি লইয়া লংকাদ্বীপ পরিদর্শনে বাহির হইলেন। মনোরম দ্বীপের নানস্থানে ঘুরিয়া তাঁহারা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন স্থানে আবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

॥ ৭-৮ ॥

উক্ত যুবরাজগণ যে সকল স্থানে অবস্থান করিলেন, তাঁহারা নিজেদের নামে সেই সকল স্থানের নামকরণ করিলেন। যুবরাজ রাম যে স্থানে তাঁহার আবাস গড়িলেন সেই স্থানের নাম রাখা হইল 'রামগোন'। সেইরূপ

অন্যান্য যুবরাজগণ যথা উরুবেল, অনুরাধ, বিজিত, দীঘায়ু ও রোহন যে সকল স্থানে রহিলেন, সেই সকল স্থানের নামকরণ[১] হইল, 'উরুবেলা', 'অনুরাধপুর', 'বিজিতগাম', 'দীঘগাম' ও 'রোহনা'। যুবরাজ অনুরাধ অনুরাধপুরে একটি পুষ্করিণী স্থাপন করিয়া উহার দক্ষিণ তীরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেই প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

॥ ৯-১১ ॥

ইহার পর রাজা পণ্ডু-বাসুদেব তাঁহার পুত্র অভয়কে রাজ-প্রতিনিধি করিলেন। ॥ ১২ ॥

যুবরাজ দীঘায়ুর পুত্র দীঘগামনি লঙ্কাদ্বীপের অপরূপ মনমোহিনী রাজকন্যা চিত্তার কথা শুনিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া উপতিষ্য গ্রামে পেঁীছিয়া রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা পণ্ডু-বাসুদেব তাহার পরিচয় জানিয়া তাহাকে রাজ-প্রতিনিধির সহিত রাজদরবারের কাজে নিযুক্ত করিলেন। ॥ ১৩-১৪ ॥

একদিন রাজকন্যা চিত্তা তাহার প্রকোষ্ঠের বাতায়নের বিপরীতে দীঘগামনিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই যুবকের প্রতি রাজকন্যার হৃদয়ে প্রেমানল প্রজ্জ্বলিত হইল। সে পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এই যুবক?' পরিচারিকা বলিল, 'রাজকুমারী! ইনি আপনার মাতুলের পুত্র দীঘগামনি।' রাজকুমারী প্রেমে ব্যাকুল হইয়া তাহার পরিচারিকার সহিত যুক্তি করিয়া সেই যুবককে গোপনে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইতে বাতায়নের বহির্রঙ্গে একটি আঁকড়িযুক্ত সিঁড়ি রাত্রে স্থাপন করাইল। দীঘগামনি সেই রাত্রে সিঁড়ির সাহায্যে উঠিয়া বাতায়নের গরাদ ভাঙ্গিয়া রাজকন্যার প্রকোষ্ঠে গোপনে প্রবেশ করিল। ॥ ১৫-১৭ ॥

সেই রাত্রে দীঘগামনির সহিত রাজকন্যা চিত্তা তাহার সেই প্রকোষ্ঠে উষাকাল অবধি গোপনে যৌন সহবাস করিল। প্রভাত হইলে দীঘগামনি প্রকোষ্ঠের বাতায়ন দিয়াই চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিরাত্রে সকলের অলক্ষ্যে দীঘগামনি সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যা চিত্তার সহিত দৈহিক মিলনে রত হইত। রাজপ্রাসাদের কেহ ইহা জানিতে পারিল না।

॥ ১৮ ॥

অতঃপর রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হইল। রাজকন্যার স্ফীতোদর দেখিয়া পরিচারিকা নিজেকে বাঁচাইতে কথাটি রাণীর কানে দিল। রাণী ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বিষয়টি রাজাকে বলিলেন। রাজা তাঁহার পুত্রগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'দীঘগামনি

উচ্চ বংশসম্ভূত। সুতরাং তাহাকে জামাতা করা যাইতে পারে। আমরা তাহার সহিত চিত্তার বিবাহ দিলে সমস্যা মিটিয়া যাইবে।' যুবরাজগণ রাজার কথায় সম্মত হইল। কিন্তু তাহারা বলিল, 'যদি চিত্তার পুত্র সন্তান হয়, তবে আমরা সেই পুত্রকে হত্যা করিব।' রাজকন্যা চিত্তার সহিত দীঘগামনির বিবাহ হইল। ॥ ১৯-২১ ॥

রাজকন্যা চিত্তার প্রসবকাল আসন্ন হইলে তাহাকে আঁতুর ঘরে রাখা হইল। চিত্তা তাহার ভ্রাতাগণের দুর্মতি পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিল। সে তাহার পরিচারিকার সাহায্যে তাহার ন্যায় প্রসবকাল আসন্ন এক যুবতীর সন্ধানে রহিল। যুবরাজগণ চিত্তার পুত্রসন্তান হইলে সেই সন্তানকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করিতে তাহাদের গোপন সংবাদদাতা 'চিত্ত' নামক এক মেষপালক এবং দীঘগামনির দাসী 'কালবেলা'কে পূর্বেই তাঁহারা গোপনে হত্যা করিলেন। মৃত্যুর পর এই দুইজন যক্ষ হইয়া রাজকন্যা চিত্তার সন্তানকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইল। রাজকুমারী যথাকালে একটি পুত্র প্রসব করিল। সেই সময় এক যুবতী একটি কন্যা প্রসব করিল। রাজকুমারী চিত্তা এই সংবাদ পাইয়া সেই যুবতীকে রাজমহিষীর সাহায্যে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার কন্যাকে লইয়া নিজের পুত্রকে সেই যুবতীকে প্রদান করিল[২]। বিষয়টি রাজমহিষী গোপন রাখিল।

॥ ২২-২৫ ॥

যুবরাজগণ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাদের ভগিনী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা আঁতুর ঘরে ছুটিয়া গিয়া রাজকুমারী চিত্তার নিকটে একটি সদ্যজাত শিশুকন্যাকে শুইয়া থাকিতে দেখিলেন। ইহাতে তাঁহারা অতীব আনন্দিত হইলেন। রাজা পণ্ডু-বাসুদেব এবং যুবরাজ অভয়-এর নাম যুক্ত করিয়া রাজমহিষী পলাতক নবজাতকের নাম রাখিলেন 'পণ্ডুয়াভয়'। ॥ ২৬-২৭ ॥

রাজা পণ্ডু-বাসুদেব ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। যেইদিন পণ্ডুয়াভয় ভূমিষ্ঠ হইল সেই দিন রাজা পণ্ডু-বাসুদেব দেহত্যাগ করিলেন। ॥ ২৮ ॥

রাজা পণ্ড-বাসুদেব-এর মৃত্যুর পর যুবরাজগণ সর্বসম্মতিতে তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভয়শূন্য অভয়কে রাজারূপে অভিষিক্ত করিয়া মহা উৎসব করিলেন। ॥ ২৯ ॥

অভয়ের অভিষেক সমাপ্ত

এইখানে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'অভয়ের অভিষেক'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে নগরগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা বিজয়ের অমাত্যরা। এই অধ্যায়ে অন্য কথা বলা হয়েছে।

২. এই কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কাহিনীর আভাস রয়েছে।

১০

পণ্ডুয়াভয়-এর অভিষেক

'উন্মাদ করা চিত্তার' নির্দেশে তাহার নবনিযুক্তা পরিচারিকা শিশু-পুত্রটিকে একটি ঝুড়ির মধ্যে লইয়া নির্জন বনপথ ধরিয়া একাকী 'দ্বারক-মণ্ডলক'-এ চলিল। ॥ ১ ॥

সেই সময় যুবরাজগণ সেই বনে মৃগয়ায় গিয়া পরিচারিকাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোথায় চলিয়াছ?' পরিচারিকা বলিল, 'হে যুবরাজগণ! আমি দ্বারকমণ্ডলক-এ চলিয়াছি।' যুবরাজগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ঝুড়িতে কী আছে?' পরিচারিকা বলিল, 'হে যুবরাজগণ! আমি আমার কন্যার জন্য কিছু পিষ্টক তৈয়ারী করিয়া লইয়া যাইতেছি।' যুবরাজগণ পরিচারিকার কথার সত্যতা যাচাই করিতে ঝুড়ি হইতে তাহাদেব পিষ্টক বাহির করিয়া দেখাইতে বলিলেন। ॥ ২-৩ ॥

ঠিক সেই মুহূর্তে যক্ষ চিত্ত ও যক্ষী কালবেলা রাজকন্যা চিত্তার শিশু-পুত্রকে রক্ষা করিবার সংকল্পে সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া একটি প্রকাণ্ড ভাল্লুককে সেই স্হানে উপস্হিত করিল। যুবরাজগণ সেই ভাল্লুকের পশ্চাদধাবন করিলে পরিচারিকা শিশুপুত্রটিকে লইয়া দ্রুত সেই স্হান ত্যাগ করিল। ॥ ৪-৫ ॥

পরিচারিকা রাজকন্যার নির্দেশে শিশুপুত্রকে গোপনে পূর্বে নির্ধারিত এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে সহস্র মুদ্রাও প্রদান করিল। সেই দিনই সেই ব্যক্তির স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সেই ব্যক্তি সকলকে জানাইল যে তাহার স্ত্রী যমজ পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। এইরূপ বলিয়া সেই ব্যক্তি তাহার স্বীয় পুত্র ও রাজকন্যা চিত্তার পুত্রকে নিজের যমজ পুত্র বলিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। ॥ ৬ ॥

চিত্তার পুত্র সম্বন্ধে যখন তাহার ভ্রাতাগণ অবহিত হইলেন, পুত্রের বয়স তখন সাত বৎসর। ভ্রাতাগণ সত্বর সেই বালককে হত্যা করিতে অনুচরগণকে পাঠাইলেন।

এই বালক তাহার সঙ্গী বালকগণের সহিত একটি পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করিত। সেই পুষ্করিণীর জলে একটি শুষ্ক বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। সেই বৃক্ষের ফাঁপা আবরণহীন কাণ্ডটি জলের মধ্যে নিমগ্ন থাকিত। জলক্রীড়াকালে এই বালক সেই ফাঁপা কাণ্ডের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে পুষ্করিণীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইত না। সঙ্গীগণ

তাহাকে কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাদের সদুত্তর প্রদান করিত না। ॥ ৭-৯ ॥

একদিন সেই বালক সঙ্গীগণের সহিত পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করিতে গেলে, যুবরাজগণের অনুচরগণ বালকটিকে হত্যা করিতে আসিল। সঙ্গী বালকগণ যথারীতি নিজেদের অঙ্গবাস পুষ্করিণীর পারে খুলিয়া রাখিয়া জলে নামিল। কিন্তু এই বালক স্বীয় অঙ্গবাস না খুলিয়াই পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া বৃক্ষের সেই ফাঁপা কাণ্ডের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে লুকাইল।

যুবরাজগণের অনুচরগণ বালকটিকে চিনিত না। তাহারা পুষ্করিণীর পারে খুলিয়ারাখা অঙ্গবাস গণনা করিয়া যে কয়টি বালকের অঙ্গবাস রহিয়াছে সেই কয়টি বালককে জলে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বুঝিল যে উহাদের মধ্যেই সেই বালকটি রহিয়াছে। কিন্তু সেই বালক কোন্‌টি? ইহা না জানিয়া তাহারা সেইদিন সকল বালকগণকে হত্যা করিল। তাহারা ফিরিয়া গিয়া যুবরাজগণকে বলিল, 'হে প্রভু! বালকটিকে হত্যা করা হইয়াছে।' ॥ ১০-১১ ॥

অনুচরগণ তাহাদের হত্যালীলা সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেলে, সেই বালক বৃক্ষের কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া, জল হইতে উঠিয়া, পালিত পিতার গৃহে ফিরিয়া আসিল। সেই গৃহে বালক পালিত হইয়া দ্বাদশ বৎসরে উপনীত হইল। ॥ ১২ ॥

বালকের মাতুলগণ যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহাদের ভাগিনেয় এখনও জীবিত আছে এবং পশুপালকদের[১] গৃহে পালিত হইতেছে, তখন তাঁহারা অনুচরগণকে আদেশ করিলেন, যেন সেই বালকের সহিত পশুপালকগণকেও হত্যা করা হয়। ॥ ১৩ ॥

ঠিক সেইদিন কিছু পশুপালক একটি হরিণ শিকার করিয়াছিল। সেই হরিণের মাংস ঝলসাইতে অগ্নি-প্রজ্বালনের প্রয়োজন হইল। তাহারা সেই কারণে গ্রাম হইতে অগ্নি আনিতে এই বালককে গ্রামে পাঠাইল। বালক বন হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার পালিত পিতার পুত্রকে বলিল, 'হে ভ্রাত! পশুপালকরা জঙ্গলে হরিণ শিকার করিয়া উহার মাংস অগ্নিতে ঝলসাইতে আমাকে গ্রাম হইতে এক খণ্ড অগ্নি লইয়া যাইতে বলিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক হাঁটার কারণে আমার পদযুগল বেদনাগ্রস্ত। তুমি বরং তাহাদের নিকট কাষ্ঠখণ্ডে করিয়া অগ্নি লইয়া যাও। তবে তুমিও হরিণের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে।' সেই বালক জঙ্গলের পশুপালকগণের নিকট কাষ্ঠখণ্ডে করিয়া অগ্নি লইয়া গেল। ॥ ১৪-১৬ ॥

সেই সময় যুবরাজগণের অনুচররা সেই বনে গিয়া সেই বালক ও

পশুপালকগণকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া নির্মমভাবে সকলকে হত্যা করিল। তাহাদের হত্যালীলা সমাপ্ত হইলে, তাহারা ফিরিয়া গিয়া যুবরাজগণকে বলিল, 'হে প্রভু! পশুপালকগণসহ সেই বালককে হত্যা করা হইয়াছে।' ॥ ১৭ ॥

অতঃপর 'চিত্তার' পুত্র যখন ষোল বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন চিত্তার ভ্রাতাগণ শুনিলেন যে তাঁহাদের ভাগিনেয় এখনও জীবিত রহিয়াছে। সেই সময় চিত্তা তাহার পুত্রের পালিত পিতাকে একশত সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দূত মারফৎ নির্দেশ দিল, যেন তাহার পুত্রকে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্দেশে সেই পালিত পিতা প্রেরিত অর্থ এবং এক ক্রীতদাসসহ চিত্তার পুত্রকে ব্রাহ্মণ পণ্ডুলের নিকট প্রেরণ করিল। ॥ ১৮-১৯ ॥

এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডুল ছিলেন ধনাঢ্য ও দৈবজ্ঞ। তিনি দক্ষিণ প্রদেশের এক গ্রামে বাস করিতেন। যুবক সেই প্রদেশে গিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডুলর সন্ধান করিতে করিতে একসময় সেই গ্রামে গিয়া সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডুল যুবককে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে যুবক! তুমি কি রাজকন্যা চিত্তার পুত্র পণ্ডুয়াভয়?' যুবক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, গুরুজি।' ব্রাহ্মণ যুবককে তাঁহার সম্মানিত অতিথিরূপে গণ্য করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'হে পণ্ডুয়াভয়! তুমি একদিন এই দেশের রাজা হইবে এবং দীর্ঘ সত্তর বৎসর রাজত্ব করিবে। অতএব রাজোচিত শিক্ষা গ্রহণ কর।'

অতঃপর ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্র চন্দের সহিত পণ্ডুয়াভয়কে শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। অচীরে যুবরাজ শিক্ষা সমাপ্ত করিল। ॥ ২০-২৩ ॥

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে যুবরাজ গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে তাহার মাতার প্রদত্ত একশত সহস্র মুদ্রা প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সেই অর্থে পাঁচশত সুঠাম দেহের সাহসী ব্যক্তিদের যুবরাজের সৈন্যরূপে নিয়োগ করিলেন[২]।

ব্রাহ্মণ যুবরাজকে বলিলেন, 'হে পণ্ডুয়াভয়! যে কন্যার স্পর্শে বৃক্ষ পল্লবও স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, সেই কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে। আর আমার পুত্র চন্দকে তোমার ব্যক্তিগত কর্মে নিযুক্ত করিবে। সে চিরকাল তোমার বিশ্বস্ত থাকিবে।' এই নির্দেশ দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডুল যুবরাজকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার পাঁচশত সৈন্য ও চন্দসহ বিদায় দিলেন।

॥ ২৪-২৬ ॥

এইবার স্বীয় নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় কাশ পর্বতের[৩] নিকটস্থ 'পণ' নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি আরও সাতশতজনকে তাঁহার সৈন্যরূপে নিয়োগ করিলেন। তিনি সকলের জন্য রসদের ব্যবস্থাদি করিয়া মোট এক হাজার দুইশত সৈন্যসহ 'গিরিকণ্ড' নামক পর্বতে গিয়া রহিলেন। ॥ ২৭-২৮ ॥

গিরিকণ্ডশিব নামক তাঁহার এক মাতুল এই অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করিতেন। পিতা রাজা পণ্ডু-বাসুদেব এই অঞ্চলটি তাঁহার এই পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন গিরিকণ্ডশিব সেই অঞ্চলে তাঁহার এক করীস[৪] শস্যক্ষেত্রের ফসল তোলার তদারকি করিতেছিলেন। তাঁহার রূপবতী বিদুষী কন্যা 'পালী' সখিগণের সহিত শকটে করিয়া তাহার পিতা ও মজদুরগণের জন্য পক্ক অন্ন আনিতেছিল। ॥ ২৯-৩১ ॥

পণ্ডুয়াভয়ের অনুচরগণ এই রূপবতী কন্যাকে শকটে চড়িয়া সখিগণের সহিত আসিতেছে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া পণডুয়াভয়কে উহা জানাইল। ইহা শুনিয়া যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় তাঁহার শকটে চড়িয়া অনুচরগণসহ দ্রুতগতিতে ছুটিয়া গিয়া সেই রূপসী কন্যার শকটের নিকট গিয়া, সখীগণের বাধা না মানিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দেবী! এই মধ্যাহ্নে আপনি কোথায় চলিয়াছেন?' সেই কন্যা বলিল, যে সে তাহার পিতা ও মজদুরগণের জন্য শস্যক্ষেত্রে আহার্য লইয়া যাইতেছে। রূপসীকে দেখিয়া তাহার প্রতি পণ্ডুয়াভয় প্রণয়াসক্ত হইলেন। তিনি কন্যাকে বলিলেন, 'হে দেবী! আমি এবং আমার অনুচরগণও ক্ষুধার্ত।' ॥ ৩২-৩৪ ॥

ইহা শুনিয়া রূপসী কন্যা 'পালী' তাহার শকট হইতে অবতরণ করিয়া একটি বটবৃক্ষের নীচে পণ্ডুয়াভয়কে উপবেশন করাইয়া স্বর্ণথালায় তাঁহাকে আহার্য প্রদান করিল। পণ্ডুয়াভয়ের অনুচরগণকে আহার্য প্রদান করিতে পালী বটবৃক্ষের কিছু পল্লব লইতেই মুহূর্তে সেই সকল পল্লব স্বর্ণথালায় পরিণত হইল। সেই সকল থালায় পালী অনুচরগণকে আহার্য প্রদান করিয়া তৃপ্ত করিলেন। পণ্ডুয়াভয় ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ পণডুলর কথা স্মরণ হইল। খুশী মনে যুবরাজ ভাবিলেন, 'রাণী হইবার উপযুক্ত কন্যার আমি সন্ধান পাইয়াছি।' ॥ ৩৫-৩৭ ॥

কন্যা পালী সকলকে আহার্য প্রদান করিলেও যে খাদ্য লইয়া যাইতেছেন উহা কোন অংশে কমিল না। কেবল সামান্য পরিমাণ খাদ্যই খরচ হইল। উক্ত ঘটনার কারণে পরবর্তীকালে এই কন্যা 'সুবর্ণপালী' বলিয়া খ্যাত হয়। ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অতঃপর পণ্ডুয়াভয় তাহার শকটে পালীকে তুলিয়া লইয়া অনুচরসহ বীরদর্পে সেই ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। পালীর পিতা এই সংবাদ

পাইয়া কন্যাকে উদ্ধার করিতে তাঁহার লোকজন পাঠাইলেন। কিন্তু পণ্ডুয়াভয়ের অনুচরগণ তাহাদের খেদাইয়া দিল। যেই স্থানে এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় সেই স্থানে পরে 'কলহনগর[৫]' নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। ॥ ৪০-৪২ ॥

গিরিকণ্ডশিবের ভ্রাতাগণ শুনিলেন যে পণ্ডুয়াভয় ভ্রাতার কন্যা পালীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া গিরিকণ্ডশিবের পাঁচ ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া পণ্ডুয়াভয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। পণ্ডুয়াভয় তাঁহার সৈন্যদল লইয়া তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। তাঁহার পরমমিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডুলর পুত্র চন্দের হাতে তাঁহার পাঁচ মাতুলের মৃত্যু হইল। যেই স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল সেই স্থানের পরে নাম হইল 'লোহিতবাহখণ্ড[৬]'। ॥ ৪৩ ॥

বহু সৈন্যদল লইয়া যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় এইবার গিরিকণ্ড পর্বত ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে ঢোলা পর্বতে গিয়া পেঁীছিলেন। সেই স্থানে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করিলেন। ॥ ৪৪ ॥

যুবরাজ পণ্ডুয়াভয়ের অন্যান্য মাতুলগণ এই সংবাদ পাইয়া বহু সৈন্যসহ ঢোলা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। ধুমরকখ পর্বতে সুরক্ষিত ছাউনী স্থাপন করিয়া তাঁহারা ভাগিনেয়র সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ভাগিনেয় মাতুলগণকে গঙ্গার এই পারেই থামাইয়া রাখিলেন। তাঁহারা কোনমতে গঙ্গার অপর পারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অতঃপর যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং পণ্ডুয়াভয় দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের ছাউনী অধিকার করিয়া রাখিলেন।

॥ ৪৫-৪৭ ॥

যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মাতুলগণ উপতিষ্য গ্রামে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা অভয়কে সকল কিছু জানাইলেন। রাজা অভয় পণ্ডুয়াভয়কে দূত মারফত সহস্র মুদ্রা ও একটি পত্র পাঠাইলেন। সেই পত্রে রাজা অভয় এইরূপ লিখিলেন: 'হে পণ্ডুয়াভয়! তুমি গঙ্গানদীর ও-পার তোমার দখলে রাখ। এই কূলে আসিও না।' রাজার ভ্রাতাগণ ইহা শুনিয়া কোপিত হইলেন। তাঁহারা রাজা অভয়কে বলিলেন, 'মহারাজ! এতদিন ধরিয়া আপনি কেবল তাহাকেই সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আপনি সত্যই তাহার শুভাকাঙ্ক্ষ। তাহাকে যদি রাজ্য প্রদান করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করিব।' ॥ ৪৮-৫০ ॥

অতঃপর রাজা অভয় ভ্রাতাগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া রাজ্যের শাসনভার তাঁহাদের প্রদান করিলেন। তাঁহারা সর্বসম্মতিতে তাঁহাদের

এক ভ্রাতা তিষ্যকে তাহাদের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যশাসনের ভার দিলেন।

অভয়প্রদায়ী রাজাঅভয় উপতিষ্য গ্রামে অবস্থান করিয়া রাজারূপে বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ৫১-৫২ ॥

চেতিয় নামক এক যক্ষী ধূমরকখ পর্বতের তুমবরিয়ংগণ নামক পুষ্করিণীর তীরে এক ঘোটকির বেশে বিচরণ করিত। ॥ ৫৩ ॥

একদিন এক ব্যক্তি শ্বেতবর্ণের অঙ্গ বিশিষ্ট ও রক্তবর্ণের পদযুক্ত এই সুন্দরী ঘোটকিকে দেখিয়া উহা পণ্ডুয়াভয়কে গিয়া জানাইলেন। পণ্ডুয়াভয় সেই ঘোটকিকে ধরিবার জন্য দড়ির ফাঁস লইয়া সেই ঘোটকির পিছনে গেলে, ঘোটকি ভয়ে ছুটিয়া পালাইল। অদৃশ্য না হইয়া সেই ঘোটকি ছুটিলে, পণ্ডুয়াভয়ও তাহার পশ্চাদধাবন করিলেন। ॥ ৫৪-৫৬ ॥

ঘোটকি ছুটিতে ছুটিতে তুমবরিয়ংগণ পুষ্করিণীর চারিদিকে সাতবার ঘুরিয়া আসিয়া মহাগঙ্গায় ঝাঁপ দিল। তারপর জল হইতে উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে ধূমরকখ পর্বতের চারিদিকে সাতবার ঘুরিয়া আসিয়া আবার উক্ত পুষ্করিণীর চারিদিকে তিনবার ঘুরিয়া কচ্ছক নামক গঙ্গার অগভীর স্থানে পুনরায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় তখন সেই অগভীর জলে এক হাতে ঘোটকির কেশর টানিয়া ধরিলেন এবং অন্য হাতে নদীতে ভাসমান একটি তালপত্র তুলিয়া লইলেন। সুকৃতির কারণে সেই তালপত্র মুহূর্তে তরবারিতে রূপান্তরিত হইল। ॥ ৫৭-৫৯ ॥

ঘোটকিকে সেই তরবারির খোঁচা দিয়া যুবরাজ চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাকে হত্যা করিব।' ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া ঘোটকি বলিল, 'হে প্রভু! আমাকে হত্যা করিবেন না। আমি আপনাকে রাজ্য জয় করিয়া দিব।' পণ্ডুয়াভয় ঘোটকিকে জল হইতে তুলিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া স্থির রাখিয়া তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার নাক ছেদন করিলেন। সেই ছিদ্রে দড়ি চালাইয়া দড়ির সাহায্যে ঘোটকিকে আয়ত্তে আনিলেন। ঘোটকি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ॥ ৬০-৬১ ॥

রাজকন্যা চিত্তার বীরপুত্র পণ্ডুয়াভয় ঘোটকির পিঠে আরোহণ করিয়া ধূমরকখ পর্বতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই স্থানে তিনি চারি বৎসর অবস্থান করিলেন। পরে সৈন্যদলসহ সেই পর্বত ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের সঠিক ক্ষণের প্রতীক্ষায় অরিতুথ পর্বতে গিয়া সাত বৎসর অবস্থান করিয়া রহিলেন। ॥ ৬২-৬৩ ॥

পণ্ডুয়াভয়ের মাতুলগণ অরিত্থ পর্বতে পণ্ডুয়াভয়ের অবস্থানের সংবাদ পাইয়া পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের দুই ভ্রাতাকে রাখিয়া অন্য দুইজন সৈন্যসামন্তসহ অরিত্থ পর্বতের দিকে যাত্রা করিলেন। সেই পর্বতের নিকটস্থ একটি নগণ্য গ্রামে তাঁহারা শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদের এক ভ্রাতাকে সেনাপতি করিয়া সৈন্যদল দ্বারা উক্ত পর্বতের চতুর্দিক ঘিরিয়া ফেলিলেন। ॥ ৬৪-৬৫ ॥

যক্ষীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার কূটচাল গ্রহণ করিয়া যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় তাঁহার একদল সৈন্য মারফত কিছু রাজকীয় পোষাক এবং অস্ত্রশস্ত্র উপহারস্বরূপ মাতুলগণের নিকট পাঠাইয়া এই প্রস্তাব রাখিলেন, 'হে মাতুলগণ! যুদ্ধ নয়, আমি সন্ধি চাই। এই সকল আপনাদের উপহারস্বরূপ পাঠাইলাম।' মাতুলগণ উপহার গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন, 'ভাগিনেয় সন্ধি করিতে আসিলে আমরা তাহাকে বন্দি করিব।' এইরূপে মাতুলগণের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে শৈথিল্য দেখা দিল। ॥ ৬৬-৬৭ ॥

ইহা বুঝিতে পারিয়া পণ্ডুয়াভয় তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া হঠাৎ মাতুলগণের শিবির আক্রমণ করিলেন। ঘোটকির পিঠে আরোহণ করিয়া তিনি সকলের অগ্রভাগে থাকিয়া আক্রমণের নেতৃত্ব দিলেন। ঘোটকির বিকট হ্রেষাধ্বনি অসংখ্য সৈন্যগণের প্রবল আক্রোশন চীৎকারে মিশিয়া প্রচণ্ড সিংহনাদ সৃষ্টি হইল। মাতুলগণের অপ্রস্তুত সৈন্যগণ সেই নিনাদে বিহ্বল হইয়া প্রতিরোধহীন হইয়া পড়িল। এই সুযোগে পণ্ডুয়াভয়ের সৈন্যগণ মাতুলগণের সৈন্য নিধন করিল। সেনাপতি ভয়ে পলায়ন করিয়া একটি ঘনঝোপের আড়ালে লুকাইলেন। পরে এই ঝোপের নাম দেওয়া হইল 'সেনাপতিগুম্বক'। ॥ ৬৮-৭১ ॥

এই আক্রমণে যুদ্ধ করিতে আসা মাতুলগণ নিহত হইলেন। তাঁহাদের মৃতদেহ ও নিহত সৈনিকগণের মৃতদেহ স্তূপাকার হইয়া রহিল। যুদ্ধ শেষে পণ্ডুয়াভয় মৃতদেহের সেই স্তূপ দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'এ যে গাদা করা লাউয়ের ন্যায় দেখাইতেছে।' সেই স্থানটির পরে নাম হইল 'লাবুগামক'। ॥ ৭২ ॥

যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া পণ্ডুয়াভয় সসৈন্যে তাহার মাতুল অনুরাধ-এর প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবরাজ অনুরাধ বিনাবাধায় তাঁহার সুরম্য প্রাসাদ ভাগিনেয়কে অর্পণ করিয়া নিজে অন্য স্থানে স্বীয় আবাস স্থাপন করিলেন। কিন্তু পণ্ডুয়াভয় সেই প্রাসাদে থাকিলেন না। তিনি তাহার পিত্রালয়ে গিয়া অবস্থান করিলেন। ॥ ৭৩-৭৪ ॥

পরে বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞের পরামর্শ লইয়া পণ্ডুয়াভয় স্বীয় গ্রামের নিকটে তাহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। একসময় এই স্থান ছিল তাঁহার মাতুল

অনুরাধ এবং তাঁহার পিতৃব্য অনুরাধ-এর আবাসস্থল। সেই কারণে স্থানটির নাম হইল অনুরাধপুর[৮]। স্থানটি অনুরাধা নক্ষত্রের দৃষ্টিযুক্তও ছিল। নামকরণের ইহাও একটি কারণ। যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় মাতুল অনুরাধ হইতে রাজছত্রটি আনিয়া উহা অনুরাধপুরের প্রকৃতিদত্ত পুষ্করিণীর[৯] জলে ধৌত করিলেন। ॥ ৭৫-৭৭ ॥

যুবরাজ পণ্ডুয়াভয় সেই রাজছত্র নিজের নিকট রাখিলেন এবং অনুরাধপুরের পুষ্করিণীর জল দিয়া তাঁহার অভিষেক কার্য সম্পন্ন হইল। নর্মসঙ্গিণী সুবর্ণপালীকেও সেই জল দিয়া তাঁহার রাজমহিষীরূপে অভিষিক্ত করা হইল। ॥ ৭৮ ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডুলের পুত্র চন্দকে রাজা পণ্ডুয়াভয় তাঁহার ব্যক্তিগণ সচিব-রূপে নিযুক্ত করিলেন। অন্যান্য অনুচরদের তাহাদের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হইল। ॥ ৭৯ ॥

রাজা পণ্ডুয়াভয় এবং তাঁহার মাতা চিত্তার সহিত জ্যেষ্ঠ মাতুল অভয়ের যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। সেই কারণে রাজা তাঁহাকে হত্যা করিলেন না। উপরন্তু রাজার বিশ্রামকালে রাজ্য দেখাশোনার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। রাজা নিজেকে 'নগরগুটটিকা' রূপে রাখিলেন। সেই সময় হইতে রাজধানীতে এই নতুন পদের উদ্ভব হইল।

রাজা পণ্ডুয়াভয় তাঁহার মাতুল ও শ্বশুর গিরিকণ্ডশিবকেও হত্যা করিলেন না। গিরিকণ্ড প্রদেশ পূর্বের ন্যায় তাঁহাকে প্রদান করা হইল। রাজা অনুরাধপুরের পুষ্করিণীর সংস্কার করিলেন। সেই পুষ্করিণী সর্বদা জলে পূর্ণ রহিল। বিজয়ী রাজার অভিষেকের জন্য এই পুষ্করিণীর জল ব্যবহৃত হওয়ায়, এই পুষ্করিণীর নাম রাখা হইল 'জয়বাপি'। ॥ ৮০-৮৩ ॥

যক্ষী কালবেল'কে রাজা নগরের পূর্বদিকে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যক্ষ চিত্তকে 'অভয়বাপি' পুষ্করিণীর শেষ প্রান্তে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রাসাদ-অঙ্গণে যক্ষী ঘোটকির বাসের ব্যবস্থা হইল। প্রতি বৎসর রাজা এই সকল যক্ষ-যক্ষীগণকে 'বলী' উপহার দিতেন। উৎসবের দিনে রাজা চিত্ত-যক্ষের সহিত পাশাপাশি বসিয়া নাচ-গান উপভোগ করিতেন। ॥ ৮৪-৮৮ ॥

রাজা পণ্ডুয়াভয় নগরের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে 'অভয়বাপি' এবং এই সকল স্থাপন করিলেন—সৎকার ভূমি, বধ্য ভূমি, পশ্চিমের দেশ হইতে আগত রাণীগণের ভজনাগারযুক্ত অঞ্চল, বটবৃক্ষ সমৃদ্ধ বেসসবন, তালবৃক্ষ সমৃদ্ধ শবরগণের দেবভূমি, যবনগণের অঞ্চল ও মহাযজ্ঞ ভূমি। এই সকল স্থাপিত হইল নগরের পশ্চিম তোরণের নিকটে। ॥ ৮৯-৯০ ॥

নগরের রাজপথগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে রাজা পাঁচশত চণ্ডালকে নিযুক্ত করিলেন। পয়ঃপ্রণালীগুলি পরিষ্কারের জন্য দুইশত চণ্ডালকে নিযুক্ত করা হইল। মৃতদেহ সৎকারের জন্য দেড়শত চণ্ডালকে, এবং সৎকারস্থান দেখাশোনার জন্য পঞ্চাশ জন চণ্ডালকে নিয়োগ করা হইল। চণ্ডালগণের বসবাসের জন্য রাজা সৎকারভূমির উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি গ্রাম স্থাপন করিলেন। চণ্ডালগণ সকল সময় সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম করিত। ॥ ৯১-৯৩ ॥

চণ্ডালগণের গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে তাহাদের মৃতদের সৎকারের জন্য একটি সৎকারভূমি স্থাপন করিলেন। এই স্থানের উত্তরে এবং পাষাণ পর্বত অবধি রাজা শবরগণদের জন্য সারিবদ্ধ কুটির নির্মাণ করিয়া দিলেন। এই স্থানের উত্তরে এবং গামনি-পুষ্করিণী অবধি রাজা সন্ন্যাসীগণের জন্য আশ্রম-কুটির নির্মাণ করিলেন। চণ্ডালগণের সৎকারভূমির পূর্বদিকে রাজা জ্যোতিয় নামক এক নিগ্রন্থীর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন। সেই অঞ্চলে গিরি নামক এক নিগ্রন্থী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর সন্ন্যাসীগণও অবস্থান করিতেন। জগৎপতি সেই অঞ্চলে 'কুমভণ্ডু' নামক এক নিগ্রন্থীকে একটি উপাসনাগার নির্মাণ[১০] করিয়া দিলেন। সেই উপাসনাগার সেই নিগ্রন্থীর নামেই খ্যাত হইল। ॥ ৯৪-৯৯ ॥

উক্ত স্থান হইতে পশ্চিমে এবং শবরগণের অঞ্চলের পূর্বদিকে ছিল পাঁচশত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পরিবারগণের বাস। নিগ্রন্থী জ্যোতিষের গৃহের অধিকতর উত্তরে ও গামনি-পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে রাজা পরিব্রাজকগণের জন্য, আজীবকগণের জন্য ও ব্রাহ্মণগণের জন্য, বিভিন্ন বিহার নির্মাণ করিলেন। সেই অঞ্চলেই রাজা রোগীগণের জন্য হাসপাতাল ও আরোগ্য-নিকেতন স্থাপন করিলেন। ॥ ১০০-১০২ ॥

রাজা পণ্ডুয়াভয় অভিষেকের দশ বৎসর পর লঙ্কার অধিপতি হইয়া সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের সকল গ্রামগুলির সীমানা নির্ধারণ করিলেন। যক্ষী কালবেল ও যক্ষ চিত্ত দেহধারণ করিলে রাজা তাহাদের সহিত তাঁহার সৌভাগ্য উপভোগ করিলেন। অন্যান্য যক্ষ এবং অশরীরীগণও রাজার মিত্র ছিল। ॥ ১০৩-১০৪ ॥

রাজা অভয় এবং রাজা পণ্ডুয়াভয়-এর মধ্যস্থ সময়ের দীর্ঘ সতেরো বৎসর লঙ্কাদ্বীপের কোন রাজা ছিলেন না। ॥ ১০৫ ॥

জগৎপতি মতিধর রাজা পণ্ডুয়াভয় সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হন। তিনি পূর্ণ সত্তর বৎসর অপরূপ ও সমৃদ্ধশালী অনুরাধাপুরে রাজত্ব করেন। ॥ ১০৫ ॥

পণ্ডুয়াভয়-এর অভিষেক সমাপ্ত

এইখানে দশম অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় হইল 'পণ্ডুয়াভয়-এর অভিষেক'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-উপাখ্যানের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে।
২. রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জন্য চাণক্য'এর সৈন্য সংগ্রহের কথাই যেন এখানে নবরূপে বলা হয়েছে।
৩. অনুরাধপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই পাহাড় রয়েছে।
৪. এক একর ভূমি
৫. লঙ্কাদ্বীপের মধ্যস্থলে ছিল এই প্রাচীন গ্রাম
৬. রক্তের প্রবাহ স্থল
৭. মহাগঙ্গা নদী
৮. পূর্বে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কোন মিল নেই। এখানে অনুরাধপুরের নামকরণের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৯. পূর্বে বলা হয়েছে যে, পুষ্করিণীটি যুবরাজ অনুরাধ স্থাপন করেছিলেন। এখন বলা হলো, পুষ্করিণীটি ছিল প্রকৃতিদত্ত।
১০. জৈনধর্ম পূর্বে থেকে লঙ্কাদ্বীপে রাজানুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত ছিল মনে হয়।

১১

দেবানংপিয় তিষ্য-এর অভিষেক

রাজা পণ্ডুকাভয়'এর মৃত্যুর পর রাজমহিষী সুবর্ণপালীর গর্ভজাত পুত্র, মুটশিব নামে খ্যাত, রাজার উত্তরাধিকারীরূপে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই রাজা খ্যাতি সম্পন্ন সুরম্য 'মহামেঘবন[১]' উদ্যানটিকে বহু ফল-ফুলের বৃক্ষে সুবিন্যস্ত করিয়া সাজাইলেন। এই উদ্যানের ভূমি সংস্কার কালে মহামেঘ অকালে আকাশে উৎপন্ন হইয়া প্রবল বর্ষণ হইয়াছিল। সেই কারণে এই উদ্যানের নাম হইয়াছিল 'মহামেঘবন'। ॥ ১-৩ ॥

রাজা মুটশিব লংকার মনোরম অনুরাধপুরে ষাট বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। রাজার দশটি পুত্র ও দুইটি কন্যা ছিল। পুত্রগণ পরস্পরের হিতের চিন্তা করিতেন। কন্যাগণ রূপে গুণে রাজপরিবারের যোগ্যাই ছিলেন। দেবানংপিয়[২] তিষ্য নামে খ্যাত রাজার দ্বিতীয় পুত্র মেধায় এবং সদ্‌গুণে পুত্রকন্যাগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। ॥ ৪-৬ ॥

রাজা মুটশিব-এর মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবানংপিয় তিষ্য রাজা হইলেন। তাঁহার অভিষেককালে বহু আশ্চর্য ঘটনা[৩] ঘটিয়াছিল। লংকাদ্বীপের ভূমির গভীরে নিহিত মণিরত্নাদি ভূমিভেদ করিয়া ভূমির উপরে উঠিয়া আসিল। মণিরত্নাদিতে বোঝাই জাহাজ প্রবল ঝড়ে সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে, সেই জলমগ্ন জাহাজের রত্নাদি এবং প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রগর্ভে সৃষ্ট রত্নাদি হঠাৎ সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিল। ॥ ৭-৯ ॥

ছাত পর্বতের সানুদেশে তিনটি বাঁশের গোড়া জন্মিল। ইহাদের ঘের রথদণ্ডের সামিল। একটি ছিল উজ্জ্বল রূপালী বর্ণের। উহার অঙ্গ সুবর্ণবর্ণের লতায় জড়াইয়া ছিল। আর একটিতে ছিল বহুবর্ণের ফুটন্ত ফুলের শোভা। তৃতীয়টিতে ছিল বহুবর্ণের বহু প্রজাতির পাখিদের অবস্থান। ॥ ১০-১৩ ॥

আট প্রকারের মুক্তা যথা, অশ্ব-মুক্তা[৪], হস্তী-মুক্তা[৫], রথ-মুক্তা[৬], হরিতকী-মুক্তা[৭], কাঁকুড়-মুক্তা[৮], মনিবন্ধের-মুক্তা, অঙ্গুরির-মুক্তা, ও সাধারণ মুক্তা[৯] মহাসাগর হইতে উঠিয়া আসিয়া বেলাভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। ॥ ১৪-১৫ ॥

এই সকল অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল রাজা দেবানংপিয় তিষ্য-এর সুকৃতীর কারণে। রাজার অভিষেকের সেই সপ্তাহেই প্রজাগণ উক্ত তিনটি বাঁশের গোড়া, উক্ত আট প্রকার মুক্তা, বহু মণিরত্ন, এবং নীলকান্তমণি,

ফিরোজা, পদ্মরাগমণি প্রভৃতি রাজাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন।
॥ ১৬-১৭ ॥

রাজা প্রজাগণের প্রদত্ত উপহার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন, 'এই সকল অমূল্য সম্পদ আমার মিত্র ধর্মাশোক[১০] ব্যতীত অন্য কোন রাজাই প্রাপ্তির যোগ্য নয়। অতএব আমি এই সকল তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব।' এই দুই রাজার মধ্যে বহুপূর্বে হইতে মিত্রতা ছিল[১১]। কিন্তু তাঁহাদের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। ॥ ১৮-১৯ ॥

রাজা চারিজন ব্যক্তিকে যথা, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহামন্ত্রী মহারিট্‌ঠ, রাজ পুরোহিত, অমাত্য এবং কোষাধ্যক্ষকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বহু অনুচরসহ উক্ত উপহারগুলি দিয়া রাজা ধর্মাশোকের নিকট পাঠাইলেন।

॥ ২০-২২ ॥

রাজার প্রতিনিধি ও অনুচরগণ উক্ত উপহারসকল লইয়া জম্বুকোল[১২] বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রপথে সপ্তম দিবসে তামবলিত্তী[১৩] পোতাশ্রয়ে নিরাপদে পেঁীছিয়া, সেই স্থান হইতে, আরও সাতদিন পর পাটলিপুত্তে[১৪] গিয়া পেঁীছিলেন। তাঁহারা রাজার প্রদত্ত উপহার রাজা ধর্মাশোকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ॥ ২৩-২৪ ॥

রাজা ধর্মাশোক এই সকল উপহার দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন, 'এইরূপ মহামূল্যবান বস্তু আমার রাজ্যে নাই।' রাজা প্রীত হইয়া মহারিট্‌ঠকে সম্মানসূচক 'সেনাধ্যক্ষ' খেতাবে ভূষিত করিলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরোহিতের খেতাব প্রদান করিলেন। অমাত্যকে তাঁহার 'রাজদণ্ডধারী' খেতাব দিলেন, এবং কোষাধ্যক্ষকে 'পৌরপিতা' খেতাবে ভূষিত করিলেন। এইরূপে রাজা ধর্মাশোক লংকাদ্বীপের রাজার প্রতিনিধিগণকে সম্মান[১৫] প্রদান করিলেন।
॥ ২৫-২৬ ॥

রাজা ধর্মাশোক তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের প্রভূত বিষয়সকল প্রদান করিলেন এবং বাসের জন্য মনোরম আগারের ব্যবস্থা করিলেন। ॥ ২৭ ॥

অতঃপর রাজা তাঁহার অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে প্রতিদানে তিনি কীরূপ উপহার লংকাদ্বীপের রাজাকে পাঠাইবেন। অমাত্যগণের মতানুসারে রাজা ধর্মাশোক এই সকল বস্তু তাঁহার মিত্র লংকাদ্বীপের রাজা তিষ্যকে পাঠাইলেন, যথা—চামর, উষ্ণিষ, তরবারি, ছত্র, পাদুকা, মাথার পাগড়ি, কানের অলংকার, কোমর বন্ধনী, কলস, হলুদ বর্ণের চন্দন কাষ্ঠ, রাজপোষাক (যাহা ধৌত করিতে হয় না), মূল্যবান রুমাল, নাগগণের প্রদত্ত অনুলেপন, রক্তবর্ণের মৃত্তিকা, অনোতত্ত হ্রদের নির্মল জল, বড় স্বর্ণথালি, মূল্যবান পালকী, হলুদ বর্ণের হরিতকী,

ঔষধি গাছ-গাছড়া, ছয় হাজার শকটপূর্ণ সুমিষ্ট পাহাড়ী ধান্য (টিয়া পাখিদের প্রদত্ত), গঙ্গার জল, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, পূর্ণ যৌবনা যুবতীগণ ইত্যাদি সকলবস্তু যাহা রাজ-অভিষেক[১৬] উৎসবে প্রয়োজন হয়। এই সকল উপহারের সঙ্গে পাঠাইলেন রাজার প্রতিনিধিগণকে বুদ্ধের ধর্মদর্শন সহ।

॥ ২৮-৩২ ॥

রাজা তাঁহার প্রতিনিধিগণের মারফত রাজা তিষ্যকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হে মিত্র! আমি বুদ্ধে, ধর্মে ও সঙ্ঘে শরণ লইয়াছি। শাক্যপুত্রের[১৭] উপাসকরূপে আমি আজীবন থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি। আপনিও পরম বিশ্বাসে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করুন। এই রত্নই পরম শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বরূপ।' ॥ ৩৩-৩৫ ॥

রাজা ধর্মাশোক রাজা তিষ্যের প্রতিনিধিগণকে সসম্মানে বিদায় জানাইতে গিয়া তাঁহাদের বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! আমার পরম মিত্রকে আপনারা রাজারূপে পুনর্বার অভিষিক্ত করুন।' ॥ ৩৬ ॥

পাঁচ মাস ধরিয়া তিষ্যের প্রতিনিধিগণ রাজা ধর্মাশোকের আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া, বৈশাখের পূর্ণিমার প্রথম দিনে তাঁহারা রাজা ধর্মাশোকের প্রতিনিধিগণের সহিত তামবলিত্তী বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিয়া জম্বুকোল বন্দরে পৌঁছিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন।

অতঃপর দ্বাদশ দিবসে তাঁহারা সকলে রাজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা অশোকের প্রতিনিধিগণ রাজা ধর্মাশোকের প্রদত্ত উপহার-সকল রাজা দেবানংপিয় তিষ্যের হাতে অর্পণ করিলেন। লঙ্কাদ্বীপের রাজা প্রতিনিধিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ॥ ৩৭-৩৯ ॥

রাজার প্রিয় অনুচরগণ রাজাকে পূর্বে মৃগশির মাসের পূর্ণিমার প্রথম দিবসে অভিষিক্ত করিলেও রাজা ধর্মাশোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে বৈশাখের পূর্ণচন্দ্রের কালে পুনর্বার তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ও রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধির কামনায় তাঁহারা রাজার অভিষেক উৎসবে আনন্দ করিলেন।

॥ ৪০-৪১ ॥

অতএব বৈশাখের পূর্ণচন্দ্রে দেবানংপ্রিয় তিষ্য প্রজাগণের হিতার্থে পুনর্বার অভিষিক্ত হইলেন। রাজ্যের চতুর্দিকে এই কারণে মহা উৎসব হইল। ॥ ৪২ ॥

দেবানংপিয় তিষ্যের অভিষেক সমাপ্ত

এইখানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। মহাবংশ-এর এই অধ্যায় 'দেবানংপিয় তিষ্যের অভিষেক'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল

টীকা

১. স্থানটি অনুরাধাপুরের দক্ষিণে। পরে এখানে একটি বিহার স্থাপন করা হয়।
২. এই আখ্যা রাজা অশোকেরও ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে এটা পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিধ প্রিন্সেপ সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে 'দেবানংপিয়' কথাটি সম্রাটের আখ্যারূপে পেয়ে প্রথমে ভেবেছিলেন শিলালিপিগুলি বোধ হয় লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন রাজা তিষ্যের। পরে এই 'মহাবংশ' গ্রন্থটি পড়ে তিনি বুঝলেন যে তা নয়, আসলে ওগুলো সম্রাট অশোকের। এই নামে যে ভারতবর্ষে এক রাজা ছিলেন সেটা উনি বুঝতে পারেন তখন। এই 'মহাবংশ' গ্রন্থ ও শিলালিপি যৌথভাবে সাহায্য করে সম্রাট অশোককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে।
৩. এইসব আশ্চর্য ঘটনার কথা 'থূপবংশ' গ্রন্থেও আছে।
৪. অমসৃণ মুক্তা। এগুলো রাজারা ঘোড়ার লাগামে লাগাতেন।
৫. সাদা মুক্তা। এই মুক্তা হাতীর পোষাকে লাগানো হতো।
৬. অমসৃণ নিষ্প্রভ মুক্তা। এগুলো রথে লাগানো হতো।
৭. হরীতকী আকারের বড় মুক্তা।
৮. বড় আকারের মুক্তা।
৯. যে সকল মুক্তা ভস্ম করে ওষুধে ব্যবহার করা হয়।
১০. ভারত-সম্রাট অশোক।
১১. লঙ্কাদ্বীপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যতা ছিল।
১২. লঙ্কাদ্বীপের উত্তর অঞ্চলে ছিল এই বন্দর।
১৩. প্রাচীন তাম্রলিপ্ত (বর্তমানের তমলুক)।
১৪. বর্তমানের পাটনা শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে ছিল এই প্রাচীন শহর।
১৫. তৎকালে ভারতবর্ষের রাজারা এইভাবে অভ্যাগতদের সম্মান প্রদর্শন করতেন।
১৬. রাজার অভিষেকে প্রয়োজনীয় 'অষ্টমঙ্গল' স্বরূপ বস্তু হলো—চামর, উষ্ণিষ, তরবারি, ছত্র, পাদুকা, মাথায় পাগড়ি, গঙ্গার জলপূর্ণ কলস, এবং শঙ্খ।
১৭. গৌতম বুদ্ধকে বলা হয়েছে।

১২

নানা দেশে ধর্মস্থাপন

বিজয়ী বীরের[১] ধর্ম অত্যুজ্জ্বলকারী ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত যখন তৃতীয় মহাধর্ম সম্মেলনের সমাপ্তি[২] ঘোষণা করিলেন, তখন দূরদর্শী এই ভিক্ষু পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ভবিষ্যতে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা পরিলক্ষিত করিয়া, কার্তিক মাসে এক একজন ভিক্ষুকে এইখানে সেইখানে প্রেরণ করিলেন। ॥ ১-৩ ॥

এই ভিক্ষু কাশ্মীর ও গান্ধারে[৩] ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক-কে পাঠাইলেন। মহিষমণ্ডল[৪]-এ ভিক্ষু মহাদেবকে পাঠাইলেন। ভিক্ষু রক্ষিতকে বনবাস[৫] অঞ্চলে পাঠাইলেন। যোন ভিক্ষু ধম্মরক্ষিত-কে অপরান্তক[৬] প্রদেশে পাঠাইলেন। ভিক্ষু মহাধম্মরক্ষিত-কে মহারট্‌ঠ[৭] প্রদেশে পাঠাইলেন। ভিক্ষু মহারক্ষিত-কে যোনগণের অঞ্চলে[৮] পাঠাইলেন। ভিক্ষু মজ্‌ঝিম-কে হিমাচল[৯] প্রদেশে পাঠাইলেন। দুইজন ভিক্ষু সোন ও উত্তর-কে সুবর্ণ-ভূমিতে[১০] পাঠাইলেন। আর মহাস্থবির মহিন্দ-কে[১১] এবং তাঁহার শিষ্যগণ ইট্‌ঠিয়, উত্তিয়, সম্‌বল ও ভদ্‌দশাল—এই পাঁচজন ভিক্ষুকে তিনি এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিয়া পাঠাইলেন, 'আপনারা মনোরম লঙ্কাদ্বীপে বিজয়ী বীরের মনোরম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন।' ॥ ৪-৮ ॥

সেই সময় কাশ্মীর ও গান্ধারে 'অরভাল' নামক এক মহা অলৌকিক শক্তিধর নাগরাজা পক্ক শস্যের ক্ষেত্রে অকাল শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ফসল নষ্ট করিত। নির্দয়ভাবে মহাপ্লাবন সৃষ্টি করিয়া সারা দেশ নিমজ্জিত করিত। ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক শূন্যে বায়ু ভেদ করিয়া প্রবল বেগে সেই প্রদেশে গিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন করিতে অরভাল-এর[১২] হ্রদের জলের উপর দিয়া হাঁটিলেন ও অন্যান্য অলৌকিক দৃশ্য দেখাইলেন। এই সকল দেখিয়া নাগগণ প্রচণ্ড রোষে সংবাদটি তাহাদের রাজাকে প্রদান করিল। ॥ ৯-১১ ॥

অতঃপর নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ভিক্ষুকে ভীত করিতে প্রচণ্ড ঝড়-জলের সৃষ্টি করিল। আচমকা প্রচণ্ড বজ্র বিদ্যুতের সমষ্টিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইল। গাছপালা ও পর্বতশৃঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হইল। নাগগণ নানা আকৃতি ধারণ করিয়া চতুর্দিকের লোকজনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিল। আর তাহাদের রাজা তাহার মুখগহ্বর হইতে অগ্নি এবং ধূম্র নির্গত করিয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল। ॥ ১২-১৪ ॥

কিন্তু ভিক্ষু মজ্‌ঝন্তিক-এর অলৌকিক শক্তি নাগগণের সৃষ্ট উক্ত

ভীতিপ্রদ পরিবেশকে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করিল। ভিক্ষু স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করিয়া নাগরাজকে বলিলেন, 'হে নাগরাজ! যদি সমগ্র বিশ্বের শক্তিধর দেবতাগণ একত্রিত হইয়া আমাকে ভীতি প্রদর্শন করে, তবুও উহা কার্যকর হইবে না। তাহাদের সম্মিলিত শক্তি আমার শক্তির সমকক্ষ হইবে না। যদি সমুদ্র ও পর্বতসহ সমগ্র বিশ্বকে উত্তোলন করিয়া আমার উপর নিক্ষেপ কর, তবুও উহাতে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদ্রেক করিতে পারিবে না। ইহাতে বরং তোমরাই ধ্বংস হইবে। ॥ ১৫-১৮ ॥

ভিক্ষুর এই উক্তিতে নাগগণ শান্ত ও বিনম্র হইল। তখন ভিক্ষু তাহাদের ধর্মদেশনা করিলেন। নাগরাজ ধর্মদেশনা শুনিয়া ত্রিরত্নে[১৩] ও শীলে[১৪] শরণ লইল। চুরাশি হাজার নাগগণ, বহু গন্ধর্ব, যক্ষ ও হিমালয় অঞ্চলের কুম্ভণ্ডকগণও[১৫] ত্রিরত্নে এবং শীলে শরণ লইল। পণ্ডক নামক যক্ষ, তাহার পত্নী যক্ষী হারিতা এবং তাহাদের পাঁচশত পুত্রগণ ভিক্ষুর ধর্মদেশনায় স্রোতাপত্তি প্রাপ্ত হইল। ॥ ১৯-২১ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মজ্ঝন্তিক সকলকে বলিলেন, 'হে উপাসকগণ! পূর্বের ন্যায় আর যেন কখনও তোমাদের চিত্তে রাগের উদয় না হয়। আর কখনও ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিও না। জীবসকল সুখ-শান্তি প্রত্যাশী। তাই সকল জীবের প্রতি প্রেমময় হইবে। সকলে যেন সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে।' সকলে এই উপদেশ মান্য করিল। ॥ ২২-২৩ ॥

নাগরাজ রত্নখচিত সিংহাসনে ভিক্ষুকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুকে পাখার বাতাস করিল। কাশ্মীর এবং গান্ধার প্রদেশের অধিবাসীগণ নাগরাজার ভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে সৌজন্য দেখাইতে আসিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিয়া বুঝিলেন যে, এই ভিক্ষু নাগরাজ অপেক্ষা শক্তিশালী। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা নাগরাজার পরিবর্তে ভিক্ষুকেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। তখন ভিক্ষু তাঁহাদের বুদ্ধের 'আসিবিষুপমা[১৬]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। ॥ ২৪-২৬ ॥

আশী হাজার ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা লইয়া উপাসক হইলেন। এক লক্ষজন ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে কাশ্মীর এবং গান্ধার রাজ্য গৈরিক চীবরে আলোকিত হইল, এবং সকল রত্ন অপেক্ষা ত্রিরত্নই দুই দেশের প্রধান রত্ন হইল। ॥ ২৭-২৮ ॥

ভিক্ষু মহাদেব মহিষমণ্ডল রাজ্যে গিয়া মহা সমাবেশে বুদ্ধের 'দেবদূত[১৭]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। চল্লিশ হাজার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ ধর্মে দীক্ষা লইয়া উপাসক হইলেন। আর চল্লিশ হাজার ব্যক্তিগণ ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ২৯-৩০ ॥

ভিক্ষু রক্ষিত 'বনবাস' অঞ্চলে গিয়া এক মহা সমাবেশের উপরে শূন্যে ভাসমান থাকিয়া বুদ্ধের 'অনমতগ্গ-সংযুক্ত[১৮]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। ইহাতে ষাট হাজার ব্যক্তি ধর্মে দীক্ষা লইয়া উপাসক হইলেন ও সাঁইত্রিশ হাজার ব্যক্তি ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেই প্রদেশে পাঁচশত বিহারও নির্মিত হইল। ভিক্ষু এইরূপে উক্ত প্রদেশে বিজয়ী বীরের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ॥ ৩১-৩৩ ॥

যোন ভিক্ষু ধম্মরক্ষিত 'অপরান্তক' প্রদেশে গিয়াছিলেন। সেই প্রদেশের মহতী জনসমাবেশে ভিক্ষু বুদ্ধের 'অগ্গিখন্ধোপমা[১৯]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। ধর্মের মধু পান করিয়া সাঁইত্রিশ হাজার জীবসকল ধর্মে দীক্ষা লইয়া উপাসক হইলেন। এক হাজারেরও অধিক নর-নারীগণ ভিক্ষুর নিকট অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ৩৪-৩৬ ॥

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহাধম্মরক্ষিত মহারট্ঠ প্রদেশে গিয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এক মহতী সমাবেশে ভিক্ষু 'মহানারদ-কশ্যপ' জাতকটি বলিয়া উহার ধর্মোপদেশ ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। চুরাশি হাজার ব্যক্তিগণ মুক্তিপথপ্রদায়ী ধর্মে যুক্ত হইলেন। ত্রিশ হাজার ব্যক্তিগণ ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ৩৭-৩৮ ॥

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহারক্ষিত যোন রাজ্যে গিয়া তথায় এক বিরাট জনসমাবেশে বুদ্ধের 'কালকারাম[২০]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। একশত সত্তর হাজার জীবসকল মুক্তিপথপ্রদায়ী ধর্মে যুক্ত হইলেন। দশ হাজার ব্যক্তিগণ ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ৩৯-৪০ ॥

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মজ্ঝিম চারিজন[২১] ভিক্ষুসহ হিমাচল প্রদেশে গিয়া তথায় এক মহতী জনসমাবেশে বুদ্ধের 'ধম্মচক্কপবত্তন[২২]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইলেন। আট কোটি প্রাণীগণ ইহাতে মুক্ত হইলেন। এই পাঁচজন ভিক্ষু উক্ত প্রদেশের পাঁচ দিকে গিয়া প্রত্যেকে এক লক্ষ করিয়া ব্যক্তিগণকে সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মে বিশ্বাস করাইয়া প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন। ॥ ৪১-৪৩ ॥

অলৌকিক শক্তিধর ভিক্ষু সোণ ভিক্ষু উত্তরসহ সুবর্ণভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সুবর্ণভূমিতে এক সামুদ্রিক যক্ষী সেই দেশের রাজা এবং রাজ্যবাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজার কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে এই ভয়ংকর যক্ষী সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়া রাজপ্রাসাদের সেই সদ্যজাত শিশুকে ভক্ষণ করিয়া চলিয়া যাইত। এইরূপেই চলিতেছিল। ॥ ৪৪-৪৫ ॥

যেইদিন এই ভিক্ষুদ্বয় সেই দেশে পদার্পণ করিলেন, সেইদিন রাজমহিষী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রাজ্যবাসীগণ এই অচেনা দুই ব্যক্তিকে

দেখিয়া ভাবিল, 'ইহারা নিশ্চয়ই সেই যক্ষীর অনুচর'। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভিক্ষুদের হত্যা করিতে গেলে, ভিক্ষুগণ তাহাদের থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে রাজ্যবাসীগণ! তোমরা এইরূপ ক্রুদ্ধ আচরণ করিতেছ কেন? আমরা শুদ্ধ তপস্বী মাত্র, কোনরূপ যক্ষীর অনুচর আমরা নই।' ॥ ৪৬-৪৮ ॥

সেই মুহূর্তে সেই যক্ষী তাহার অনুচরগণকে লইয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া সেই স্থানে আসিল। তাহাদের দেখিয়া উপস্থিত রাজ্যবাসীগণ ভীত হইয়া প্রবল আর্ত চীৎকার করিতে লাগিল। ভিক্ষু সোণ তৎক্ষণাৎ অলৌকিক শক্তিতে দ্বিগুণ ভয়ংকর ও দ্বিগুণ সংখ্যক যক্ষ সৃষ্টি করিয়া সেই যক্ষী ও তাহার অনুচরগণকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যক্ষী এই সকল যক্ষদের দেখিয়া ভাবিল, 'এই রাজ্য এখন এই সকল ভয়ংকর যক্ষগণের অধিকারে।' প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সেই যক্ষী ও তাহার অনুচরগণ সেই স্হান ত্যাগ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। ভিক্ষু রাজ্যের চারিদিকে প্রাকার সৃষ্টি করিয়া দিল। রাজ্যবাসীগণ ভিক্ষুর প্রতি প্রীত হইলে ভিক্ষু তাহাদের বুদ্ধের ব্রহ্মজাল[২৩] সুত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। বহু নর-নারী ইহা শুনিয়া ত্রিরত্নে এবং শীলে শরণ লইলেন। ষাট হাজার ব্যক্তিগণ বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা লইলেন। উচ্চবংশ সম্ভূত ষাট হাজার ব্যক্তিগণ ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। দেড় হাজার নারীগণ ভিক্ষুণী হইলেন।

রাজা তাঁহার নবজাত পুত্রের নাম দিলেন সোণুত্তর। ॥ ৪৯-৫৪ ॥

এইসকল মুক্তিপ্রাপ্ত মহাকারুণিক বুদ্ধের ভিক্ষুগণ নানা দেশে গিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে বুদ্ধের ধর্ম স্হাপন করিলেন। এই মুক্তিপ্রদায়ী কার্যে কেহ কি ক্লান্ত হইতে পারেন? ॥ ৫৫ ॥

নানা দেশে ধর্মস্থাপন সমাপ্ত

এইখানে দ্বাদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। 'মহাবংশ' গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল—'নানা দেশে ধর্মস্হাপন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. গৌতম বুদ্ধ।

২. সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় মহা ধর্মসম্মেলন হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য। অধিবেশন চলেছিল নয় মাস। শুরু হয় মাঘ মাসে এবং শেষ হয় আশ্বিন মাসে। ফ্লিট বলেছেন, এই সম্মেলন হয় খ্রিঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে (**Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, page 426**)।

৩. প্রাচীন গান্ধার রাজ্য ছিল উত্তর পাঞ্জাবের পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে অঞ্চলটি (বর্তমানে পাকিস্তানে)।

৪. অনেকে বলেন, বর্তমানের মহীশূর প্রদেশের উত্তর অঞ্চল। আবার ফ্লিট্ বলেছেন, এই প্রদেশটি ছিল নর্মদা নদীর ধারে, বা বর্তমান 'মনধাত' অঞ্চল।

৫. বনাঞ্চল (দক্ষিণ ভারতের বর্তমান 'বনবাসী' অঞ্চল)।

৬. বর্তমানের গুজরাট, কাথিয়াওয়াড়, কচ্ছ ও সিন্ধু অঞ্চল।

৭. বর্তমানের মহারাষ্ট্র প্রদেশ।

৮. বর্তমানের শিয়ালকোট অঞ্চল (পাকিস্তানে)।

৯. বর্তমানের হিমাচল প্রদেশ।

১০. বর্মা বা মায়ানমার। অবশ্য এই নিয়ে দ্বিমত আছে। অনেকে বলেন এটা হচ্ছে বাংলার প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ। আবার অনেকে বলেন, মধ্য ভারতের সোন নদীর কূলে ছিল প্রাচীন হিরণ্যবাহু প্রদেশ। এইটা হচ্ছে সেই অঞ্চল। এটা বর্মা হতে পারে না, কারণ সেই দেশে চীন থেকেই প্রথম মহাযানী বৌদ্ধধর্ম আসে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে। মগধ থেকে কেউ তার পূর্বে সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যায়নি (**Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, P. 428**)।

১১. সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, রাজা অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য লংকাদ্বীপে দূত পাঠিয়েছিলেন। এখানে বলা হচ্ছে ভিক্ষু মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য এই কাজটি করেছিলেন। ভিক্ষু হবার পর রাজার কোন নির্দেশ ভিক্ষুদের উপর চলে না। সুতরাং এই গ্রন্থে যা বলা হয়েছে সেটাই ঠিক। তবে হয়তো ভিক্ষু তিষ্য ভিক্ষু মহেন্দ্রের ব্যাপারে রাজার অনুমোদন নিয়েছিলেন বা রাজা যাত্রার ব্যবস্থাদি করেছিলেন। রাজা তারই উল্লেখ করেছেন হয়তো শিলালিপিতে। অবশ্য মহেন্দ্রের কথা শিলালিপিতে নেই।

১২. খুব সম্ভবত উত্তর কাশ্মীরের উলার হ্রদ।
১৩. বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ।
১৪. খুব সম্ভবত পঞ্চশীল।
১৫. একপ্রকার কাল্পনিক অপ-দেবতা।
১৬. সংযুক্ত নিকায়ের 'আসিবিষ সুত্র'।
১৭. মজ্ঝিম নিকায় দ্রষ্টব্য।
১৮. সংযুক্ত নিকায় দ্রষ্টব্য।
১৯. অংগুত্তর নিকায় দ্রষ্টব্য।
২০. বুদ্ধ কালকারাম-এ যে সুত্রটি বলেছিলেন। অংগুত্তর নিকায় (২য় ভাগ), ২৪ নং সুত্র দ্রষ্টব্য।
২১. চারজন সঙ্গী ভিক্ষু হলেন কশ্যপ, মল্লদেব, সহদেব এবং দুন্দুভিসসর (দ্বীপবংশ দ্রষ্টব্য)।
২২. মহাবগগ দ্রষ্টব্য।
২৩. দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য।

১৩

মহিন্দের আগমন

খ্যাতিমান মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহিন্দ তখন ভিক্ষু হিসাবে বারো বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন। তখন তাঁহার শিক্ষাগুরুর[১] নির্দেশে ও অন্যান্য ভিক্ষুগণের অনুরোধে লংকাদ্বীপে গিয়া ধর্মস্থাপনের প্রয়াসে উহার সঠিক সময় সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'রাজা মুটশিব বৃদ্ধ হইলে, তাহার পুত্র[২] নিশ্চয়ই রাজা হইয়াছেন।' ॥ ১-২ ॥

'লংকাদ্বীপে যাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়', এইরূপে স্থির করিয়া ভিক্ষু মহিন্দ যাইবার পথে তাঁহার নিকট আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, সময় থাকিতে, ভিক্ষুসংঘ, তাঁহার শিক্ষাগুরু ও রাজার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া চারিজন ভিক্ষু ও সংঘমিত্তার পুত্র, অলৌকিক শক্তিধর ষড়ভিজ্ঞ, শ্রমণ সুমনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়া 'দক্ষিণগিরি'[৩] গিয়া পেঁ'ছিলেন। সেই স্থানে তিনি তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট গিয়া বুদ্ধের ধর্ম তাঁহাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। ইহাতে ছয়মাস অতিবাহিত হইল। ॥ ৩-৫ ॥

অতঃপর যথাসময়ে ভিক্ষু মহিন্দ 'বেদিশগিরি[৪]' নগরে তাঁহার মাতা দেবীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবী তাঁহার প্রিয় পুত্রকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে তাঁহার সঙ্গীসহ সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সকলকে তিনি নিজ হস্তে প্রস্তুত খাদ্য প্রদান করিয়া পরে মাতা দেবী পুত্রকে সেই নগরের বিহারে লইয়া গেলেন। ॥ ৬ ৭ ॥

যুবরাজ অশোক যখন একসময় পিতার নির্দেশে অবন্তি রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন তিনি উজ্জয়িনীর[৫] পথে বেদিশা নগরে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবী নামক এক রূপবতী যুবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দেবী ছিলেন সেই দেশের এক বণিকের[৬] কন্যা। যুবরাজ অশোক প্রণয়াসক্ত হইয়া সেই কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে দেবীর গর্ভে যুবরাজ অশোকের একটি সুকুমার পুত্র (মহিন্দ) এবং দুই বৎসর পর একটি সুন্দরী কন্যা (সংঘমিত্তা) জন্মগ্রহণ করে। ॥ ৮-১০ ॥

ভিক্ষু মহিন্দের আগমনকালে তাঁহার মাতা দেবী বেদিশা নগরে তাঁহার পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। ভিক্ষু মহিন্দ সেই নগরের বিহারে অবস্থানকালে ভাবিলেন, 'পিতার নির্দেশে লংকাদ্বীপের মহারাজা দেবানংপিয় তিষ্যর পুনরায় অভিষেক হইবে। রাজা অশোকের প্রেরিত অনুচরগণের নিকট শুনিয়া থাকিলেও এইবার রাজা তিষ্য ত্রিরত্নের উজ্জ্বল

দীপ্তি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। এই রাজা জ্যেষ্ঠ মাসের উপসথ দিবসে মিস্‌সক পর্বতে আরোহণ করিবেন। সেইদিন আমরা মনোরম লংকা-দ্বীপের সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিব।' ॥ ১১-১৪ ॥

দেবপতি ইন্দ্র ভিক্ষু মহিন্দের নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে ভন্তে! এইবার আপনি লংকাদ্বীপে ধর্মস্থাপন করিতে যাত্রা করুন। সম্যক সম্বুদ্ধ এই বিষয়ে পূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন। আমরা আপনাকে সাহায্য করিব।' ॥ ১৫-১৬ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ তাঁহার মাতা দেবীকে ধর্মদেশনা করিলেন। তখন সেই স্থানে উপস্থিত দেবীর ভগিনীর কন্যার পুত্র ভণ্ডুক সেই ধর্মদেশনা শুনিয়া সেই আসনেই অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইল। সে আর ঘরে ফিরিয়া না গিয়া ভিক্ষু মহিন্দের নিকটেই উপাসকরূপে রহিয়া গেল। এইরূপে আরও একমাসকাল অতিবাহিত হইল। ॥ ১৭-১৮ ॥

অতঃপর জ্যেষ্ঠ মাসের উপসথ দিবসে ভিক্ষু মহিন্দ চারিজন ভিক্ষু, শ্রমণ সুমন ও উপাসক ভণ্ডুকসহ বেদিশা নগরের[৭] বিহার ত্যাগ করিয়া অলৌকিক শক্তিতে মহাশূন্যে উঠিয়া আকাশ পথে লংকাদ্বীপের মিস্‌সক[৮] পর্বত অভিমুখে চলিলেন। যাহাতে ভিক্ষুগণকে কোন অলৌকিক প্রাণী বলিয়া মনে না করে, সেই কারণে ভিক্ষুগণ উপাসক ভণ্ডুককেও তাঁহাদের সঙ্গে লইলেন। একসময় তাঁহারা সকলে মনোহর প্রশস্ত অম্বট্‌ঠল প্রান্তরের মিস্‌সক পর্বতের শৈল চূড়ায়[৯] গিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ॥ ১৯-২০ ॥

সেই মহাঋষি মহাপরিনির্বাণকালে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, 'এই ভিক্ষু স্বীয় গুণে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া লংকাদ্বীপের মুক্তিসাধন করিবেন।' লংকাদ্বীপের মুক্তির জন্য উক্ত দ্বীপের দেবতাগণের উচ্চ প্রশংসাধন্য এই ভিক্ষু মহাপ্রভুর ন্যায় লংকাদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন[১০]। ॥ ২১ ॥

মহিন্দের আগমন সমাপ্ত

এইখানে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'মহিন্দের আগমন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য
২. রাজা দেবানংপিয় তিষ্য
৩. প্রাচীন উজ্জয়িনীর নিকটস্থ অঞ্চল।
৪. প্রাচীন বিদিশা। বর্তমানে গোয়ালিয়রের 'ভিলসা' অঞ্চল। ভূপাল থেকে ২৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।
৫. প্রাচীন উজ্জয়িনী ছিল অবন্তি রাজ্যের রাজধানী।
৬. ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেছেন, দেবী ছিলেন বিদিশার এক সাধারণ ব্যবসায়ীর রূপসী কন্যা। যুবরাজ অশোক তাকে বিয়ে করেননি।
৭. এই প্রাচীন বিহারটি সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন।
৮. শ্রীলঙ্কার 'মিহিনতলে' পর্বত।
৯. মিহিনতলে পর্বতের উত্তর দিকের শিখর!
১০. ভিক্ষু মহিন্দ জন্মগ্রহণ করেন খ্রিঃ পূঃ ২৭৯ অব্দে। ২০ বছর বয়সে তাঁর প্রব্রজ্যা হয়। তিনি শ্রীলঙ্কায় যান খ্রিঃ পূঃ ২৪৬ অব্দে। তাঁর মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ১৯৯ অব্দে। অর্থাৎ তিনি ৮০ বছর বেঁচে ছিলেন।

১৪
রাজধানীতে প্রবেশ

রাজা দেবানংপিয় তিষ্য রাজধানীর অধিবাসীগণের জন্য জলক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করিয়া স্বয়ং আনন্দে মাতিয়া শিকারে বাহির হইলেন। চল্লিশ হাজার অনুচরসহ তিনি পদব্রজে মিস্সক পর্বতে চলিলেন। পর্বতে অবস্থিত এক দেবতা রাজাকে ভিক্ষুগণের উপস্থিতি জ্ঞাত করিতে এক চঞ্চল হরিণের দেহধারণ করিয়া আপন মনে প্রান্তরের একটি ঝোপের পাতা চিবাইতে লাগিল। ॥ ১-৩ ॥

রাজা এই হরিণ দেখিয়া ভাবিলেন, 'অন্যমনস্ক কোন প্রাণীকে শিকার করা পৌরুষোচিত নয়।' তাই তিনি ধনুকে টঙ্কার শব্দ করিলেন। সেই শব্দে হরিণ চকিতে পর্বতের দিকে ছুটিল। রাজাও হরিণের পশ্চাদানুসরণ করিলেন। হরিণ ছুটিয়া পর্বতে অবস্থিত ভিক্ষুগণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া ভিক্ষুগণের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়তেই সেই হরিণ নিমেষে অন্তর্ধান হইল। ॥ ৪-৫ ॥

সেই মুহূর্তে ভিক্ষু মহিন্দ ভাবিলেন, 'এই নির্জন স্থানে অধিক সংখ্যক মানুষ দেখিলে রাজা ভীত হইতে পারেন।' এইরূপ ভাবিয়া ভিক্ষু কেবল নিজেকে রাজার নিকট দর্শন দিলেন। নির্জন জনহীন স্থানে রাজা ভিক্ষুকে দেখিয়াও কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তখন ভিক্ষু মহিন্দ রাজাকে বলিলেন, 'হে তিষ্য! আপনি নিকটে আসুন।' স্বীয় নামে সম্বোধিত হইলে রাজা ভাবিলেন, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন যক্ষ।' ভিক্ষু মহিন্দ উহা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'হে মহারাজ! আমি বৌদ্ধ শ্রমণ, মহান সত্যদ্রষ্টার শিষ্য। আপনার প্রতি অনুকম্পায় আমি জম্বুদ্বীপ হইতে এই স্থানে আসিয়াছি'। ॥ ৬-৮ ॥

ভিক্ষুর এই বচন শুনিয়া রাজার ভয় দূর হইল। তাঁহার পরম মিত্রের প্রেরিত সংবাদ স্মরণ করিয়া এবং ভিক্ষু বুদ্ধের শিষ্যরূপে পরিচয় দিয়াছেন দেখিয়া, রাজা তাঁহার তীর ধনুক দূরে রাখিয়া ভিক্ষুর নিকট গিয়া অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ॥ ৯-১০ ॥

রাজার খোঁজ করিতে করিতে রাজার অনুচরগণও এই সময় সেই স্থানে আসিল। ভিক্ষু মহিন্দের সঙ্গীগণও তখন সকলের দৃষ্ট হইল। রাজা সকল ভিক্ষুগণকে দেখিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! এই সকল ভিক্ষুগণ কখন আসিল?' ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! তাঁহারা সকলে আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।' ॥ ১১-১২ ॥

রাজা তিষ্য তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! জম্বুদ্বীপে কী এইরূপ ভিক্ষু অনেক আছেন?' ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! জম্বুদ্বীপ এইরূপ গৈরিক চীবরে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দেশে বহু সংখ্যক অর্হত, ত্রিবেদজ্ঞ[১], অলৌকিক শক্তিধর, পরচিত্ত জ্ঞানী, দৈবশ্রবণযুক্ত বুদ্ধের শিষ্যগণ রহিয়াছেন।' ॥ ১৩-১৪ ॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! আপনারা কোন্ পথে এই দ্বীপে আসিলেন?' ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা জলপথে বা স্থলপথে আসি নাই।' এইরূপ বলিলে রাজা বুঝিলেন যে, তাঁহারা বায়ুপথে এই দ্বীপে আসিয়াছেন। ॥ ১৫ ॥

রাজা তিষ্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কিনা যাচাই করিতে ভিক্ষু মহিন্দ তাঁহাকে কিছু সূক্ষ্ম প্রশ্ন করিলেন। রাজা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর জোরের সঙ্গেই দিলেন। ॥ ১৬ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ রাজাকে একটি বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ! এই বৃক্ষটি কিসের?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! উহা আমের।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই বৃক্ষের নিকটে আর একটি আমের বৃক্ষ আছে কি?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! বহু আমের বৃক্ষ আছে।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! ঐ সকল আম-বৃক্ষের নিকট অন্য বৃক্ষ আছে কি?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আম-বৃক্ষগুলির নিকটে অন্যান্য বৃক্ষও আছে যাহা আমের নয়।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! তবে যে সকল আম-বৃক্ষ নয়, এবং যে সকল আমবৃক্ষ উহাদের নিকটে কী বৃক্ষ রহিয়াছে?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! উহাদের নিকটে এই আম বৃক্ষটি রহিয়াছে?'

ভিক্ষু এই উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান।' ॥ ১৭-১৯ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ রাজা তিষ্যকে আবার প্রশ্ন করিলেন।

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার আত্মীয়গণ আছেন কি?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আমার বহু আত্মীয়গণ আছেন।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! কিছু মানুষ কি আছেন যাহারা আপনার আত্মীয় নয়?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! তাহারা সংখ্যায় আত্মীয়গণ হইতে অধিক।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় ব্যতীত

অন্য কোন ব্যক্তি আছেন কি ?'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে ! সেই ব্যক্তি আমি নিজে।'

ভিক্ষু রাজার উত্তর শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ ! আপনি উত্তম বলিয়াছেন। আপনি সত্যই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান।'

অতঃপর ভিক্ষু মহিন্দ রাজাকে বুদ্ধের 'চুলহত্থিপদুম'[২] সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা এবং উপস্থিত তাঁহার চল্লিশ হাজার অনুচরগণ ত্রিরত্নে শরণ লইলেন। ॥ ২০-২৩ ॥

রাজার অনুচরগণ রাজাকে খাদ্য আনিয়া দিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাজা জানিতেন যে, ভিক্ষুগণ এই সময় আহার গ্রহণ করিবেন না। তবু সৌজন্যসূচক তাঁহাদের আহারের জন্য অনুরোধ করিতে ক্ষতি কি ? এইরূপ ভাবিয়া রাজা ভিক্ষুগণকেও তাহার আহার্য হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ ! এই সময় আমবা আহার গ্রহণ কবিব না।'[৩] রাজা তাহাদের আহারের সময় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষুগণ উহা রাজাকে জ্ঞাত করিলেন।

রাজা আহার সমাপ্ত করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে ! এইবার চলুন সকলে আমরা নগরে যাই।'

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ ! আমরা এই স্থানে অবস্থান করিব। আপনি বরং ফিরিয়া যান।'

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে ! তাহা হইলে এই যুবকটিকে অন্ততঃ আমার সহিত যাইতে অনুমতি দিন।' ॥ ২৪-২৭ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ ! এই যুবক অনাগামী ফল[৪] প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন শুধু প্রব্রজ্যার অপেক্ষায়। আমরা তাহাকে এখনই প্রব্রজ্যা প্রদান করিব। অতএব আপনার সাথে তাহাকে এখন যাইতে দিতে পারি না।' ॥ ২৮ ॥

অতঃপর রাজা ভিক্ষুগণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিতে গিয়া বলিলেন, 'ভন্তে ! আগামীকল্য আমি শকট পাঠাইব। আপনারা উহাতে করিয়া নগরে প্রবেশ করিবেন।' রাজা সেই যুবক ভণ্ডুক-কে এক পাশে ডাকিয়া ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্য কী জানিতে চাহিলেন। সেই যুবক রাজাকে সকল কিছু জানাইলেন। রাজা উহা শুনিয়া এবং ভিক্ষু মহিন্দের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'ইহা আমার উপর আশীর্বাদস্বরূপ'।

যুবক ভণ্ডুক-এর সহিত আলাপ করিয়া রাজার মনের সকল সংশয় দূর হইল। তিনি বুঝিলেন উহারা মানুষই। ॥ ২৯-৩১ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ ভিক্ষুদের বলিলেন, 'এইবার আমরা ভণ্ডুককে প্রব্রজ্যা

প্রদান করিব।' তাঁহারা তাঁহাদের অবস্থানের চৌহদ্দির মধ্যে এই উপাসক ভণ্ডুককে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিলেন। সেই ক্ষণেই ভণ্ডুক অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৩২-৩৩ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মহিন্দ শ্রমণ সুমনকে বলিলেন, 'হে শ্রমণ! ধর্মদেশনার সময় ঘোষণা কর।' শ্রমণ জিজ্ঞেসা করিলেন, 'ভন্তে! কতদূর অবধি স্থানে ইহা ঘোষণা করিব?' 'সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসীগণ যেন এই ঘোষণা শুনিতে পায় সেইভাবে ইহা ঘোষণা কর।' ॥ ৩৪-৩৫ ॥

সেই সময় রাজা নাগচতুষ্ক পর্বতের নদীতীরে বিশ্রামে ছিলেন। তিনি শ্রমণের দূর হইতে আগত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দূতের নিকট জানিতে চাহিলেন, ভিক্ষুগণের কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে কিনা। রাজদূত জানাইলেন যে, ভিক্ষুগণের কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তাঁহারা বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় অলৌকিক শক্তিতে ঘোষণা করিতেছেন। ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পৃথিবীতে অবস্থানরত দেবগণ শ্রমণের উক্ত ঘোষণা শুনিয়া তাঁহারা উহা প্রতিধ্বনিত করিলেন। সেই প্রতিধ্বনি ব্রহ্মলোকে গিয়া পেঁছিল। শ্রমণের এই আহ্বানে বহু দেবগণ আর অপেক্ষা না করিয়া তখনই মর্তে্য নামিয়া আসিয়া ভিক্ষু মহিন্দের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু মহিন্দ তাঁহাদের বুদ্ধের 'সমচিত্ত' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। ইহাতে উপস্থিত অসংখ্য দেবগণ, নাগগণ ও গরুড়গণ ত্রিরত্নে শরণ লইলেন। দেবগণ ভিক্ষু সারিপুত্রের নিকট যেমন সাগ্রহে ধর্মদেশনা শুনিতেন, সেইরূপ সাগ্রহেই তাঁহারা ভিক্ষু মহিন্দের নিকট ধর্মদেশনা শুনিলেন।
॥ ৩৮-৪১ ॥

পরদিন রাজা তিষ্য ভিক্ষুগণের জন্য শকট পাঠাইলেন। শকট-চালক ভিক্ষুগণের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! শকটে আরোহণ করুন। উহাতে চড়িয়া নগরে পেঁছিবেন।' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'আমরা শকটে আরোহণ করিব না। তুমি শকট লইয়া ফিরিয়া যাও, আমরা আসিতেছি।' এইরূপ বলিয়া ভিক্ষুগণ অলৌকিক শক্তিতে সশরীরে শূন্যে উঠিয়া গিয়া বায়ুতে ভর করিয়া নগরের পূর্ব দ্বারের নিকটে গিয়া অবতরণ করিলেন। যেই স্থানে ভিক্ষুগণ অবতরণ করিয়াছিলেন সেই স্থানে পরবর্তীকালে প্রথম স্তূপটি নির্মিত হয়। সেই স্থানে একটি চৈত্যও পরে স্থাপিত হয়। সেই চৈত্যের নাম হইল 'পথমচেতিয়'। ॥ ৪২-৪৫ ॥

রাজ অন্তঃপুরের মহিলাগণ রাজার নিকট ভিক্ষুগণের গুণানুকীর্তন শুনিয়া তাঁহাদের দেখিতে ইচ্ছা করিলে, রাজা তাহাদের জন্য একটি সুন্দর তাঁবু প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই তাঁবু ছিল শুভ্র বস্ত্রে ঢাকা,

শ্বেতপুষ্প এবং নানাবিধ কারুকার্যে শোভিত। ।। ৪৬-৪৭ ।।

ভিক্ষু মহিন্দ পূর্বেই রাজাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাধারণ আসন ব্যতীত কোন উচ্চ আসনে বসিবেন না। রাজা ভাবিলেন, ভিক্ষুগণ কি তবে কোন উচ্চ স্থানে বসিবেন?

ইতিমধ্যে শকটচালক শূন্য শকট লইয়া নগরে ফিরিয়া দেখিলেন যে চীবর পরিহিত ভিক্ষুগণ তাহার পূর্বেই নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিস্মিত শকটচালক ইহা রাজাকে জানাইলেন। রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া পরিষ্কার বুঝিলেন যে, এই ভিক্ষুগণ কোন প্রদত্ত উচ্চ আসনে বসিবেন না। ।। ৪৮-৫০ ।।

অতঃপর রাজা আদেশ করিলেন, 'ভূমিতে আরামপ্রদ মনোরম গালিচা বিছানো হউক।' এই নির্দেশ দিয়া রাজা নগরের পূর্ব দ্বারে গিয়া ভিক্ষুগণকে নগরে প্রবেশ করিতে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভিক্ষু মহিন্দের হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র সসম্ভ্রমে তুলিয়া লইয়া রাজা উহা নিজ হস্তে ধারণ করিয়া সকলকে নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ ছিল সেই দেশের আতিথেয়তা ও অভ্যর্থনার রীতি। ।। ৫১-৫২ ।।

ভিক্ষুগণের আসন প্রস্তুত হইলে দৈবজ্ঞগণ ভবিষ্যৎবাণী করিলেন, 'এই ধরা ভিক্ষুগণের দ্বারা অধিকৃত হইবে। তাঁহারা এই দ্বীপের মহাপ্রভু হইবেন।' ।। ৫৩ ।।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিয়া রাজা ভিক্ষুগণকে রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। তথায় নিজেদের উপযুক্ততা অনুযায়ী ভিক্ষুগণ চাদরে ঢাকা স্বীয় আসনে পর পর উপবেশন করিলেন। রাজা স্বহস্তে ভিক্ষুগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় পরিবেশন করিলেন। ।। ৫৪-৫৫ ।।

ভিক্ষুগণের আহার সমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া মহারাণী অনুলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজা তিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, রাজ-প্রতিনিধি মহানাগ, প্রভৃতি যাঁহারা রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন রাজা সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহারাণী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সখীসহ সেই স্থানে আসিয়া সকল ভিক্ষুগণের পাদবন্দনা করিয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভিক্ষু মহিন্দ উপস্থিত সকলকে পেতবত্থু[৭], বিমানবত্থু[৮], ও বুদ্ধের 'সচ্চ[৯]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। উপস্থিত মহিলাগণ এই ধর্মদেশনায় স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। ।। ৫৬-৫৮ ।।

ভিক্ষুগণের আগমনবার্তা সারা নগরে ছড়াইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের গুণাবলীও সকলে পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইহাতে অসংখ্য নগর-বাসীগণ ভিক্ষুগণের দর্শনাভিলাষী হইয়াপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া কোলাহল

করিতে লাগিলেন। রাজা কোলাহলের কারণ জ্ঞাত হইয়া নগরবাসী-গণের প্রতি কৃপাবশতঃ তাহাদের ভিক্ষুগণের সম্মুখে আনিবার উপায় চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'রাজদ্বারে উপস্থিত সকলের এই স্থানে সংকুলান হইবে না। অতএব এক্ষণই আমার হস্তীশালাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া তোল। সেই স্থানে উপস্থিত নগরবাসীগণ স্বস্তিতে ভিক্ষুকগণকে দর্শন করিতে পারিবেন।'

রাজার নির্দেশে মুহূর্তে রাজার বিরাট হস্তীশালাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হইল। সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া উহার নীচে ভিক্ষুগণের জন্য গালিচা বিছাইয়া আসন প্রস্তুত করা হইল। ॥ ৫৯-৬২ ॥

অতঃপর নগরবাসীগণ সেই বিরাট কক্ষটিতে প্রবেশ করিলে, ভিক্ষুগণ সেইস্থানে গিয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সকলে উপবেশন করিলে ভিক্ষু মহিন্দ উপস্থিত সকলকে বুদ্ধের 'দেবদূত' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। নগরবাসীগণ উক্ত ধর্মদেশনা শুনিয়া বুদ্ধের ধর্মে শরণ লইলেন। এক হাজার নগরবাসী সেই আসনেই স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৬৩-৬৪ ॥

অদ্বিতীয় ভিক্ষু মহিন্দ মহাপ্রভুর ন্যায় লঙ্কাদ্বীপের রক্ষাকল্পে সেই দ্বীপের দুই স্থানে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করিলেন। তাঁহার মুখনিসৃত বুদ্ধ-বাণীতে এবং ধর্মের দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে সেই দ্বীপে সত্যধর্মের[১০] প্রতিষ্ঠা হইল। ॥ ৬৫ ॥

রাজধানীতে প্রবেশ সমাপ্ত

এইখানে চতুর্দশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'রাজধানীতে প্রবেশ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১০ বুদ্ধের সময়ে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভিক্ষু হয়েছিলেন। যেমন ভিক্ষু মহাকশ্যপ ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পরে তিনি ভিক্ষু হয়ে খ্যাত হন।

২০ মজ্ঝিমনিকায় দ্রষ্টব্য।

৩০ বুদ্ধের ভিক্ষুগণ দ্বিপ্রহরের পর আহার গ্রহণ করেন না। এই বিষয়ে মজ্ঝিমনিকায়ে বলা আছে।

৪. বুদ্ধের সময়েও বহু উপাসক-উপাসিকারা ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ত্ব হয়েছেন।

৫. অংগুত্তর নিকায় দ্রষ্টব্য।

৬. প্রাচীন অনুরাধপুরে এই চৈত্যটি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এইটি স্থাপিত হয়েছিল নগরের পূর্ব দ্বারের বাইরে।

৭. গ্রন্থটি মহাযানী ভিক্ষুদের আদর্শে লিখিত। এইটি একসময় ক্ষুদ্দকনিকায়েও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ভূতের রাজ্যে বাস করা কিছু ভূতের গল্প এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। পাপের জন্য পাপীরা মৃত্যুর পর ভূত হয়ে ভূতের নগরে বাস করছে। এগুলো কাল্পনিক এবং বুদ্ধের ধর্মের পরিপন্থী।

৮. এই গ্রন্থে ভূতদের সুরম্য প্রাসাদের কথা রয়েছে। কিছু ভূত কিছু সুকৃতির জন্য এইসব প্রাসাদে আরামে বাস করছে। এই গ্রন্থটিকেও মহাযানীরা একসময় ক্ষুদ্দকনিকায়ে ঢুকিয়ে ত্রিপিটকের অঙ্গ করেছে। বুদ্ধের ধর্মাদর্শ এইখানে বিন্দুমাত্র নেই।

৯. সংযুক্তনিকায় দ্রষ্টব্য।

১০. বৌদ্ধধর্ম।

১৫
মহাবিহারের স্বীকৃতি

রাজার বৃহৎ হস্তীশালাটিও একসময় দর্শক সমাগমে পূর্ণ হইয়া গেল। আরও অসংখ্য নগরবাসীগণ ভিক্ষুগণের দর্শনার্থে আসিলে স্থানটি সকলের সংকুলানের উপযুক্ত বোধ হইল না। সেই বৃহৎ কক্ষটি সেই তুলনায় ক্ষুদ্রই মনে হইল।

অতঃপর ধর্মপ্রাণ নগরবাসীগণ নগরের দক্ষিণ দ্বারের বাহিরে অবস্থিত রাজার সুরম্য নন্দন কানন[১]-এ ভিক্ষুগণের বসিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই সুরম্য ছায়াঘন, শান্ত, শীতল হরিৎক্ষেত্রে ধর্মদেশনার ব্যবস্থা করা হইল। ভিক্ষুগণ নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সেই উদ্যানে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন: সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশের মহিলাগণ ভিক্ষুগণের সম্মুখে বসিলেন। অসংখ্য নগরবাসীতে সভাস্থল ভরিয়া উঠিল। ভিক্ষু মহিন্দ সেই সময় বুদ্ধের 'বাল-পণ্ডিত[২]' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শোনাইলেন। সেই ধর্মদেশনা শুনিয়া এক হাজার মহিলা সেই আসনেই স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হইলেন। ॥ ১-৫ ॥

ক্রমে সেই কুঞ্জবনে সন্ধ্যা নামিল। ভিক্ষুগণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'এইবার আমরা পর্বতে প্রত্যাবর্তন করিব।' রাজা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! এখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়াছে। সেই পর্বত বহুদূরে অবস্থিত। আপনারা এই সুরম্য কাননে অবস্থান করুন, ইহা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান।' ভিক্ষুগণ অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'হে মহারাজ! এই উদ্যান লোকালয়ের অতি নিকটে অবস্থিত।' রাজা তখন বলিলেন, 'ভন্তে! মহামেঘ উদ্যানটি খুব বেশী দূরে নয়। উহা লোকালয়ের নিকটেও নয়। ছায়াচ্ছন্ন, পানীয় জলযুক্ত, সুরম্য সেই উদ্যান সন্ন্যাসীগণের বিহারের উপযুক্ত স্থান। আপনারা সেই উদ্যানে বরং বিশ্রাম করুন। দূরের পর্বতে না গিয়া এই উদ্যানে চলুন।' ভিক্ষুগণ রাজার কথায় সম্মত হইয়া পর্বতে প্রত্যাবর্তনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেই উদ্যানে যাইতে দক্ষিণমুখী হইলেন। ॥ ৬—৯ ॥

যেই স্থানে ভিক্ষুগণ দক্ষিণমুখী হইয়া 'মহামেঘ[৩]' উদ্যানের দিকে যাত্রা করিলেন, সেই স্থানে পরবর্তীকালে একটি চৈত্য নির্মিত হয়। কদম্ব নদীর তীরে অবস্থিত 'নিভত্ত চৈত্য'টি হইল সেই চৈত্য। ॥ ১০ ॥

মহারথী ভিক্ষুগণকে 'নন্দন কানন' হইতে দক্ষিণে অবস্থিত 'মহামেঘ' উদ্যানে লইয়া গেলেন। সকলে উদ্যানের পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন।

রাজার নির্দেশে উদ্যানের বিশেষ স্থানে ভিক্ষুগণের জন্য সুন্দর বিছানা এবং আসনাদি প্রস্তুত করা হইল। রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! এইবার আপনারা আরামে বিশ্রাম করুন।' এই বলিয়া রাজা ভিক্ষুগণের সম্মতি লইয়া অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ সেই রাত্রি এই সুরম্য উদ্যানে রহিলেন। ॥ ১১-১৩ ॥

প্রভাত হইতেই রাজা ফুলের গুচ্ছ হাতে ভিক্ষুগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া ফুলের গুচ্ছটি ভিক্ষু মহিন্দের হাতে অর্পণ করিয়া কুশল জানিতে বলিলেন, 'ভন্তে! আপনাদের রাত্রিযাপন সুখকর হইয়াছে কি? এই উদ্যান আপনাদের বিশ্রামের উপযুক্ত ছিল কি?' ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! আমাদের রাত্রিযাপন সুখকর হইয়াছে। সত্যই এই উদ্যান সন্ন্যাসীগণের বিহারের উপযুক্ত স্থান।' ॥ ১৪-১৫ ॥

রাজা তখন ভিক্ষু মহিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! ভিক্ষুগণকে উদ্যান দান করা যুক্তিযুক্ত কি?'

অভিজ্ঞ ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! এইরূপ দান প্রচলিত আছে।' ভিক্ষু এই সূত্রে বেনুবন উদ্যান[8] দানের কথা রাজাকে জানাইলেন।

ভিক্ষুর নিকট এই কথা শুনিয়া রাজা অতীব প্রীত হইলেন। উপস্থিত সকলে হইাতে আনন্দিত হইল। ॥ ১৬-১৭ ॥

মহারাণী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সখীসহ সেই স্থানে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা সকলে সানন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।' রাজা কথাটি ভিক্ষু মহিন্দকে জ্ঞাত করিলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা কেহ কোন মহিলাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে পারিব না। ইহা আমাদের নিষিদ্ধ। তবে পাটলিপুত্রে আমার কনিষ্ঠ ভগিণী ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্তা রহিয়াছে। সেই অভিজ্ঞা ভিক্ষুণী এই দেশে আসিলে, সঙ্ঘশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের মহাবোধি বৃক্ষের দক্ষিণ দিকের একটি শাখাও সে এই দেশে আনয়ন করিতে পারিবে। বিশুদ্ধ ধার্মিক কিছু ভিক্ষুণীও তাহার সহিত আসিতে পারে।

হে লোকপাল! এই সকল বিষয়ে আপনি আমার পিতা রাজা অশোককে সংবাদ প্রেরণ করুন। সঙ্ঘমিত্তা এবং ভিক্ষুণীগণ আসিলে তাহারা মহিলাদের প্রব্রজ্যা প্রদান করিবে।' ॥ ১৮-২৩ ॥

রাজা ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। রাজা একটি জলপূর্ণ বড় পাত্র হাতে লইয়া সেই পাত্রের জল ভিক্ষু মহিন্দের করকমলে ধীরে ধীরে ঢালিয়া বলিলেন, 'এই

মহামেঘ উদ্যান আমি বুদ্ধের ভিক্ষুসংঘকে দান করিলাম।' ॥ ২৪-২৫ ॥

ভিক্ষুর আঙুলের ফাঁক দিয়া সেই জল যখন ভূমি স্পর্শ করিল, তখন বসুধা কম্পিত হইল। ধরাপতি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'হে মহারাজ! পৃথিবী এই দান অনুমোদন করিল। এই দ্বীপে বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।' ॥ ২৬ ॥

উচ্চবংশ সম্ভূত রাজা ভিক্ষু মহিন্দকে একগুচ্ছ যূঁই ফুল প্রদান করিয়াছিলেন। ভিক্ষু রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ বাগানে গিয়া উহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত চিরহরিৎ ঝাউ গাছটির নীচে কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ও পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। রাজা ভিক্ষুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! পূর্বতন তিন বুদ্ধের সময়ে এই স্থানটি ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির স্থান। এই স্থানটিকে চিহ্নিত করা হইল'। ২৭-২৯ ॥

রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গন ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু মহিন্দ এইবার উত্তর দিকে চলিলেন। রাজপ্রাসাদের কিছুদূরে উত্তরে ছিল একটি পুষ্করিণী। সেই স্থানে ভিক্ষু মহিন্দ কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। এইবারও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কারণস্বরূপ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! পূর্বতন বুদ্ধের ভিক্ষুগণ এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন। স্থানটিকে চিহ্নিত করা হইল।' ॥ ৩০-৩১ ॥

ইহার পর মহান ভিক্ষু মহিন্দ রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারের নিকটে গিয়া ফুল ছড়াইয়া স্থানটিকে বন্দনা করিলেন। এইবারও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কারণস্বরূপ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানে পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটি রোপন করা হইবে। পূর্বতন তিনজন বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের বৃক্ষের শাখাও এই স্থানে একসময় রোপন করা হইয়াছিল। সেই একই স্থানে বর্তমান তথাগতের বোধিবৃক্ষের শাখা স্থাপিত হইবে।' ॥ ৩২-৩৫ ॥

মহান ভিক্ষু মহিন্দ নাগরাজ মহামুচলিন্দের পূজা" অনুষ্ঠানের স্থানে গিয়া কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ও ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কারণস্বরূপ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানে প্রাচীনকালে ভিক্ষুগণের উপসথ আগার ছিল। স্থানটি চিহ্নিত করা হইল।'

॥ ৩৬-৩৭ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মহিন্দ রাজোদ্যানের একস্থানে কয়েকটি আমের গাছ দেখিয়া সেই স্থানে গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে চাহিলে, রাজা সেই-স্থানে সত্বর একটি সুন্দর গালিচা বিছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ভিক্ষু সেই গালিচায় উপবেশন করিলেন।

বাগানের মালি রাজাকে একটি বড় আকারের পক্ক, সুমিষ্ট, মধুর ঘ্রাণ ও বর্ণযুক্ত আম আনিয়া দিলে রাজা উহা ভিক্ষুর হাতে তুলিয়া দিলেন। ভিক্ষু সেই সুমিষ্ট আমটি খাইয়া উহার আঁটি ভূমিতে রোপন করিতে রাজাকে উহা দিয়া হাত ধুইয়া লইলেন। রাজা আমের আঁটিটি সেই স্থানে রোপন করিলেন যাহাতে যথাসময়ে আমগাছ জন্মায়। ॥ ৩৮-৪১ ॥

আমের আঁটিটি প্রোথিত হইবামাত্র মুহূর্তে সেই স্থানে আঁটি হইতে অংকুর বাহির হইল। উহা নিমেষে ধীরে ধীরে বাড়িয়া বড় আম গাছে পরিণত হইল। সেই গাছে পাতার সমাবেশ হইল। ফলও ধরিল।

রাজা এবং তথায় উপস্থিত সকলে এই অলৌকিক লোমহর্ষক দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। সকলে ভিক্ষু মহিন্দের পদবন্দনা করিলেন। ॥ ৪২-৪৪ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ এইস্থানে কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। সেই সময়ও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কারণস্বরূপ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানে একসময় উপস্থিত ভিক্ষুগণকে নানাবিধ দান[৬] প্রদান করা হইবে।' ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অতঃপর ভিক্ষু মহিন্দ পূর্বের বুদ্ধগণের ভোজনকক্ষ যেই স্থানে ছিল সেই স্থানে গিয়া কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। এইবারও ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। ইহার কারণস্বরূপ ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! এই বিশেষ স্থানে রাজার উদ্যান দানের উৎসবে রাজ্যবাসীগণ পূর্বের বুদ্ধগণের জন্য বহু উপহার আনিয়া এই স্থানে রাখিয়াছিলেন। এই স্থানে পরবর্তীকালে ভিক্ষুগণের ভোজনকক্ষ স্থাপিত হইবে।' ॥ ৪৭-৫০ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ, লংকাদ্বীপের সুহৃদ, যিনি উপযুক্ত-অনুপযুক্ত স্থান জ্ঞাত ছিলেন। উক্ত স্থান হইতে যেই পবিত্র স্থানে তিনি গেলেন সেই স্থানে পরবর্তীকালে একটি সুবৃহৎ স্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল।

সেই সময় রাজার উদ্যানের সীমানার মধ্যে ককুধ নামক একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীর তীরে একটি সমতল স্থান ছিল। ভিক্ষু সেই স্থানে গেলে রাজা তাঁহাকে আট ঝুড়ি চাঁপা ফুল আনিয়া দিলেন। ভিক্ষু সেই ফুল দিয়া সেই স্থানটিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইলেন। তখনও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ভিক্ষু ইহার কারণ বুঝাইতে বলিলেন, 'মহারাজ! এই স্থানটি পূর্বতন চারিজন বুদ্ধের পদধূলায় ধন্য হইয়াছে। সকল জীবের সুখ ও শান্তির জন্য এই স্থানটি স্তূপ স্থাপনের যোগ্য।' ॥ ৫১-৫৬ ॥

'মহারাজ! সেই যুগে প্রথম[৭] মার বিজয়ী শাস্তা ছিলেন ককুসন্ধ। সত্যানিষ্ঠ, সর্বজীবে দয়াশীল ছিলেন তিনি। এই বুদ্ধের সময়ে মহামেঘ

উদ্যানের নাম ছিল মহাতিত্থ। কদম্ব নদীর অপর পারে, পূর্বদিকে ছিল প্রাচীন রাজধানী—অভয়। দেশের রাজা ছিলেন অভয়। এই দ্বীপের তখন নাম ছিল ওজদ্বীপ।

একসময় যক্ষগণের মহাশক্তিতে এই দ্বীপে মহামারী দেখা দেয়। দশবলধারী ককুসন্ধ বুদ্ধ তখন দয়াপরবশ হইয়া মানুষের দুঃখের অন্ত করিতে, শান্তির ধর্ম এই দ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিতে, চল্লিশ হাজার শিষ্যসহ শূন্যে বাতাসে ভর করিয়া আসিয়া দেবকূট পর্বতে অবতরণ করেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে দ্বীপ হইতে মহামারী দূর হয়। তিনি দেবকূট পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন, 'ওজদ্বীপের সকল ইচ্ছুক অধিবাসীগণ অক্লেশে অদ্য আমার নিকট সত্বর আসিবে।'

॥ ৫৭-৬৫ ॥

রাজা ও নগরবাসীগণ পর্বত শিখরে দণ্ডায়মান এই মহাজ্ঞানী মহর্ষিকে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় দেখিলেন। তিনি পর্বতটিকে আলোকিত করিয়াছেন। নগরবাসীগণ সত্বর তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

॥ ৬৬ ॥

যে সকল নগরবাসীগণ তাঁহাদের স্বীয় আরাধ্য দেবতার জন্য নৈবেদ্য সাজাইয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন ইনি সেই দেবতা, অনুচরগণ সহ সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই মহর্ষিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ জানাইয়া নগরে লইয়া গেলেন। রাজা ভাবিলেন, 'এই রাজকীয় পরিসরে সুরম্য উদ্যান মহাতিত্থ, মহাজ্ঞানী ও তাঁহার ভিক্ষুসংঘের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান।' রাজা তাঁহার নির্দেশে সেই উদ্যানে নির্মিত তাঁবুতে, সুন্দর আসনে, সম্যকসম্বুদ্ধ এবং তাঁহার ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই সময় নগরবাসীগণ তাঁহাদের জন্য চতুর্দিক হইতে বহু প্রকার দান আনিয়া সেই স্থানে রাখিলেন। রাজা স্বহস্তে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে নানা আহার্য পরিবেশন করিলেন। ॥ ৬৭-৭২ ॥

বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘের আহার সমাপ্ত হইলে রাজা সেই স্থানে সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে মহাতিত্থ উদ্যানটি দান করিলেন। সুন্দর পুষ্পিত আনন্দোজ্জ্বল এই কানন বুদ্ধ গ্রহণ করিলে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল।

প্রভু এই স্থানে বসিয়া সমবেত সকলকে ধর্মদেশনা করিলেন। বুদ্ধের ধর্মদর্শন শুনিয়া চল্লিশ হাজার নর-নারী সেই আসনে অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

॥ ৭৩-৭৫ ॥

সমস্ত দিন সেই উদ্যানে অতিবাহিত করিয়া প্রভু বুদ্ধ সন্ধ্যাকালে বোধিবৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত স্থানটিতে গেলেন। সেই স্থানে তিনি পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে বুদ্ধ আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'আমার বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ দিকের শাখাটি আনিয়া এই স্থানে রোপণ করিবে। ভিক্ষুণী রুচানন্দা অন্যান্য ভিক্ষুণী-সহ সেই সিরিষ গাছের শাখাটি আনিবে।' ॥ ৭৬-৭৮ ॥

ভিক্ষুণী রুচানন্দা বুদ্ধের নির্দেশ জ্ঞাত হইয়া সত্বর সেই দেশের রাজাকে[৮] লইয়া সেই গাছের নিকট গেলেন। ভিক্ষুণী রক্তবর্ণের সেঁকো বিষমাখানো একটি কাঠি দিয়া গাছের নির্দিষ্ট ডালের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেখা আঁকিয়া দিলে, ডালটি নিমেষে সেই রেখা চিহ্ন ধরিয়া খসিয়া ভিক্ষুণীর কোলের উপর পড়িল। ভিক্ষুণী সেই ডাল স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া অলৌকিক শক্তিতে পাঁচশত ভিক্ষুণী এবং দেবগণসহ বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে সেই ডালসহ স্বর্ণপাত্রটি অর্পণ করিলেন। তথাগত উহা রোপণ করিতে রাজা অভয়কে প্রদান করিলেন। মহারাজ সেই ডালটি মহাতিত্থ উদ্যানে রোপণ করিলেন। ॥ ৭৯-৮৩ ॥

অতঃপর সম্যকসম্বুদ্ধ সেই স্থান হইতে উত্তর দিকে সিরিষ গাছের বনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে তিনি ধর্মদেশনা করিলেন। কুড়ি হাজার প্রাণী ধর্মে দীক্ষা লইলেন। ॥ ৮৪-৮৫ ॥

বুদ্ধ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে অবস্থিত একটি কাননে গেলেন। সেই স্থানে পরে একটি স্তূপ নির্মিত হয়। বুদ্ধ সেই স্থানে ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে তিনি সেই স্থানে উপস্থিত জনগণকে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনায় দশ হাজার নর-নারী অর্হত হইলেন। ॥ ৮৬-৮৭ ॥

বুদ্ধ তাঁহার পানপাত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে জনগণকে প্রদান করিলেন। ভিক্ষুণী রুচানন্দা এবং অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ, শিষ্য ভিক্ষু মহাদেব এবং তাঁহার হাজার ভিক্ষুগণকে রাখিয়া, সম্যকসম্বুদ্ধ পূর্বদিকে গিয়া 'রত্নমাল' নামক স্থানে দাঁড়াইয়া সমবেত জনগণকে ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করিয়া বাকি ভিক্ষুসংঘসহ মহাশূন্যে উঠিয়া বাতাসে ভর করিয়া জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া গেলেন'। ॥ ৮৮-৯০ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ আবার বলিলেন, 'মহারাজ! এই যুগে, উক্ত বুদ্ধের পর, দ্বিতীয় মার বিজয়ী, সর্বজ্ঞ, করুণাময় বুদ্ধ হইলেন প্রভু কোণাগমন। এই বুদ্ধের সময় মহামেঘ উদ্যানের নাম ছিল মহানোম উদ্যান। এই দ্বীপের রাজধানী ছিল দক্ষিণের 'ভড্ডমান' নগর। রাজার নাম ছিল সমিদ্ধি। এই দ্বীপের নাম ছিল বড়দ্বীপ। ॥ ৯১-৯৩ ॥

বড়দ্বীপে তখন অনাবৃষ্টির কারণে খরায় আকাল চলিতেছে। মানুষের কষ্টের অন্ত ছিল না। বুদ্ধ কোণাগমন ইহা জ্ঞাত হইয়া, মানুষের দুঃখের অন্ত করিতে এবং পরে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ আকাশ পথে ভাসিয়া আসিয়া সুমনকূট পর্বতের শিখরে অবতীর্ণ হইলেন। করুণাঘন বুদ্ধ তাঁহার অলৌকিক শক্তি দ্বারা সেই শুষ্ক আকাল দূর করিলেন। কালপ্রবাহে ধর্মের অবক্ষয়ের কারণে এই দ্বীপে বৃষ্টি হইত না। উহা আবার বুদ্ধের প্রভাবে স্বাভাবিক হইল। ॥ ৯৪-৯৭ ॥

সুমনকূট পর্বত শিখরে দাঁড়াইয়া বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, 'ইচ্ছুক বড়দ্বীপবাসীগণ সত্বর আমার নিকট উপস্থিত হও।'

রাজা এবং নগরবাসীগণ বুদ্ধকে পর্বত শিখরে এক উজ্জ্বল আলোর ন্যায় দেখিলেন যাহা সারা পর্বতটিকেও আলোকিত করিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলে সত্বর বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥ ৯৮-১০০ ॥

যে সকল দ্বীপবাসীগণ তাঁহাদের নিজস্ব দেবতাকে শ্রদ্ধা জানাইতে নৈবেদ্য সাজাইয়া অন্য স্থানে যাইতেছিলেন, তাঁহারা এই উজ্জ্বল আলোক শিখার ন্যায় বুদ্ধকে ভাবিলেন যে তিনিই তাঁহাদের দেবতা সশরীরে শিষ্যগণসহ আসিয়াছেন।

সেই সকল দ্বীপবাসীগণ এবং রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বুদ্ধের নিকট গেলেন। রাজা বুদ্ধকে সকল শিষ্যসহ আহারের নিমন্ত্রণ জানাইয়া সকলকে নগরে লইয়া আসিলেন। ॥ ১০১-১০২ ॥

রাজা বুদ্ধ কোণাগমন এবং ভিক্ষুসংঘকে মহানোম উদ্যানে লইয়া গিয়া ভাবিলেন, 'এই রাজকীয় সুরম্য কানন বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। ইহা অপরিসরও নয়।' রাজা সেই কাননে তাঁবু স্থাপন করাইয়া উহার মধ্যে যথাযোগ্য আসন সাজাইয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করাইলেন। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলে দ্বীপবাসীগণ তাঁহাদের জন্য চতুর্দিক হইতে নানাবিধ দান আনিয়া দিলেন। রাজা স্বহস্তে যাবতীয় আহার্য এবং পানীয় বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিলেন। ॥ ১০৩-১০৬ ॥

অতঃপর আহার সমাপ্ত করিয়া বুদ্ধ বসিয়া রহিলে রাজা তাঁহাকে মূল্যবান মহানোম উদ্যানটি দান করিলেন। সেই পুষ্পিত শান্ত উদ্যানটি বুদ্ধ গ্রহণ করিলে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। বুদ্ধ সেই স্হানে উপস্হিত অসংখ্য দ্বীপবাসীগণকে ধর্মদেশনা করিলেন। ত্রিশ হাজার ব্যক্তিগণ সেই আসনেই অর্হত হইলেন। ॥ ১০৭-১০৯ ॥

সারাদিন এই সুরম্য উদ্যানে অবস্থান করিয়া বিকালে বুদ্ধ সেই উদ্যানের বিশেষ স্হানে গেলেন যে স্হানে পূর্বে বোধিবৃক্ষ স্হাপিত হইয়াছিল। সেই

স্থানে পদ্মাসনে বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে বুদ্ধ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দ্বীপবাসীগণের মুক্তির কামনায় বলিলেন, 'আমার বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখার একটি অংশ আনিয়া এই স্থানে রোপণ করা হউক। যজ্ঞডুমুর গাছের শাখাটি ভিক্ষুণী 'কনতকানন্দা এই দ্বীপে আনিবে। তাহার সহিত অন্যান্য ভিক্ষুণীগণও আসিবে।' ॥ ১১০-১১২ ॥

ভিক্ষুণী কনতকানন্দা বুদ্ধের এই নির্দেশ জ্ঞাত হইয়া সেই রাজ্যের রাজাকে* সঙ্গে লইয়া সেই গাছের নিকট গেলেন। অলৌকিক শক্তি সম্পন্না ভিক্ষুণী লাল সেঁকোবিষ লাগানো সরু কাঠি সেই গাছের ডালের একটি অংশে বৃত্তাকারে লাগাইলেন। ডালের সেই অংশটি মূল ডাল হইতে খসিয়া ভিক্ষুণীর কোলের উপর পড়িল। ভিক্ষুণী উহা স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া অলৌকিক শক্তিতে অন্যান্য ভিক্ষুণীসহ এই দ্বীপে আসিলেন। দেবতা পরিবৃত হইয়া সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণপাত্রটি অর্পণ করিলেন। তথাগত উহা গ্রহণ করিয়া রাজা সমিদ্ধিকে ডালটি রোপণ করিতে প্রদান করিলেন। রাজা সেই ডালটি মহানোম উদ্যানের সেই বিশেষ স্থানে রোপণ করিলেন। ॥ ১১৩-১১৭ ॥

অতঃপর বুদ্ধ কোণাগমন সেই স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে গিয়া নাগদেবতাদের যেই স্থানে পূজা করা হইত সেই স্থানে গেলেন। এই স্থানে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনায় উপস্থিত বিশ হাজার প্রাণীগণ ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। সেই স্থান হইতে বুদ্ধ আরও উত্তর দিকে গিয়া, যেই স্থানে পূর্বের বুদ্ধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান সমাপ্ত হইলে বুদ্ধ সেইস্থানে উপস্থিত জনগণকে ধর্মদেশনা করিলেন। দশ হাজার নর-নারী এই ধর্মদেশনায় অর্হত হইলেন। ॥ ১১৮-১২১ ॥

বুদ্ধ কোণাগমন স্বীয় কোমরবন্ধনীটি জনগণকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পূজ্যবস্তু বলিয়া প্রদান করিয়া ভিক্ষুণীগণকে এবং তাঁহার শিষ্য মহাসুম্ব ও তাহার শিষ্যগণকে বড়দ্বীপে ধর্মপ্রচারের জন্য রাখিয়া, তিনি রতনমাল-এর পার্শ্বে অবস্থিত সুদর্শনমাল-এ দাঁড়াইয়া দ্বীপের জনগণকে শুভেচ্ছা প্রদান করিয়া বাকি ভিক্ষুসংঘসহ মহাশূন্যে উঠিয়া বাতাসে ভর করিয়া জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ১২২-১২৪ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ আবার বলিলেন, 'মহারাজ! এই যুগে আবির্ভূত করুণাঘন তৃতীয় সর্বজ্ঞ শাস্তা হইলেন কশ্যপ গোত্রশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ কশ্যপ। সেই সময় মহামেঘ উদ্যানের নাম ছিল মহাসাগর। এই দ্বীপের রাজধানী ছিল পশ্চিমের বিশাল নগরে। রাজ্যের রাজা ছিলেন জয়ন্ত, এবং এই দ্বীপের নাম ছিল মনডদ্বীপ। ॥ ১২৫-১২৭ ॥

সেই সময় রাজা জয়ন্ত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা সংগ্রাম চলিতেছিল। দশবলধারী করুণাঘন মহর্ষি বুদ্ধ কশ্যপ বুঝিয়াছিলেন যে এই সংগ্রাম মানুষের কী সর্বনাশ করিতেছে। ইহা উপলব্ধি করিয়া সংগ্রামের অন্ত করিতে এবং দ্বীপে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে করুণাবশতঃ বুদ্ধ কশ্যপ বিশ হাজার শিষ্যে পরিবৃত হইয়া আকাশপথে বাতাসে ভর করিয়া এই দ্বীপে আসিয়া শুভকূট পর্বতের শিখরে অবতীর্ণ হইলেন। ॥ ১২৮-১৩১ ॥

উক্ত পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া বুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, 'ইচ্ছুক দ্বীপবাসীগণ অদ্য সত্বর আমার নিকট উপস্থিত হও।'

রাজা ও নগরবাসীগণ বুদ্ধকে পর্বত শিখরে এক উজ্জ্বল আলোর ন্যায় দেখিলেন যাহা সারা পর্বতটিকেও আলোকিত করিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলে সত্বর বুদ্ধের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

যে সকল নগরবাসীগণ, তাহাদের দল যুদ্ধে জয়ী হউক, এই কামনা করিয়া তাহাদের নিজস্ব দেবতার জন্য নৈবেদ্য সাজাইয়াছিল, তাহারা ভাবিল যে তাহাদের দেবতা শিষ্যগণসহ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বুদ্ধকে পর্বত শিখরে দেখিয়া রাজা জয়ন্ত ও তাঁহার ভ্রাতা যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। রাজা বুদ্ধের নিকট গিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে শিষ্যগণসহ আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া সসম্মানে সকলকে নগরে লইয়া আসিলেন। ॥ ১৩৫-১৩৭ ॥

রাজা বুদ্ধকে শিষ্যগণসহ মহাসাগর উদ্যানে লইয়া গিয়া ভাবিলেন, 'এই রাজকীয় সুরম্য কানন বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান। ইহা অপরিসর নয়।' রাজা সেই উদ্যানে তাঁবু স্থাপন করিয়া উহার মধ্যে যথাযোগ্য আসন সাজাইয়া বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে উপবেশন করাইলেন। ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘ যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে দ্বীপবাসীগণ চতুর্দিক হইতে তাঁহাদের জন্য নানাবিধ দান আনিয়া দিলেন। রাজা স্বহস্তে যাবতীয় খাদ্য পানীয় বুদ্ধ এবং ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিলেন। ॥ ১৪০-১৪১ ॥

অতঃপর আহার সমাপ্ত করিয়া বুদ্ধ বসিলে, রাজা তাঁহাকে মূল্যবান মহাসাগর উদ্যানটি দান করিলেন। সেই পুষ্পিত শান্ত উদ্যানটি বুদ্ধ গ্রহণ করিলে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। বুদ্ধ সেই স্থানে উপস্থিত অসংখ্য দ্বীপবাসীগণকে ধর্মদেশনা করিলেন। বিশ হাজার ব্যক্তিগণ সেই আসনেই অর্হত হইলেন। ॥ ১৪২-১৪৪ ॥

তথাগত সারাদিন উক্ত উদ্যানে অবস্থান করিয়া বিকালে সেই উদ্যানের

বিশেষ স্থানে গেলেন যে স্থানে পূর্বে বোধিবৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্থানে তিনি ধ্যানে বসিলেন। পরে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া, তিনি দ্বীপবাসীগণের মুক্তির চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমার বোধিবৃক্ষ নিগ্রোধের[১০] দক্ষিণ ডালটির একটি অংশ আনিয়া এই স্থানে রোপণ করা হউক। ভিক্ষুণী সুধম্মা অন্যান্য ভিক্ষুণীসহ সেই ডালটি লইয়া এই দ্বীপে আসিবে।' ॥ ১৪৫-১৪৭ ॥

ভিক্ষুণী সুধম্মা বুদ্ধের এই নির্দেশ জ্ঞাত হইয়া সেই রাজ্যের রাজাকে[১১] সঙ্গে লইয়া সেই গাছের নিকট গেলেন। অলৌকিক শক্তিসম্পনা সেই ভিক্ষুণী লাল সেঁকোবিষ লাগানো সরু কাঠি সেই গাছের ডালের একটি অংশে বৃত্তাকারে লাগাইলেন। ডালের সেই অংশটি মূল ডাল হইতে খসিয়া ভিক্ষুণীর কোলের উপর পড়িল। ভিক্ষুণী উহা স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া অলৌকিক শক্তিতে অন্যান্য ভিক্ষুণীসহ এই দ্বীপে আসিলেন। দেবতা পরিবৃত হইয়া সেই ভিক্ষুণী বুদ্ধের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে সেই স্বর্ণপাত্রটি অর্পণ করিলেন। তথাগত উহা গ্রহণ করিয়া রাজা জয়ন্তকে ডালটি রোপণ করিতে প্রদান করিলেন। রাজা সেই ডালটি 'মহাসাগর' উদ্যানের সেই বিশেষ স্থানে রোপণ করিলেন। ॥ ১৪৮-১৫২ ॥

অতঃপর কশ্যপ বুদ্ধ উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া নাগদেবতাদের পূজিবার স্থান অর্থাৎ উত্তরে অবস্থিত 'অশোকমালক' নামক স্থানে গিয়া, তথায় উপস্থিত জনগণকে ধর্মদেশনা করিলেন। চারি হাজার জীবসকল এই ধর্মে দীক্ষিত হইল।

উক্ত স্থান হইতে আরও উত্তরে যেইস্থানে পূর্বতন বুদ্ধগণ উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া কশ্যপ বুদ্ধ ধ্যানে বসিলেন। ধ্যান সমাপ্ত করিয়া তথাগত সেই স্থানে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে দশ হাজার উপস্থিত নর-নারীগণ অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ॥ ১৫৩-১৫৬ ॥

বর্ষাকালে পরিহিত স্বীয় উত্তরাসংঘাটি জনগণকে স্মারক চিহ্নরূপে প্রদান করিয়া, ভিক্ষুণী সুধম্মা ও অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে এবং বুদ্ধের শিষ্য সর্বনন্দ ও তাঁহার এক হাজার ভিক্ষুগণকে, এই দ্বীপে ধর্মপ্রচারের জন্য রাখিয়া বুদ্ধ কশ্যপ সুদর্শন নামক নদীর কূলে অবস্থিত শোমনসসমাল নামক স্থানে দ্বীপবাসীগণকে শুভেচ্ছা জানাইয়া বাকি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আকাশে উঠিয়া বাতাসে ভাসিয়া জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন'। ॥ ১৫৭-১৫৯ ।

ভিক্ষু মহিন্দ আবার বলিলেন, 'মহারাজ! এই যুগের চতুর্থ সত্যদ্রষ্টা, করণাঘন শাস্তা হইলেন গোতম বুদ্ধ। এই দ্বীপে আসিয়া তিনি প্রথমে যক্ষগণকে বিতাড়িত করিলেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া তিনি নাগগণকে

দমিত করিলেন। কল্যাণীর মণিঅক্ষি নাগের প্রার্থনায় বুদ্ধ তৃতীয়বার এই দ্বীপে আসিলে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তথায় আহার গ্রহণ করেন। ॥ ১৬০-১৬৩ ॥

বুদ্ধ গৌতম পূর্বের বোধিবৃক্ষের স্থানে এবং মহাস্তূপের স্থানে ধ্যানে বসেন। তাঁহার ব্যবহৃত বস্তুসকলের রক্ষার্থে যে স্তূপ নির্মিত হইবে, সেই স্থানেও বুদ্ধ ধ্যানে বসেন। ॥ ১৬৪ ॥

অতঃপর পূর্বতন বুদ্ধগণ যে স্থানে দাঁড়াইয়া দ্বীপবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, বুদ্ধ সেই স্থানে গিয়া জনশূন্য দ্বীপের দেবতাগণকে এবং নাগগণকে আহ্বান করিলেন। তাহাদের ধর্মদেশনা করিয়া শুভেচ্ছান্তে তিনি আকাশপথে জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ১৬৫ ॥

'মহারাজ! এই স্থানটি চারিজন বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত। এই স্থানে মহাস্তূপটি স্থাপিত হইবে, উহার প্রকোষ্ঠে থাকিবে বুদ্ধের স্মারক পাত্রটি। যেই পাত্র[১২] দ্বারা বুদ্ধের পূতাস্থি নানাভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, সেই স্মারক 'পাত্রটি'। এই মহাস্তূপটি হইবে একশত কুড়ি[১৩] হাত উচ্চ। উহার নাম হইবে হেমবালি।' ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

রাজা তিষ্য বলিলেন, 'ভন্তে! এই স্তূপ আমি নির্মাণ করিব।'

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার বংশের অন্য উত্তরাধিকারী এই স্তূপ নির্মাণ করিবেন। আপনার অন্য বহু কাজ আছে। আপনি উহা করুন।' ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার ভ্রাতা ও রাজ-প্রতিনিধি মহানাম-এর পুত্র যট্ঠালায়ক তিষ্য আপনার পরে রাজা হইবেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র 'গোঠাভয়' রাজা হইবেন। তাঁহার পুত্র কাকবন্ন তিষ্য তাহার পর রাজা হইবেন। এই রাজার পুত্র হইবেন মহারাজ অভয়, যিনি 'দুটঠগামনি' নামে খ্যাত হইবেন। এই মহামান্য, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন রাজা এই মহাস্তূপটি নির্মাণ করিবেন।' ॥ ১৭০-১৭২ ॥

ভিক্ষু এইরূপ নির্দেশ দিলে রাজা তিষ্য সেই স্থানে একটি পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া উহার গাত্রে ভিক্ষুর নির্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ॥ ১৭৩ ॥

মহাজ্ঞানী, অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন, ভিক্ষু মহিন্দকে রাজা তিষ্য মহামেঘ উদ্যানটি দান করিলে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। ভিক্ষু নানাস্থানে গেলে পৃথিবী এইরূপে বিশেষ কারণে মোট আটবার প্রকম্পিত হইয়াছিল।

নগরে প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া, পরে নন্দন-কাননে গিয়া ভিক্ষু মহিন্দ ধর্মদেশনা করিলেন। এই ধর্মদেশনায় ভিক্ষু মহিন্দ বুদ্ধের 'অগ্গিখন্ধোপমা' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিলেন। উপস্থিত

শ্রোতাদের মধ্যে এক হাজার নর-নারী সেই আসনে অর্হত হইলেন। ইহার পর ভিক্ষু মহিন্দ ভিক্ষুগণসহ মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন।

॥ ১৭৪-১৭৭ ॥

তৃতীয় দিনেও ভিক্ষু মহিন্দ ভিক্ষুগণসহ রাজা তিষ্যর প্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নন্দন-কাননে গিয়া উপস্থিত জনগণকে বুদ্ধের 'অসিবিষোপমা' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিলেন। এক হাজার শ্রোতা ইহাতে ধর্মে দীক্ষা লইলেন। ইহার পর ভিক্ষু মহিন্দ ও ভিক্ষুগণ মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

রাজা তিষ্য ভিক্ষু মহিন্দের ধর্মদেশনা শুনিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! ধর্ম কি দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইল।'

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! ধর্মস্থানের সীমানা নির্ধারিত হইবার পর উপসথ উদ্‌যাপনের জন্য এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বুদ্ধ সেই সকল স্থানের সীমানা নির্ধারণের কথা বলিয়াছেন।'

॥ ১৮০-১৮১ ॥

রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! বুদ্ধের নির্দেশ আমি মান্য করিব। আপনি সত্বর এই নগরকে মধ্যে রাখিয়া এই সকল স্থানের সীমানা নির্ধারণ করুন।'

ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! তবে তাহাই হউক। আপনি স্থান এবং সীমানা ঠিক করুন। আমরা উহা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সীমানারূপে অনুমোদন করিব।'

দেবতাগণ যেমন স্বর্গের নন্দন-কানন ত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেইরূপ রাজা সম্মত হইয়া মহামেঘ বন হইতে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

॥ ১৮২-১৮৫ ॥

চতুর্থ দিনেও ভিক্ষু মহিন্দ ভিক্ষুসংঘসহ রাজা তিষ্যের প্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নন্দন-কাননে গিয়া উপস্থিত জনগণকে তথায় বুদ্ধের 'অনমতগ্‌গ' সূত্রটি ব্যাখ্যা করিলেন। সেই ধর্মদেশনায় এক হাজার নর-নারী অমৃতপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর ভিক্ষু মহামেঘ বনে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। ॥ ১৮৬-১৮৭ ॥

রাজা তিষ্য প্রভাতে ভেরীর শব্দ করিয়া সারা নগর এবং মহামেঘ উদ্যানে যাইবার পথটি সাজাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ করা হইলে, রাজা যথাসময়ে সালংকারা হইয়া রাজরথে চড়িয়া অমাত্যগণ এবং রাজঅন্তঃপুরের রমণীগণসহ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে মহামেঘ উদ্যানে আসিলেন। সেই উদ্যানে পৌঁছিয়া রাজা ভিক্ষু মহিন্দ এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণকে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া সেই উদ্যানের ভূমিতে বৃহৎ

বৃত্তাকারে অনেকখানি জমিতে সীতা কাটিলেন। কদম্ব নদীর অগভীর স্থান হইতে শুরু করিয়া সেই বৃহৎ বৃত্ত আবার নদীর কূলে আসিয়া থামিল। ॥ ১৮৮-১৯১ ॥

রাজা এইরূপে বত্রিশটি স্থানের এবং একটি স্তূপের সীমারেখা নির্ধারণ করিলেন। মহান ভিক্ষু মহিন্দ সেই সকল স্থানকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের স্থানরূপে প্রথাগতভাবে অনুমোদন করিয়া উহাদের ভিতরের মূল সীমারেখা নির্ধারণ করিলেন। একই দিনে সমস্ত সীমানা নির্ধারিত হইল। কর্ম সমাপ্ত হইলে এইদিনও পৃথিবী প্রকম্পিত হইল।

॥ ১৯২-১৯৪ ॥

পঞ্চম দিনেও ভিক্ষু মহিন্দ এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নন্দনকাননে গিয়া বুদ্ধের 'খজ্জনিয়' সূত্রটি[১৪] ভিক্ষু মহিন্দ ব্যাখ্যা করিলেন। উপস্থিত জনগণের মধ্যে একহাজার জন অমৃতপদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভিক্ষুগণ মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন।

॥ ১৯৫-১৯৬ ॥

ষষ্ঠ দিনেও ভিক্ষু মহিন্দ এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নন্দনকাননে গিয়া উপস্থিত জনগণকে বুদ্ধের 'গোময়পিন্ডী[১৫]' সূত্রটি ভিক্ষু মহিন্দ ব্যাখ্যা করিলেন। এই ধর্মদেশনায় এক হাজার জনগণ ধর্মে দীক্ষা লইলেন। পরে ভিক্ষুগণ মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। ॥ ১৯৭-১৯৮ ॥

সপ্তম দিনেও ভিক্ষু মহিন্দ এবং অন্যান্য ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া নন্দনকাননে গিয়া উপস্থিত জনগণকে বুদ্ধের 'ধম্মচক্ক-পবত্তন' সূত্রটি ভিক্ষু মহিন্দ ব্যাখ্যা করিলেন। এই ধর্মদেশনায় এক হাজার জনগণ ধর্মে দীক্ষা লইলেন। পরে ভিক্ষুগণ মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। ॥ ১৯৯-২০০ ॥

এইরূপে এই জ্যোতির্ময় ভিক্ষু মহিন্দ সাতদিনে আট হাজার দ্বীপবাসীগণকে ধর্মে দীক্ষা দিলেন। ॥ ২০১ ॥

এই দ্বীপের নন্দনকাননে জ্যোতির্ময় ভিক্ষু মহিন্দ সত্যধর্মের দীপ্তি বিকিরণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে এই উদ্যানের নতুন নামকরণ হইল—'জ্যোতিবন'।

রাজা তিষ্য প্রথমেই মহামেঘ বনে ভিক্ষুর জন্য প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই তিষ্যারামে (মহামেঘ উদ্যান) প্রাসাদ নির্মাণের জন্য আগুনে সত্বর ইট শুকানো হইল। সেই প্রাসাদ ছিল কৃষ্ণবর্ণের। সেই কারণে উহাকে বলা হইল—'কালপাসাদ-পরিবেন'।

॥ ২০২-২০৪ ॥

রাজা বোধিবৃক্ষকে ঘিরিয়াও একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। উহার নাম হইল পরে 'লোহ-পাসাদ[১৬]'। সেই গৃহের পার্শ্বে হইল ভিক্ষুগণের ভোজনাগার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির গৃহ। এইরূপে রাজা তিষ্য বহু মনোরম ধর্মীয় গৃহাদি নির্মাণ করিলেন। তিনি স্নানের নানা পুষ্করিণী এবং বিশ্রামাগারা (দিবা-রাত্রির জন্য) ইত্যাদিও নির্মাণ করিলেন। পুষ্করিণীর পাশে যে ধর্মীয় গৃহটি ভিক্ষু মহিন্দর জন্য নির্মিত হইল উহাকে বলা হইল 'শুনহাত পরিবেণ'। যে স্থানে দ্বীপের আলোকসম ভিক্ষু মহিন্দ চংক্রমণ করিয়া ধ্যান করিতেন সেই স্থানে রাজা তিষ্য যে লম্বা গৃহটি নির্মাণ করিলেন উহাকে 'দীঘচংক্রমন-পরিবেণ' বলা হইল। যে স্থানে ভিক্ষু মহিন্দ ধ্যানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানের মনোরম গৃহটিকে বলা হইল —'ফলগ্গ পরিবেণ'। যে স্থানে ভিক্ষু মহিন্দ হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে নির্মিত গৃহটিকে বলা হইল—'থেরাপসস্সয়-পরিবেণ'। যেই স্থানে দেবতাগণ ভিক্ষু মহিন্দর নিকট আসিয়া ধর্ম শুনিলেন, সেই স্থানে নির্মিত গৃহটি হইল—'মরুগণ-পরিবেণ'। ॥ ২০৫-২১১ ॥

রাজা তিষ্যের সেনাপতি দীঘসনন্দন ভিক্ষু মহিন্দকে আটস্তম্ভযুক্ত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিলেন। এই বিখ্যাত গৃহটি পরে হইল বহু বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আবাসস্থল। প্রাসাদটি 'দীঘসনন্দ সেনাপতি-পরিবেণ'[১৭] নামে খ্যাত হইল। ॥ ২১২-২১৩ ॥

'দেবগণের প্রিয়' খ্যাতিযুক্ত বিজ্ঞরাজা তিষ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় লংকাদ্বীপে পরিচ্ছন্ন চিত্তের ভিক্ষু মহিন্দর জন্য সর্বপ্রথম এই 'মহামেঘ-বনারাম'[১৮] নামক মহাবিহারটি মহামেঘ উদ্যানে নির্মিত হইল। ভিক্ষু মহিন্দ মহাবিহারটি স্বীকার করিলেন। ॥ ২১৪ ॥

মহাবিহারের স্বীকৃতি সমাপ্ত

এইখানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'মহাবিহারের স্বীকৃতি।' পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. এই প্রাচীন উদ্যানটি ছিল অনুরাধপুরের দক্ষিণে।
২. সংযুক্তনিকায় দ্রষ্টব্য।
৩. প্রাচীন উদ্যানটি ছিল অনুরাধপুর নগরের দক্ষিণে।
৪. এই উদ্যানটি মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসংঘকে দান করেছিলেন (বিনয়পিটকে এবং জাতকে বলা আছে)।

৫. নাগপূজা খুবই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সাপের ভয়ে মানুষ কুসংস্কারে এই পূজার সূত্রপাত করে। এই প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে এইখানে।

৬. খাদ্যবস্তু।

৭. এইখানে গৌতম বুদ্ধের পূর্বের তিনজন কাল্পনিক বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাঁরাও গৌতম বুদ্ধের মতো (?) লঙ্কাদ্বীপে গিয়েছিলেন বলা হয়েছে।

৮. টীকাকার বলেছেন, এই রাজা হচ্ছেন জম্বুদ্বীপের ক্ষেমবতী নগরের রাজা ক্ষেম। 'বুদ্ধবংশ' দ্রষ্টব্য।

৯. টীকাকার বলেছেন, এই রাজা ছিলেন জম্বুদ্বীপের শোভবতী নগরের রাজা শোভন। 'বুদ্ধবংশ' দ্রষ্টব্য।

১০. বটগাছ।

১১. টীকাকার বলেছেন, এই রাজা হচ্ছেন বারাণসীর রাজা কিকী। (বুদ্ধবংশ এবং পরমত্থদীপনী দ্রষ্টব্য)।

১২. দীঘনিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

১৩. একশ আশী ফিট উচ্চ।

১৪. সংযুত্তনিকায় দ্রষ্টব্য।

১৫. সংযুত্তনিকায় দ্রষ্টব্য।

১৬. টীকাকার বলেছেন, এই প্রাসাদটি জীর্ণ হলে পরে রাজা দুটঠগামনি পুনরায় সেটা নির্মাণ করেন।

১৭. পরিবেণ-এর অর্থ হলো ভিক্ষুগণের বাসের আগার বা ধর্মশিক্ষার স্থান। আর 'আরাম'-এর অর্থ হল 'উদ্যান'।

১৮. এই মহাবিহারটি শ্রীলঙ্কায় স্থাপিত প্রথম বৌদ্ধবিহার। এই প্রাচীন বিহারটি অনুরাধপুরে আজও আছে।

১৬
'চেতিয়-পব্বত' বিহারের স্বীকৃতি

নগরবাসীগণকে ধর্মদেশনা করিয়া এবং রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু মহিন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুগণ মহামেঘ উদ্যানে ছাব্বিশ দিন অবস্থান করিলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশ দিনে ভিক্ষু মহিন্দ ও ভিক্ষুগণ রাজপ্রাসাদে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবার পর বুদ্ধের মহাপ্পমাদ[১] সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া একসময় নগরের পূর্ব দ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া চেতিয় পর্বত[২] অভিমুখে চলিলেন। চেতিয় পর্বতে বিহার নির্মিত হইবে এই আনন্দে ভিক্ষু তথায় চলিলেন। ॥ ১-৪ ॥

রাজা তিষ্য শুনিলেন যে ভিক্ষু মহিন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুগণ নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা তাঁহার দুই রাণীসহ শকটে চড়িয়া সত্বর ভিক্ষুগণের পিছনে ছুটিলেন। ॥ ৫-৬ ॥

ভিক্ষুগণ নাগচতুক্ক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পরপর সারিবদ্ধভাবে পর্বতে আরোহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময় রাজা তিষ্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিলেন। ভিক্ষুগণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! এই অসহ্য গরমে আপনি কী কারণে ক্লান্ত দেহে এত দূরে আসিয়াছেন?' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আপনারা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন শুনিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে এতদূরে ছুটিয়া আসিয়াছি।' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা বর্ষাবাস করিতে নগর ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছি।' যে ভিক্ষু এই সকল বিধি-বিধান সম্যক জ্ঞাত ছিলেন, তিনি রাজাকে বর্ষাবাসের বিষয়টি জ্ঞাত করিলেন। ॥ ৭-৯ ॥

রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রধান অমাত্য মহারিটঠ ও তাহার পঞ্চান্নজন ভ্রাতা রাজার নিকটে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুর ধর্মদেশনা শুনিয়া রাজার অনুমতি লইয়া সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল জ্ঞানীগণ মস্তক মুণ্ডন কালেই অর্হত হইয়াছিলেন। ॥ ১০-১১ ॥

রাজা সেইদিনই সেই পর্বতে আটষট্টিটি প্রস্তর কক্ষ সম্বলিত বিহার নির্মাণের কার্য শুরু করিয়া দিলেন। পরবর্তীকালে যেই স্থানে 'কন্টক চেতিয়' নির্মিত হইয়াছিল, এই বিহারটি ছিল সেই স্থানের নিকটেই। রাজা নির্মাণকার্য শুরু করিয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেও ভিক্ষুগণ সেই পর্বতে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা কেবল ভিক্ষান্নের জন্য নগরে আসিতেন। ॥ ১২-১৩ ॥

সেই প্রস্তরে নির্মিত বিহারটি প্রস্তুত হইলে, রাজা আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে আসিয়া বিহারটি[৩] ভিক্ষুগণকে প্রদান করিলেন। ইহা ছিল রাজার অভিষেকের অঘ্যস্বরূপ। ॥ ১৪ ॥

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহিন্দ সকল ধর্মীয় স্থানের সীমানা স্থির করিয়া বত্রিশটি সেইরূপ স্থান ও একটি বিহার স্হাপনের পর, সেইদিন 'তম্বরূমালক' স্হানে গিয়া দ্বীপের সকল প্রব্রজিত ব্যক্তিদের উপসম্পদা প্রদান করিলেন। বাষট্টিজন অর্হত চেতিয় পর্বতে গিয়া বর্ষাবাস করিলেন। তাঁহারা রাজাকে আশীষবর্ষণ করিলেন।

ভিক্ষুগণের নেতা ভিক্ষু মহিন্দকে অসংখ্য দেবতা এবং মানুষ অভিবাদন জানাইলেন। তাঁহার ভিক্ষুগণও আনন্দিত হইলেন। সেই সকল পুণ্যবানরা এইরূপে বহু পুণ্যফলপ্রাপ্ত হইলেন।

চেতিয় পর্বত বিহারের স্বীকৃতি সমাপ্ত

এইখানে ষষ্টদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'চেতিয় পর্বত বিহারের স্বীকৃতি'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. সংযুক্তনিকায় দ্রষ্টব্য।
২. এই মিসসক পাহাড়ে চৈত্য নির্মিত হয়েছিল বলে পরে পাহাড়টির এই নাম হয়।
৩. বিহার ছিল ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের জন্য। সেখানে কোনরূপ বুদ্ধমূর্তি তখনও ছিল না। বুদ্ধমূর্তি পূজার কথা কোথায়ও নেই।

১৭
বুদ্ধের পূতাস্থিত আবির্ভাব

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহিন্দ বর্ষাবাসের পর, প্রবারণা উৎসব উদ্‌যাপনের শেষে, কার্তিক পূর্ণিমায়, রাজা তিষ্যকে বলিলেন, 'মহারাজ! সম্যক-সম্বুদ্ধ বহুদিন হইল আমাদের মধ্যে নাই। আমরা প্রভুহীন[১] জীবনযাপন করিতেছি। আমাদের পূজনীয় কিছুই নাই।' ॥ ১-২ ॥

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আপনি কি পূর্বে বলেন নাই যে, সম্যকসম্বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করিয়াছেন? তবে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দেখিলে উহার মধ্যে আমরা তাঁহাকেই দেখিব।' ॥ ৩-৪ ॥

রাজা তিষ্য পুনরায় বলিলেন, 'ভন্তে! আমার স্তূপ নির্মাণের বাসনা আপনার অজ্ঞাত নয়। আপনি যদি বুদ্ধের কোন স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান পান, তবে আমি উহার উপর স্তূপ নির্মাণ করিব।' ॥ ৫ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! এই বিষয়ে আপনি ভিক্ষু সুমন-এর সহিত কথা বলুন।'

অতঃপর রাজা তিষ্য ভিক্ষু সুমনকে বলিলেন, 'ভন্তে! বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন কি কখনও আমরা প্রাপ্ত হইব?' ॥ ৬ ॥

ভিক্ষু সুমন রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি এবং আপনার অনুচরগণ উপসথদিবস পালন করিয়া, সারা নগর, রাজপথ ইত্যাদি সুশোভিত করিয়া, সন্ধ্যায় সুসজ্জিত রাজহস্তীর পৃষ্ঠে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া আপনি বাদ্য-সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রায় যেইদিন মহানাগউদ্যানে যাইবেন, সেইদিন সেইখানে আপনি সর্ব 'ভব' ধ্বংসকারী বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত হইবেন।'

রাজা ইহা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ॥ ৭-৮ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ রাজপ্রাসাদ হইতে ভিক্ষুসংঘসহ চৈতিয় পর্বতে ফিরিয়া গিয়া ভিক্ষু সুমনকে বলিলেন, 'হে মিত্র সুমন! তুমি পুপ্‌ফপুরায়[২] গিয়া তোমার মতামহ, মহান রাজাকে বল'—'আপনার মিত্র, দেবতাদের প্রিয় ব্যক্তি, মহারাজা তিষ্য, বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা লইয়া স্তূপ নির্মাণে অভিলাষি। আপনি তাঁহাকে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শাস্তার ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি প্রদান করুন। আপনার নিকট বুদ্ধের আরও বহু স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে।' । ৯-১২ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ আরও বলিলেন, 'হে মিত্র সুমন! বুদ্ধের উক্ত ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া তুমি দেবলোকে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া বলিবে, 'হে দেবরাজ! আপনার নিকট বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বের একটি দন্ত ও দক্ষিণ পার্শ্বের কণ্ঠাস্থিটি রহিয়াছে। আপনি দন্তধাতু পূজা করুন এবং কণ্ঠাস্থিটি আমাকে প্রদান করুন। আমি উহা লংকাদ্বীপে লইয়া যাইব। এই দ্বীপের প্রতি আপনারও কর্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্তব্যে আপনি শ্রান্তবোধ করিবেন না।' ॥ ১৩-১৫ ॥

সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভিক্ষু সুমন বলিলেন, 'ভন্তে, তথাস্তু!' এই বলিয়া ভিক্ষু সেই মুহূর্তে রাজা ধর্মাশোকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু শালবৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে রাজা কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবে বোধিবৃক্ষকে পূজা করিতেছেন। ॥ ১৬-১৭ ॥

অতঃপর ভিক্ষু সুমন রাজাকে যাহা কিছু বলিবার বলিলেন। বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি রাজা ভিক্ষুকে প্রদান করিলে, ভিক্ষু সুমন উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্বতে চলিয়া গেলেন। সেইখানে এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ভিক্ষাপাত্রটি রাখিয়া ভিক্ষু দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভিক্ষুর বক্তব্য শুনিয়া চুলামণি চৈত্য[৩] হইতে বুদ্ধের দক্ষিণ কণ্ঠাস্থিটি বাহির করিয়া ভিক্ষুর হস্তে প্রদান করিলেন। ভিক্ষু সুমন সেই পূতাস্থি সাদরে গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে গিয়া বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটিও সঙ্গে লইয়া মুহূর্তে লংকাদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া চেতিয় পর্বতে অবস্থিত ভিক্ষু মহিন্দর নিকট সেই সকল প্রদান করিলেন। ॥ ১৮-২১ ॥

ভিক্ষু সুমন রাজা তিষ্যকে যেইরূপ বলিয়াছিলেন, রাজা সেইমত ব্যবস্থাদি করিয়া সন্ধ্যায় সজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকিয়া মহানাগ উদ্যানে গেলেন। ॥ ২২ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ রাজা ধর্মাশোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি চেতিয় পর্বতে রাখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রদত্ত বুদ্ধের পূতাস্থিটি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষুসংঘসহ মহানাগ উদ্যানে রাজা তিষ্যের নিকটে আসিলেন। ॥ ২৩-২৪ ॥

রাজা তিষ্য পাত্রে ঢাকা বুদ্ধের পূতাস্থি সম্বন্ধে ভাবিলেন, 'ইহা যদি সত্যই প্রভু বুদ্ধের পূতাস্থি হয় তবে আমার শ্বেতছত্রটি নিজ হইতেই নমিত হইবে; আমার হস্তী তাহার সামনের পায়ের হাটুদ্বয় ভাঙিয়া শ্রদ্ধা জানাইবে এবং পূতাস্থির পাত্রটি আমার মস্তকের উপর স্থাপিত হইবে।' ॥ ২৫-২৬ ॥

রাজা যেইরূপ ভাবিলেন, তাহাই হইল। ইহা দেখিয়া রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। মনে হইল যেন স্বর্গীয় সুধা তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। রাজা তাঁহার মস্তকে স্থাপিত পূতাস্থির পাত্রটি তুলিয়া লইয়া

উহা শ্বেতছত্রের নীচে, সজ্জিত রাজহস্তীর পৃষ্ঠে, স্থাপন করিলেন।
॥ ২৭ ॥

রাজহস্তীর পৃষ্ঠে পূতাস্থির পাত্রটি স্থাপিত হইলে রাজহস্তী আনন্দে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ॥ ২৮ ॥

রাজহস্তী মুখ ঘুরাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে, ভিক্ষুসংঘ, রাজা এবং তাঁহার অনুচরগণ বাদ্য-সঙ্গীতসহ নানা শকটে নগরের পূর্বদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া, নগর প্রদক্ষিণ করিয়া, নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে গেল যেই স্থানে পরবর্তীকালে স্তূপ নির্মাণ করা হইয়াছিল। যাইবার পথে, যেই স্থানে বোধিবৃক্ষ রোপণ করা হইবে, সেই স্থানে রাজহস্তী কিছুক্ষণ পূর্বমুখী হইয়া দাঁড়াইল।
॥ ২৯-৩১ ॥

সেই সময় স্তূপ নির্মাণের স্থানটি কদম্বলতায় ও অন্যান্য গুল্মে আবৃত ছিল। রাজা স্থানটি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিয়া হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে পূতাস্থির পাত্রটি নামাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হস্তী উহা নামাইতে দিল না। রাজা ভিক্ষু মহিন্দকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! হস্তীর পৃষ্ঠের সমান উচ্চ কোন স্থানে পূতাস্থির পাত্রটি রাখিবার ব্যবস্থা হইলে, হস্তী উহাতে আপত্তি করিবে না।' ॥ ৩২-৩৪ ॥

অতঃপর শুষ্ক অভয়-পুষ্করিণী হইতে মাটি আনিয়া হস্তীর পৃষ্ঠের সমান উচ্চ একটি বেদী রাজার নির্দেশে নির্মাণ করা হইল। সেই বেদী নানারূপে সজ্জিত করা হইল। ইহার পর হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে পূতাস্থির পাত্রটি নামাইয়া, রাজা উহা সেই বেদীর উপর রাখিলেন। ইহাতে হস্তী কোনরূপ আপত্তি করিল না। ॥ ৩৫-৩৬ ॥

রাজহস্তীকে সেই পূতাস্থি পাহারার দায়িত্ব দিয়া রাজা উক্ত স্থানে পূতাস্থির স্তূপ নির্মাণের জন্য সত্বর ইট তৈয়ারী করিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি পূতাস্থির সম্মানার্থে উৎসবের আয়োজন করিতে অমাত্যগণসহ রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। ভিক্ষু মহিন্দ ভিক্ষুসংঘসহ মনোরম মহামেঘ উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। ॥ ৩৭-৩৯ ॥

সারারাত্রি রাজহস্তী পূতাস্থির চারিদিকে বিচরণ করিয়া পাহারা দিল। পরদিনও সারাদিন রাজহস্তী পূতাস্থির পাহারায় রহিল। যতদিন না স্তূপের সকল ইট প্রস্তুত হইল, ততদিন রাজহস্তী বোধিবৃক্ষ রোপণের স্থানের নিকট দাঁড়াইয়া সকল কিছুর উপর শ্যেন দৃষ্টি রাখিল। ॥ ৪০ ॥

ভিক্ষু মহিন্দের নির্দেশ অনুযায়ী রাজা তিষ্য স্তূপের ইটের ভিত

হইতে স্তূপটি হাটু সমান উচ্চ করিলেন। ইহার পর পূতাস্থি স্থাপনের উৎসব শুরু করিতে রাজা চারিদিকে সংবাদ পাঠাইলেন। সেই সংবাদে চতুর্দিক হইতে বহু লোকের সেই স্থানে সমাগম হইল। ॥ ৪১-৪২ ॥

সেই অসংখ্য জন সমাগমের মধ্যে পূতাস্থির পাত্রটি বেদী হইতে মহাশূন্যে উঠিয়া গেল। উহা সাতটি তালগাছের সমান উচ্চতায় উঠিয়া সকলের দৃষ্টির সম্মুখে শূন্যে ভাসিতে লাগিল। সকলে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই পূতাস্থি শূন্যে দ্বৈত অলৌকিক[৪] দৃশ্যের অবতারণা করিল যাহা ছিল লোমহর্ষক, ঠিক যেমন প্রভু বুদ্ধ দেখাইয়াছিলেন একসময় এক বৃহৎ আমগাছের নীচে। সেই দৃশ্যের আলোক রশ্মিতে ও জলস্রোতে যেন সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ বারবার আলোকিত ও প্লাবিত হইল। ॥ ৪৩-৪৫ ॥

মার বিজয়ীবীর নির্বাণ শয্যায় পাঁচটি সংকল্প করিয়াছিলেন[৫]। 'বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটি রাজা অশোক ধরিলেই উহা স্বেচ্ছায় খসিয়া পড়িবে। রাজা উহা সুবর্ণপাত্রে স্থাপন করিবেন।

সেই সময় সারা জগৎ ছয়টি বর্ণের জ্যোতিতে আলোকিত হইবে।

সেই সুবর্ণপাত্র সাতদিন ধরিয়া তুষারমণ্ডিত প্রদেশে অদৃশ্য থাকিবে।

আমার কণ্ঠীর অস্থি যদি স্তূপে স্থাপন করা হয়, উহা মহাশূন্যে উঠিয়া গিয়া দ্বৈত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিবে।

আমার পূতাস্থিভাগের পাত্রটি যদি হেমমালিক চৈত্যে স্থাপন করা হয়, উহা বুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া মহাশূন্যে ভাসিবে। উহাও দ্বৈত অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া সস্থানে ফিরিবে।' ॥ ৪৬-৫২ ॥

তথাগত উক্ত পাঁচটি সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই সংকল্পে বুদ্ধের এই পূতাস্থি অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিলেন। ॥ ৫৩ ॥

সেই পূতাস্থি শূন্য হইতে নামিয়া রাজার মস্তকের উপর আসিয়া অবস্থান করিল। রাজা উহা আনন্দের সহিত স্তূপে স্থাপন করিলেন। সেই মুহূর্তে পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। ইহাতে সকল জনগণ শিহরিয়া উঠিল। বুদ্ধগণের ক্ষমতা বোধগম্য নয়; বোধগম্য নয় তাঁহাদের প্রকৃতি। আর যাহারা বুদ্ধগণের প্রতি বিশ্বাসী, তাহাদের প্রাপ্তিও অবোধ্য।

॥ ৫৪-৫৬ ॥

জনগণ উক্ত অলৌকিক দৃশ্যসকল দেখিয়া বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। রাজা তিষ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মত্তাভয় ছিলেন বুদ্ধভক্ত। তিনি রাজার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি লইয়া তাঁহার সহস্র অনুচরসহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ৫৭-৫৮ ॥

শুধুমাত্র ইহাই নয়—চেতাভিগাম, দ্বারমণ্ডল, বিহারবীজ, গল্লকপীঠ

এবং উপতিষ্যগাম প্রভৃতি প্রতি গ্রাম হইতে, পাঁচশত জন ব্যক্তি, আসিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ॥ ৫৯-৬০ ॥

দেখা যাইতেছে যে, নগরে এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের সর্ব সমেত ত্রিশ হাজার ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু হইলেন। ॥ ৬১ ॥

লংকাদ্বীপের রাজা তিষ্য বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপিত স্তূপটি নির্মাণ করিয়া নানা রত্নাদি দ্বারা মনোরমভাবে উহাকে সজ্জিত করিয়া শাশ্বতকাল ধরিয়া উহার পূজার ব্যবস্থা করিলেন। রাজার অন্তপুরবাসীগণ, অমাত্যগণ, নগরবাসীগণ, গ্রামবাসীগণ সকলে এই স্তূপে তাহাদের অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাজা তিষ্য এই স্থানে পরে একটি বিহারও নির্মাণ করেন। স্তূপের উদ্যানে এই বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া বিহারটি 'থূপারাম বিহার' নামে খ্যাত হয়। ॥ ৬৪ ॥

নির্বাণপ্রাপ্ত শাস্তা তাঁহার নশ্বর দেহের পূতাস্থি দিয়া বিশ্বজনের মুক্তিসাধনের ইচ্ছায়, অজস্র করুণা ও শান্তি প্রদান করিলেন। শাস্তা জীবিত থাকিলে তাঁহার এই অবদান কি সম্ভব হইত ? ॥ ৬৫ ॥

বুদ্ধের পূতাস্থির আবির্ভাব সমাপ্ত

এইখানে সপ্তদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'বুদ্ধের পূতাস্থির আবির্ভাব'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. বুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।
২. পাটলিপুত্রের পূর্বের নাম ছিল পুপ্পপুরা।
৩. কাল্পনিক চৈত্য যা স্বর্গে অবস্থিত।
৪. বুদ্ধ এইরূপ নানা অলৌকিক দৃশ্য নাকি দেখিয়েছিলেন শ্রাবস্তিতে : জল ও অগ্নি এই দুই বিপরীত শক্তিকে নাকি একই সঙ্গে উদ্ভব করেছিলেন বুদ্ধ। মহাযানী গ্রন্থ 'সমন্ত-পাসাদিক' দ্রষ্টব্য।
৫. সবটাই কাল্পনিক।

১৮

মহাবোধিবৃক্ষ গ্রহণ

মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহিন্দ জম্বুদ্বীপ হইতে বোধিবৃক্ষের শাখা ও ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাসহ অন্যান্য ভিক্ষুণীগণকে লঙ্কাদ্বীপে আনয়ন করিবার কথা মহারাজা তিষ্যকে বলিয়াছিলেন। রাজা তিষ্যর সেই কথা স্মরণে আছে।

একদিন রাজধানীতে বসিয়া রাজা তিষ্য ভিক্ষু মহিন্দের সহিত আলাপ-চারিতায় সেই কথা উঠিলে, রাজা অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া মহামন্ত্রী অরিট্‌ঠকে উক্ত কাজের ভার দিলেন। ॥ ১-৩ ॥

রাজা উক্ত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিয়া মহামন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে মিত্র! তুমি কি সময় করিয়া একবার ধর্মাশোকের নিকট গিয়া পবিত্র বোধিবৃক্ষের একটি শাখা এবং ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাকে আনিতে পারিবে?' মহামন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজ! আমি অনুমতি পাইলে নিশ্চয়ই আনিতে পারিব। তবে, আমি ফিরিয়া আসিলে আমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন'। ॥ ৪-৫ ॥

রাজা বলিলেন, 'বেশ, তাহাই হইবে। তুমি সত্বর রওনা হও।' মহারাজ এবং ভিক্ষু মহিন্দের নির্দেশে মহামন্ত্রী তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া পূর্ণ উদ্যমে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিবসে জম্বুকোল বন্দরে জলযানে আরোহণ করিলেন। মহাজ্ঞানী ভিক্ষুর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে মহামন্ত্রী মহাসাগর পাড়ি দিয়া সেই একই দিনে মনোরম পুপ্‌পপুরায় গিয়া পৌঁছিলেন। ॥ ৬-৮ ॥

মহারাণী অনুলা পাঁচশত যুবতী ও পাঁচশত অন্তঃপুরবাসিনীসহ বুদ্ধের শীল[১] গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য শুদ্ধচিত্তে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই ভিক্ষুণীর প্রতিক্ষায় নগরের এক প্রান্তে রাজা কর্তৃক নির্মিত একটি ভিক্ষুণীআবাসে জীবনযাপন করিতেছিলেন। এই ভিক্ষুণী আবাসে কেবল বুদ্ধের উপাসিকারা অবস্থান করিতেন বলিয়া সেই আবাসনটি 'উপাসিকা বিহার' নামে খ্যাত হইল। ॥ ৯-১২ ॥

মহামন্ত্রী অরিট্‌ঠ রাজা তিষ্যের অনুরোধটি রাজা ধর্মাশোকের নিকট বিনয়ে উপস্থাপন করিয়া ভিক্ষু মহিন্দের বার্তাটিও এইরূপে প্রদান করিলেন, 'মহারাজ! আপনার ভ্রাতাসম মিত্র, দেবতাগণের প্রিয়, রাজা তিষ্যের মহিষী প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রতিক্ষায় কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক

ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাকে লংকাদ্বীপে পাঠাইতে আজ্ঞা হউক। ভিক্ষুণীর সহিত পবিত্র বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটিও পাঠাইতে আজ্ঞা হউক।'
॥ ১৩-১৫ ॥

মহামন্ত্রী অরিটঠ ভিক্ষু মহিন্দের বক্তব্যটি ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাকেও জানাইলেন। ইহা শুনিয়া ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা তাঁহার পিতার নিকট গিয়া ভিক্ষু মহিন্দের উক্ত বক্তব্যটি জানাইলেন। ॥ ১৬ ॥

মহারাজ অশোক ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাকে বলিলেন, 'হে প্রিয় কন্যা! পুত্র ও দৌহিত্রের শোক তোমার দর্শনে আমি সংবরণ করি। আবার তোমার অদর্শনে সেই শোক আমি সংবরণ করিব কী করিয়া?' ॥ ১৭ ॥

ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা বলিলেন, 'মহারাজ! আমার ভ্রাতার বক্তব্যটি অর্থপূর্ণ। সেই দেশের বহু মহিলাগণ প্রব্রজ্যার প্রতিক্ষায় রহিয়াছেন। অতএব বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া আমাকে সেই দেশে যাইতেই হইবে।'
॥ ১৮ ॥

রাজা ভাবিলেন, 'পবিত্র মহাবোধিবৃক্ষকে ছুরি দ্বারা আঘাত করা যাইবে না। তবে আমি কীরূপে উহার শাখাটি গ্রহণ করিব? উহা লংকাদ্বীপে প্রেরণ করা কি সমীচীন হইবে?' ॥ ১৯ ॥

অতঃপর রাজা অশোক অমাত্য মহাদেব-এর সহিত পরামর্শ করিয়া ভিক্ষুসংঘকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া আতিথেয়তা প্রদর্শনের পর তাঁহাদের বলিলেন, 'ভন্তে! পবিত্র মহাবোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখাটি কি লংকাদ্বীপে প্রেরণ করা যাইতে পারে?'

ভিক্ষুসংঘের প্রধান ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য বলিলেন, 'মহারাজ! উহা প্রেরণ করিতেই হইবে।' ভিক্ষু রাজাকে বুদ্ধের পঞ্চচক্ষু বিশিষ্ট পঞ্চ সংকল্পের কথা জানাইলেন। ॥ ২০-২২ ॥

জগৎপতি রাজা অশোক ইহা শুনিয়া প্রীত হইলেন। তিনি মহাবোধি বৃক্ষে যাইবার সাত যোজন দীর্ঘ পথটি পরিষ্কার করাইয়া নানাবিধ উপকরণে সেই পথ সুন্দররূপে সাজাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বর্ণপাত্র প্রস্তুত করিতে রাজা স্বর্ণকারকে স্বর্ণেরতাল প্রদান করিতে গেলে, স্বর্ণকারের ছদ্মবেশে বিশ্বকর্মা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! পাত্রটি কতবড় হইবে?' রাজা বলিলেন, 'হে স্বর্ণকার! উহা তুমিই ঠিক কর।'

বিশ্বকর্মা স্বর্ণের তালটি লইয়া সেই মুহূর্তেই নিজের হাতে পাত্রটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ॥ ২৩-২৬ ॥

রাজা অশোক পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। বৃত্তাকার পাত্রটির পরিধি ছিল নয় হাত[২], গভীরতা ছিল পাঁচ হাত, ব্যাস ছিল তিন হাত এবং আট আঙুল

পরিমাণ ছিল পুরু। উহার উপরের কানা ছিল হস্তীশাবকের শুঁড়ের ন্যায় পুরু। পাত্রটি উজ্জ্বলতায় ছিল ভোরের সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান।
॥ ২৭-২৮ ॥

সালংকারা রাজা অশোক স্বর্ণপাত্রটি লইয়া তিন যোজন পরিমাণ গভীর সারিতে তাঁহার চতুরঙ্গিণী[৩] সেনা এবং ভিক্ষুসংঘসহ দীর্ঘ সাত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া নানাবর্ণের পতাকায়, পুষ্পমালায়, মণিরত্নে সজ্জিত বোধিবৃক্ষের নিকটে পৌঁছিলেন। বোধিবৃক্ষের পুষ্প বিছানো চারিপাশে সেনা মোতায়েন করিয়া চাঁদোয়ায় বৃক্ষটিকে ঘিরিয়া বাদ্য ও সঙ্গীতে চারিদিক মুখরিত করিলেন। ॥ ২৯-৩১ ॥

অতঃপর রাজা অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘের, অমাত্যদের এবং নানা রাজ্যের হাজারের অধিক যুবরাজগণের উপস্থিতিতে করজোড়ে বোধিবৃক্ষের দিকে করুণ দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন। সেই সময় বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ দিকের বৃহৎ ডাল সংলগ্ন ক্ষুদ্র শাখাগুলি অদৃশ্য হইল। কেবল একটি শাখার চারিহস্ত লম্বা গোড়াটি রহিল। ॥ ৩২-৩৪ ॥

এই অলৌকিক দৃশ্যে রাজা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'আমি বোধিবৃক্ষকে রাজারূপে পূজা করি।' এই বলিয়া রাজা অশোক বোধিবৃক্ষকে রাজারূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ফুল ও নানা সামগ্রী দিয়া বোধিবৃক্ষকে পূজা করিয়া উহাকে বাম দিক দিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। বোধিবৃক্ষের চারিধারে আট স্থান হইতে রাজা করজোড়ে বৃক্ষকে বন্দনা করিলেন। ইহার পর রাজা অশোক সোনার পাতে মোড়া, রত্নখচিত একটি উচ্চ আসনে স্বর্ণপাত্রটি স্থাপন করিয়া উহা বৃক্ষশাখার নীচে, উহার কাছাকাছি, রাখিলেন। রাজা একটি উচ্চ চৌকিতে উঠিয়া একটি কাঠিতে লাল সেঁকো বিষ লাগাইয়া বৃক্ষের দক্ষিণ দিকের বড় ডালটির সহিত যুক্ত শাখার চারিহস্ত লম্বা গোড়াটির চারিদিকে সরলরেখার ন্যায় বৃত্তাকারে কাঠিটি বুলাইয়া এইরূপ ঘোষণা করিলেন, 'মহাবোধিবৃক্ষের শাখাটি যেমন সত্যই লংকাদ্বীপে যাইবে, সেইরূপ আমিও বুদ্ধের ধর্মে সত্যই অবিচলিত থাকিব। এই সংকল্পের কারণে বৃক্ষশাখার এই অংশটি অবশ্যই স্বেচ্ছায় স্খলিত হইয়া এই স্বর্ণপাত্রে আসিয়া অবস্থান করিবে।'
॥ ৩৫-৪১ ॥

রাজা এইরূপ বলিবামাত্র বৃক্ষশাখার সেই অংশটি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া স্বর্ণপাত্রে রাখা সুবাস মৃত্তিকায় অবস্থান করিল। যেই স্থানে সেঁকো বিষ লাগানো হইয়াছিল উহার তিন আঙুল

দূরের দশটি স্থান হইতে দশটি ঝুরি বৃক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় নামিয়া পড়িল।
॥ ৪২-৪৪ ॥

রাজা এই অলৌকিক দৃশ্যে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। উপস্থিত অমাত্যগণ এবং ভিক্ষুসংঘ আনন্দে সমস্বরে অভিনন্দিত করিলেন। চারিদিকে হাজারো অভিনন্দনের সোরগোল উঠিল। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

মহাবোধিবৃক্ষ শত শিকড় সমেত সুবাসিত মৃত্তিকায় দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া কত অসংখ্য মানুষকে ধর্মে দীক্ষা দিল। উহার সুন্দর পাঁচটি শাখায় ছিল হাজারো ঝুরি ও পাঁচটি সুন্দর ফল। বৃক্ষের কাণ্ডটির পরিধি ছিল দশ হাত। প্রতিটি শাখা ছিল চার হাত দীর্ঘ। এমনই ছিল আনন্দ বিহ্বল করা সেই পবিত্র মহাবোধিবৃক্ষটি। ॥ ৪৭-৪৯ ॥

যেই মুহূর্তে মহাবোধিবৃক্ষের শাখাটি স্বর্ণপাত্রে আসিয়া অবস্থান করিল, সেই সময় পৃথিবী প্রকম্পিত হইল এবং আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল। দেবলোকে দুন্দুভি বাজিল, দেবতা এবং ব্রহ্মাগণ সমস্বরে অভিনন্দন জানাইলেন। মেঘ গর্জনে উহা জ্ঞাত হইল। যক্ষগণের কোলাহল, পশু-পাখির চীৎকার এবং পৃথিবীর কম্পনের শব্দ ইত্যাদি সবই একই সঙ্গে হইল। বোধিবৃক্ষের ফল ও পত্র হইতে ছয় বর্ণের দ্যুতি বাহির হইয়া সারা বিশ্বকে ছয় বর্ণের আলোকে উজ্জ্বল করিল। বৃক্ষের শাখাসহ সেই স্বর্ণপাত্রটি মহাশূন্যে উঠিয়া তুষারময় প্রদেশে গিয়া সাত দিন অদৃশ্য রহিল। ॥ ৫০-৫৪ ॥

রাজা অশোক মহাবোধিবৃক্ষের নীচে সাতদিন অবস্থান করিয়া নানা কিছু দিয়া বৃক্ষকে পূজা করিলেন। সাতদিন পর প্রকৃতি আবার স্বাভাবিক হইলে, সেই স্বর্ণপাত্রটি, বোধিবৃক্ষের শাখাসহ, আবার সকলে দেখিতে পাইলেন। মহাবোধিবৃক্ষও স্বাভাবিক অবস্থায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিলেন। ॥ ৫৫-৫৮ ॥

রাজা তাঁহার সমস্ত রাজ্য বোধিবৃক্ষকে সমর্পণ করিয়া আরও সাতদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া নানা কিছু অর্ঘ্য দিয়া বৃক্ষকে পূজা করিলেন।
॥ ৫৯-৬০ ॥

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ উপসথ দিবসে রাজা অশোক স্বর্ণপাত্র সমেত বোধিবৃক্ষের শাখাটি গ্রহণ করিলেন। ইহার দুই সপ্তাহ পর আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশ উপসথ দিবসে মহারথি সজ্জিত সুশোভন রথে স্বর্ণপাত্রটি স্থাপন করিয়া সেই একই দিবসে উহা তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গেলেন। ॥ ৬১-৬২ ॥

অতঃপর রাজা অশোক তাঁহার রাজধানীতে একটি প্রকাণ্ড হলঘর

নির্মাণ করাইলেন। উহা সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইল। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিবসে রাজা সেই হলঘরের পূর্বদিকে অবস্থিত মনোরম বিশাল শালবৃক্ষের নীচে সেই স্বর্ণপাত্রটি (বোধিবৃক্ষের শাখাসহ) রাখিলেন। রাজা প্রতিদিন নানা অর্ঘ্য দিয়া উহার পূজা করিলেন। সপ্তদশ দিবসে স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত বোধিবৃক্ষের শাখাটির শিকড় উৎপন্ন হইল। আনন্দে রাজা সেই শাখাটিকে বন্দনা করিলেন। রাজা মহাউৎসবের আয়োজন করিলেন।

বহু নগরবাসী সেই উৎসব সমারোহে নানারূপ অর্ঘ্য দিয়া বোধিবৃক্ষের শাখাটিকে পূজা করিলেন। ॥ ৬৩-৬৭ ॥

সেই হইতে পুপ্পপুর নগরে মহাবোধিবৃক্ষের পূজা শুরু হইল। সেই উৎসবে মহাবোধিবৃক্ষকে, আলোকময় ছোট বড় বহু সংখ্যক পতাকায় এবং পুষ্পে সজ্জিত করিয়া, মহাধুমধামে পূজা করা হইত। ধর্মের টানে দেবতা এবং মানুষের মন উন্মুক্ত হইল, ঠিক যেমন সরোবরে সূর্যের টানে শতদল উন্মীলিত হয়। ॥ ৬৮ ॥

মহাবোধিবৃক্ষ গ্রহণ সমাপ্ত

এইখানে অষ্টদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'মহাবোধিবৃক্ষ গ্রহণ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. দশ শীলের কথা বলা হয়েছে।

২. হাত হলো আঠারো থেকে বাইশ ইঞ্চির মধ্যে।

৩. চতুরঙ্গিণী সেনা হলো—পদাতিক, অশ্বারোহি, রথারোহি এবং হস্তী।

১৯
বোধিবৃক্ষের আগমন

মহারথি[১] বোধিবৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আঠারো জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। নানা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের এই কাজে নিযুক্ত করা হইল। রাজ-পরিবার, অমাত্য-পরিবার, ব্রাহ্মণ-পরিবার, বণিক-পরিবার, রাখাল-পরিবার, তন্তুবায়-পরিবার, কুমার-পরিবার, হস্তশিল্পী-পরিবার, নাগ ও যক্ষ পরিবার, হায়না ও চড়ুই জাতির[২] পরিবার প্রভৃতি হইতে উক্ত পাহারাদারগণকে নিযুক্ত করা হইল। ॥ ১-৪ ॥

মহামান্য রাজা অশোক গঙ্গায় অবস্থিত জলযানে বোধিবৃক্ষকে আরোহিত করিলেন। উহার সহিত আটটি স্বর্ণপূর্ণ কলস ও আটটি রৌপ্যপূর্ণ কলসও রাজা প্রদান করিলেন। ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাও আটজন ভিক্ষুণীসহ সেই জলযানে গিয়া উঠিলেন। লংকাদ্বীপের রাজার প্রতিনিধি অরিট্ঠ প্রথমেই সেই জলযানে গিয়া উঠিয়াছিলেন। সকলে জলযানে উঠিলে, মহারাজ নগর হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া সাতদিনের মধ্যে তাম্রলিপ্তি[৩] বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥ ৫-৬ ॥

দেব-নাগ-মনুষ্য পূজিত বোধিবৃক্ষ জলযানে সাতদিনের মধ্যে উক্ত বন্দরে গিয়া পেঁৗছিলেন। মহারাজ সেইস্থানে পুনরায় বোধিবৃক্ষের পূজা করিলেন। জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া মহারাজ জলযানের নিকটে গিয়া বোধিবৃক্ষের দর্শন করিলেন। মহারাজ নির্দেশ করিলেন যে, বোধিবৃক্ষের জন্য নিযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে এই বৃক্ষের সহিত লংকায় যাইবে এবং সেই দ্বীপে উক্ত বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য পরিচর্যা করিবে। ॥ ৭-১১ ॥

জলযানে গিয়া উঠিবার সময় মহারাজ লংকাদ্বীপের রাজার প্রতিনিধি আরিট্ঠকে বলিয়াছিলেন, 'হে মিত্র! আমি এই পবিত্র বৃক্ষকে রাজোচিত সম্মানে তিনবার পূজা করিয়াছি। আমার মিত্র রাজাও যেন সেইরূপে এই বৃক্ষের পূজা করেন।' ॥ ১২-১৩ ॥

রাজা বন্দরের তীরে দাঁড়াইয়া করজোড়ে একদৃষ্টে জলযানে অবস্থিত বোধিবৃক্ষের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। রাজা অনড় হইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সেই জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া পবিত্র বোধিবৃক্ষসহ দিগন্তে বিলীন হইল। রাজার দুই চোখ দিয়া অশ্রুর ঢল নামিল। রাজা শোকে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন 'দশবল সম্বলিত পবিত্র বোধিবৃক্ষ দেশত্যাগী হইল। প্রভাত সূর্যের আলোর মধুর ইন্দ্রজাল দূরে বিলীন হইল।' ॥ ১৪-১৫ ॥

মহারাজ ধর্মাশোক মহাবোধিবৃক্ষের গমনে বেদনাহত চিত্তে অশ্রুমোচন করিতে করিতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ১৬ ॥

মহাবোধিবৃক্ষ বহন করিয়া জাহাজ একসময় সাগরে আসিয়া পৌঁছিল। জাহাজকে ঘিরিয়া এক যোজন অবধি সাগরের জল শান্ত রহিল। সেই জলে নানা বর্ণের পদ্ম চারিধারে ফুটিয়া উঠিল। নানা স্বর্গীয় মধুর সঙ্গীত আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইল। ॥ ১৭-১৮ ॥

স্বর্গের দেবগণ নানা উপহারে মহাবোধিবৃক্ষের পূজা করিল। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নাগগণ বৃক্ষটি হরণ করিতে মনস্থ করিলে ষড়ভিজ্ঞা ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা গরুড়ের বেশ ধারণ করিয়া নাগদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। নাগগণ ভিক্ষুণীর ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিকট বোধিবৃক্ষকে পূজা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। নাগগণ ভিক্ষুণীর অনুমতি লইয়া বোধিবৃক্ষকে নাগলোকে লইয়া গিয়া সাতদিন ধরিয়া রাজোচিত সম্মানে উহার পূজা করিয়া আবার উহা জলযানে ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। সপ্তম দিনে বোধিবৃক্ষ জম্বুকোল বন্দরে গিয়া পৌঁছিল। ॥ ১৯-২৩ ॥

দেবগণের প্রিয় রাজা তিষ্য, জগতের কল্যাণসাধনকারী ভিক্ষু সুমনের নিকট বোধিবৃক্ষের আগমন বার্তা শুনিয়া উৎকণ্ঠ চিত্তে অগ্রহায়ণের প্রথম দিন হইতে রাজপ্রাসাদের উত্তর দ্বার হইতে শুরু করিয়া জম্বুকোল বন্দর অবধি রাজপথটি নানাপ্রকারে সজ্জিত করিলেন। বোধিবৃক্ষের আগমন প্রতিক্ষায় রাজা সমুদ্র তীরে, বর্তমানে অবস্থিত, পর্ণশালার নিকটে রহিয়া গেলেন। ভিক্ষুণী সংঘমিত্তার অলৌকিক শক্তির কারণে রাজা বোধিবৃক্ষটি আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। ॥ ২৪-২৬ ॥

রাজা সমুদ্রতীরের যেই স্থানে বসিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিলেন, তথায় পরবর্তীকালে একটি হলঘর নির্মিত হইল। উহা 'সমুদ্র পর্ণশালা' নামে খ্যাত হইল। ॥ ২৭ ॥

রাজা সভাসদ ও অলৌকিক শক্তিধর ভিক্ষুগণসহ সেই দিনই জম্বুকোল বন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥ ২৮ ॥

দূর হইতে জলযানে বোধিবৃক্ষকে আসিতে দেখিয়া রাজা ও সভাসদগণ আনন্দে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজা গলা-অবধি জলে নামিয়া জাহাজের নিকটে গিয়া উচ্চ কুলসম্পন্ন ষোলজন ব্যক্তির সাহায্যে বোধিবৃক্ষ সম্বলিত স্বর্ণপাত্রটি তাঁহার মস্তক উপরে ধারণ করিলেন। সেই স্বর্ণপাত্রে অবস্থিত বোধিবৃক্ষটি তীরে লইয়া গিয়া রাজা পূর্বে নির্মিত সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে উহা রাখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম-বন্দনা করিলেন। রাজা বোধিবৃক্ষকে লঙ্কাদ্বীপের অধিপতিরূপে সম্মানিত করিলেন। ॥ ২৯-৩১ ॥

রাজা সেই ষোলজন কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের রাজ্যশাসনের দায়িত্ব দিয়া স্বয়ং দ্বারপালরূপে বোধিবৃক্ষের পাহারায় রহিলেন। তিনি তিনদিন ধরিয়া গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিলেন। ॥ ৩২ ॥

অতঃপর দশম দিনে রাজা স্বর্ণপাত্রসহ বোধিবৃক্ষটিকে সুসজ্জিত সুন্দর যানে স্থাপন করিয়া সেই বৃক্ষশ্রেষ্ঠের সহিত সহগমন করিয়া সেই স্থানে গিয়া পাত্রটি রাখিলেন যেই স্থানে পরবর্তীকালে 'পূর্ববিহার' নির্মিত হইয়াছিল। রাজা সেই স্থানে উপস্থিত সকলকে এবং ভিক্ষুসংঘকে দিনের আহার প্রদান করিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষু মহিন্দ রাজাকে দশবলধারী বুদ্ধ কিরূপে নাগগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন সেই কাহিনী[৪] ব্যক্ত করিলেন। ॥ ৩৩-৩৫ ॥

রাজা তিষ্য ভিক্ষু মহিন্দের মুখে উক্ত কাহিনী শুনিয়া বুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে যেই সকল স্থান বুদ্ধের চরণস্পর্শে ধন্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। যেই সকল স্থানে সকলের পূজার্থে রাজা স্বর্ণপাত্রসহ বোধিবৃক্ষটি রাখিয়াছিলেন, যেমন ব্রাহ্মণ তিবককের গ্রামের প্রবেশ দ্বারে এবং অন্যান্য স্থানে, সেই সকল স্থান রাজা পূর্ব হইতেই পুষ্প চন্দনে এবং নানারূপ বস্তুতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সেই সকল নানা স্থানে দ্বীপবাসীগণ দিবারাত্রি বোধিবৃক্ষের পূজা করিলেন। ॥ ৩৬-৩৮ ॥

অতঃপর চতুর্দশ দিবসে রাজা স্বর্ণপাত্রসহ বোধিবৃক্ষটিকে অনুরাধপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে লইয়া গেলেন। পরন্ত বিকালে রাজা অনুরাধপুর নগরের সুসজ্জিত উত্তর দ্বার দিয়া বোধিবৃক্ষকে নগরে প্রবেশ করাইলেন। নগরবাসীগণ চলার পথে বোধিবৃক্ষের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিল। রাজা বোধিবৃক্ষসহ নগরের রাজপথ দিয়া চলিয়া নগরবাসীগণকে পবিত্র বোধিবৃক্ষের দর্শন দিয়া নগরের সুসজ্জিত দক্ষিণ দ্বার দিয়া বোধিবৃক্ষকে উক্ত নগরের বাহিরে আনিয়া অতীতের চারিবুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত 'মহামেঘবনারামে' প্রবেশ করাইলেন। পূর্বে যেই স্থানে অতীতের বুদ্ধগণের স্মৃতি বিজড়িত বোধিবৃক্ষ ছিল, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভিক্ষু সুমন সেই মনোরম স্থানটি চিহ্নিত করিয়া সুসজ্জিত ও বৃক্ষ স্থাপনের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপিত স্বর্ণপাত্রসহ বোধিবৃক্ষটি ভিক্ষু সুমনের নির্দেশে সেই স্থানে লইয়া গেলে, ষোলজন রাজালংকারে ভূষিত কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ রাজার মস্তক হইতে স্বর্ণপাত্রসহ বোধিবৃক্ষটি নামাইতে রাজাকে সাহায্য করিতে গেলেন। ॥ ৩৯-৪৩ ॥

রাজা উক্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে স্বীয় মস্তক হইতে স্বর্ণপাত্রটি নামাইতে

নিজের মুষ্টি শিথিল করিলে বোধিবৃক্ষসহ সেই স্বর্ণপাত্রটি আশী হাত পরিমাণ শূন্যে উঠিয়া গেল। শূন্যে অবস্থান করিয়া উহা হইতে উজ্জ্বল ছয়টি বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই আলো সমগ্র লংকাদ্বীপ ব্যপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়া পৌঁছিল। সূর্যাস্তের কাল অবধি সেই অলোকরশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সেথায় উপস্থিত দশ হাজার ব্যক্তিগণ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত হইয়াছিলেন। ॥ ৪৪-৪৬ ॥

সূর্যাস্তের কালে বোধিবৃক্ষসহ স্বর্ণপাত্রটি শূন্য হইতে নির্দিষ্ট ভূমিতে নামিয়া রোহিণী নক্ষত্রের পূর্ণদৃষ্টিতে স্থির হইল। তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। বৃক্ষের শিকড় স্বর্ণপাত্র উপছাইয়া ভূমিতে প্রবেশ করিল। এইভাবে বোধিবৃক্ষ যখন স্বর্ণপাত্রসহ ভূমিতে স্বীয় নির্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন চতুর্দিক হইতে আগত নর-নারীগণ ফুল, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি দিয়া সেই মহাবোধিবৃক্ষের পূজা করিলেন। মহামেঘ আকাশে উৎপন্ন হইয়া বারি বর্ষণ করিল। হিম প্রদেশ হইতে আগত শীতল ঘন কুয়াশা মহাবোধিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। সাতদিন ধরিয়া সেই বৃক্ষ এইরূপে দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়াও জনগণের মধ্যে ধর্মের উদ্রেক করিল। সাতদিন পর কুয়াশা দূর হইলে মহাবোধি বৃক্ষ সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। উহার ছয় বর্ণের রশ্মিও চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। ॥ ৪৭-৫২ ॥

মহান ভিক্ষু মহিন্দ ও ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা ভিক্ষুসংঘসহ উক্ত স্থানে গেলেন। রাজাও পারিষদবর্গসহ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কাজরগ্রামের[৫] ও চন্দনগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণ তিবক্ক ও দ্বীপবাসীগণ মহাবোধির অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা শুনিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে মহা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হইল। সেই মহা সমাবেশে সকলকে বিস্মিত করিয়া অলৌকিক শক্তিতে মহাবোধিবৃক্ষের পূর্বদিকের শাখায় একটি ত্রুটিহীন ফল উৎপন্ন হইল। ॥ ৫৩-৫৬ ॥

উক্ত ফল বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পড়িলে, ভিক্ষু মহিন্দ উহা তুলিয়া লইয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। একটি স্বর্ণপাত্রে সুগন্ধি মিশ্রিত মাটি রাখিয়া রাজা সেই পাত্রটি মহা-আসনের (পরবর্তীকালের) স্থানে রাখিয়া বৃক্ষের ফলটি সেই স্বর্ণপাত্রের মধ্যে মাটিতে প্রোথিত করিলেন। সমবেত সকলের সামনে সেই ফল হইতে মুহূর্তে আটটি শিষ গজাইল। সেই শিষগুলি বোধিবৃক্ষের চারারূপে, চারি হস্ত উচ্চ হইল। ॥ ৫৭-৫৮ ॥

রাজা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই চারাগুলির অভিষেক

করিয়া উহাদের উপর সসম্মানে রাজছত্র ধরিলেন। ॥ ৫৯ ॥

বোধিবৃক্ষের সেই আটটি শিষের চারাগুলির একটিকে জম্বুকোল-এ লইয়া গিয়া যেই স্থানে মহাবোধি বৃক্ষ জলযান হইতে অবতরণের পর রাখা হইয়াছিল, সেই স্থানে রোপণ করা হইল। আর একটি চারা ব্রাহ্মণ তিবকের গ্রামে রোপণ করা হইল। একটি চারা থূপারাম-এ রোপণ করা হইল। একটি চারা ঈশ্বরশমণারাম-এ[৬] রোপণ করা হইল। একটি চারা প্রথম চৈত্যের প্রাঙ্গণে রোপণ করা হইল। একটি চারা চৈত্য পর্বতের আরামে রোপণ করা হইল। একটি চারা কাজরগ্রামে এবং আর একটি চারা চন্দন-গ্রামে রোপণ করা হইল। ॥ ৬০-৬২ ॥

পরে মহাবোধিবৃক্ষে আরও চারিটি ফল প্রকাশ পাইল। সেই চারিটি ফল হইতে মোট বত্রিশটি শিষ বাহির হইল। সেই শিষের চারাগুলি মহামেঘ বিহারের চারিদিকে চক্রাকারে এক একটি এক যোজন তফাতে রোপণ করা হইল। ॥ ৬৩ ॥

দ্বীপবাসী জনগণের মুক্তির উদ্দেশ্যে সম্যক সম্বুদ্ধের মহাবোধি বৃক্ষ এইরূপে লঙ্কাদ্বীপে রোপণ করা হইলে, রাজমহিষী অনুলা এবং তাঁহার সখীগণ ভিক্ষুণী সংঘমিত্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অচিরে অর্হত হইলেন। যুবরাজ অরিট্ঠও পাঁচশত পরিজনসহ মহান ভিক্ষু মহিন্দর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হত হইলেন। যেই বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্ঘের আটজন ব্যক্তি মহাবোধি বৃক্ষের সহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধিবৃক্ষের 'ধারক সঙ্ঘ' রূপে খ্যাত হইল। ॥ ৬৪-৬৭ ॥

ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা ভিক্ষুণীদের সহিত 'উপাসিকা বিহার' নামক ভিক্ষুণীগণের আবাসে অবস্থান করিলেন। তিনি পরে বারোটি সৌধ নির্মাণ করাইলেন। সেই সৌধগুলির তিনটির মধ্যে একটিতে সংরক্ষিত হইল বোধিবৃক্ষের জলযানের 'মাস্তুল'। আর একটি সৌধে রক্ষিত হইল সেই জলযানের 'হাল'। আর একটিতে রক্ষিত হইল সেই জলযানের 'হালের দাঁড়'। ইহাদের নামেই সেই তিনটি সৌধের নামকরণ হইল[৭]।

॥ ৬৮-৭০ ॥

পরবর্তীকালে যখন অন্য সম্প্রদায়ের[৮] উদ্ভব হইল, তখন এই বারোটি সৌধ 'হস্তী খুঁটি' বিহারের ভিক্ষুণীরাই ব্যবহার করিতেন। ॥ ৭১ ॥

চারিদিকে স্বেচ্ছায় বিচরণে অভ্যস্ত রাজার হস্তী নগরের একপ্রান্তে অবস্থিত কদম্বপুষ্পের ঝোপের কিনারের ছায়াশীতল স্থানে অবস্থান করিতে পছন্দ করিত। সেই স্থানে হস্তীর আহারও প্রদান করা হইত। যেহেতু এই স্থানটি ছিল রাজহস্তীর প্রিয়, সেই স্থানে হস্তীকে বাঁধিয়া রাখিতে একটি খুঁটিও স্থাপিত হইল। একদিন হস্তী উক্ত খুঁটিতে আবদ্ধ থাকিয়া উহাকে

প্রদত্ত জাব গ্রহণ করিল না। রাজা ভিক্ষুকে হস্তীর আহার গ্রহণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! রাজহস্তীর ইচ্ছা যে এই স্থানে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হউক।' ॥ ৭২-৭৫ ॥

ইহা শুনিয়া জনগণের মঙ্গলকামী রাজা সেই কদম্ব পুষ্পের ঝোপের কাছে পূতাস্থি সম্বলিত একটি স্তূপ ও আগার নির্মাণ করাইলেন।

॥ ৭৬ ॥

মহান ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা যেই বিহারে অবস্থান করিতেন উহাতে ছিল বহু ভিক্ষুণীগণের বাস। সেই জনাকীর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি কোন নির্জন স্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই জনাকীর্ণ স্থানে ভিক্ষুণীসঙ্ঘের সাকুলান না হওয়ায় আর একটি ভিক্ষুণী আবাসের তিনি চিন্তা করিলেন। ধর্মের উন্নতিকামী ও ভিক্ষুণীগণের মঙ্গলচিন্তাকারী মহান ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা উক্ত বিহার ত্যাগ করিয়া সেই দূরের নির্জন স্তূপ-আগারে-এ গিয়া অবস্থান করিলেন। সারাদিন ভিক্ষুণী সেই স্থানেই থাকিতেন ॥ ৭৭-৭৯ ॥

রাজা পূর্বের ভিক্ষুণী-আবাসে গিয়া জানিলেন যে মহান ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা উক্ত বিহার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ভিক্ষুণী সংঘমিত্তাকে অভিবাদন করিয়া ভিক্ষুণীর পূর্বের আবাস ত্যাগ করিবার কারণ জ্ঞাত হইলেন। অতঃপর দেবপ্রিয়, বিজ্ঞ রাজা তিষ্য, পরচিত্ত জ্ঞাত হইয়া উক্ত স্তূপ-আগারের সন্নিকটে একটি ভিক্ষুণী-আবাস[৯] নির্মাণ করাইলেন। যেহেতু সেই আবাসটি ছিল হস্তী খুঁটির নিকটে, তাই উহাকে 'হত্থিআড়হক' বিহার বলা হইত।

॥ ৮০-৮৩ ॥

সকলের প্রিয় মহাজ্ঞানী ভিক্ষুণী সংঘমিত্তা ইহার পর উক্ত নবনির্মিত ভিক্ষুণী আবাসেই অবস্থান করিতেন। ॥ ৮৪ ॥

লঙ্কাদ্বীপবাসীর মঙ্গলার্থে, ধর্মের উন্নতিকল্পে, তরুবর ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাবোধিবৃক্ষ মহামেঘ উদ্যানে[১০] স্থাপিত হইয়া উক্ত দ্বীপে বহুদিন স্থায়ী হইল। ॥ ৮৫ ॥

বোধিবৃক্ষের আগমন সমাপ্ত

এইখানে ঊনবিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'বোধিবৃক্ষের আগমন'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. সম্রাট অশোককে বোঝানো হয়েছে।
২. যাহাদের সামাজিক টোটেম ছিল হায়না বা চড়ুই পাখি।
৩. প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর (বর্তমানের তমলুক অঞ্চল)।
৪. এই কাহিনী গ্রন্থের প্রথম দিকে রয়েছে।
৫. বর্তমান শ্রীলঙ্কার রোহণ প্রদেশে, মেনিক-গঙ্গার তীরে ছিল এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম।
৬. শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুরের এক মাইল দক্ষিণে ছিল এই 'আরাম'।
৭। টীকাকার বলেছেন সেই তিনটি বিহারের নাম ছিল,—'চুলগণাগার' 'মহাগণাগার' ও 'সিরিবদ্দধাগার'।
৮. টীকাকার বলেছেন, অন্য সম্প্রদায় বলতে 'ধম্মরুচিক'দের কথাই বলা হয়েছে।
৯. এই নতুন ভিক্ষুণী আবাসে 'উপাসিকা বিহারের' কিছু ভিক্ষুণীরা অবস্থান করতেন। তাঁদের 'হস্তী-খুঁটি-ভিক্ষুণী' বলা হতো।
১০. শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুরের কাছে এই প্রাচীন উদ্যানে সেই মহাবোধি বৃক্ষটি এখনও আছে।

২০
মহান ভিক্ষুর নির্বাণ

রাজা ধর্মাশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে মহাবোধি বৃক্ষটি লংকাদ্বীপের 'মহামেঘবনারামে' রোপণ করা হয়। উহার দ্বাদশ বর্ষ পরে সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মে অনুরাগী রাজমহিষী 'অসন্ধিমিত্তা' মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর চতুর্থ বর্ষে জগৎপতি ধর্মাশোক বিশ্বাসঘাতিনী তিষ্যরক্ষাকে[১] তাঁহার মহারাণী রূপে উন্নিত করেন। ইহার তৃতীয় বর্ষে স্বীয় দৈহিকরূপে গর্বিতা এই নির্বোধ রাণী এইরূপ চিন্তা করিল 'রাজা আমার পরিবর্তে বোধিবৃক্ষকেই অধিক ভজনা করেন।' স্বীয় চিত্তে এইরূপ নিরতিশয় ঘৃণার উদ্রেক করিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াও এই রাণী মণ্ডু কণ্টক দ্বারা বোধিবৃক্ষের ক্ষতিসাধন[২] করিল। ইহার চতুর্থ বর্ষে মহা খ্যাতিমান ধর্মাশোক মৃত্যুর কবলে[৩] পতিত হইলেন। সপ্তত্রিংশ বৎসর এইরূপ ঘটনায় বিভক্ত হইল। ॥ ১-৬ ॥

এইদিকে দেবগণের প্রিয় রাজা তিষ্য ধর্মে প্রীত হইয়া চৈত্য পর্বতে মহাবিহার নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্ত করিয়া এবং থূপারাম নির্মাণ সমাপ্ত করিয়া লংকাদ্বীপে ধর্মস্থাপনে মহান ভিক্ষু মহিন্দকে বলিলেন, 'ভন্তে! স্তূপের কার্য সম্পূর্ণ প্রায়, কিন্তু উহাতে স্থাপন করিবার স্মারক চিহ্ন পাইব কোথায়? আমি আরও বহু বিহার নির্মাণের ইচ্ছা করি।'

॥ ৭-৯ ॥

ভিক্ষু মহিন্দ বলিলেন, 'মহারাজ! ভিক্ষু সুমন বহু স্মারক চিহ্ন আনিয়াছেন। সম্যকসম্বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি সেই সকল স্মারক বস্তুতে পরিপূর্ণ। সেই সকল চৈত্য পর্বতে রক্ষিত আছে। রাজহস্তীর পৃষ্ঠে করিয়া সেই সকল এই স্থলে আনয়ন করুন।' ॥ ১০-১১ ॥

অতঃপর রাজা ভিক্ষুর নির্দেশে সেই সকল পবিত্র স্মারক বস্তুগুলি চৈত্য পর্বত হইতে আনয়ন করিলেন। যথাসময়ে রাজা একযোজন দূরত্বে নানা বিহার নির্মাণ করিলেন এবং বিহারের স্তূপের মধ্যে স্মারক চিহ্নগুলি স্থাপন করিলেন। বুদ্ধের ব্যবহৃত ভিক্ষাপাত্রটি রাজা স্বীয় মনোরম প্রাসাদে স্থাপন করিয়া নানাবিধ সামগ্রীদ্বারা উহার পূজা করিলেন।

॥ ১২-১৩ ॥

পাঁচশত মান্যবর ব্যক্তিগণ ভিক্ষু মহিন্দের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যেই স্থানে অবস্থান করিতেন, রাজা সেই স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। উহা 'ঈশ্বরশমণক বিহার' নামে খ্যাত হইল। যেই স্থানে

পাঁচশত বৈশ্যগণ ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেন, সেই স্থানে রাজা একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। উহা 'বেশ্যাগিরি বিহার' নামে খ্যাত হইল। চৈত্য পর্বতের যে গুহায় একসময় ভিক্ষু মহিন্দ অবস্থান করিয়াছিলেন সেই গুহার সন্নিকটে যে বিহার নির্মিত হইল, উহা 'মহিন্দ গুহা' নামে খ্যাত হইল। ॥ ১৪-১৬ ॥

প্রথমে মহামেঘবনারামের 'মহাবিহার', পরে 'চৈত্য বিহার'; তৃতীয় মনোরম 'থূপারাম' (স্তূপটি প্রথমে নির্মিত); চতুর্থ মহাবোধি বৃক্ষ স্থাপন; পঞ্চম মনোরম শিলাস্তম্ভ স্থাপন যাহা মহাচৈত্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত স্তূপের নির্দেশ করে, যাহাতে বুদ্ধের পূতাস্থি (কণ্ঠার হাড়) স্থাপিত হইয়াছে; ষষ্ঠ ঈশ্বরশমণক বিহার; সপ্তম তিষ্য পুষ্করিণী; অষ্টম প্রথমথূপ; নবম বেশ্যাগিরি বিহার; তারপর ভিক্ষুণীদের অবস্থানের 'উপাসিকা বিহার' ও 'হত্থিআড়হক বিহার'; তারপর ভিক্ষুসংঘের দান (অন্ন) গ্রহণের 'মহাপালি' হল, যাহা প্রয়োজনীয় বাসন-কোসন, আসন, অন্ন রাখিবার ব্যবস্থা ইত্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত, যাহাতে প্রতি বৎসর প্রবারণা উৎসবের দিনে হাজার ভিক্ষুগণ একসাথে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন; তারপর নাগদ্বীপের বন্দরে জম্বুকোল বিহার, তিষ্যমহাবিহার ও পাচিনারাম বিহার—এই সকল নির্মাণ কার্য দেবতাগণের প্রিয়, লংকাধিপতি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, পুণ্যবান রাজা তিষ্য ধর্মের প্রতি অনুরাগে, প্রথম বর্ষেই সম্পন্ন করেন। বাকি সমস্ত জীবন তিনি বহু পুণ্য কর্ম করিয়াছেন। এই রাজার রাজত্বে লংকাদ্বীপের শ্রীবৃদ্ধি হইল। তিনি চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন[8]। ॥ ১৭-২৮ ॥

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তিয় রাজা হইলেন, কারণ রাজা তিষ্যের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনিও ধার্মিক রাজা ছিলেন। ॥ ২৯ ॥

মহান ভিক্ষু মহিন্দ যিনি শাস্তার মহাধর্ম শিক্ষা দিলেন; পবিত্র গ্রন্থসকল ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধের প্রদত্ত শীল, মার্গ ইত্যাদি প্রাঞ্জলভাবে সমগ্র লংকাদ্বীপে উজ্জ্বল জ্যোতির ন্যায় ছড়াইয়া দিলেন; যিনি শাস্তার আদর্শে বহু শিষ্যগণের শিক্ষক ছিলেন; যিনি দ্বীপবাসীগণকে তাঁহার আশীর্বাদে ধন্য করিলেন; তিনি রাজা উত্তিয়ের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে, স্বীয় ষাট বৎসর বয়সে চৈত্য পর্বতে বর্ষাবাসকালে, সকল ইন্দ্রিয় জয় করিয়া, আশ্বিনের শুক্লপক্ষের অষ্টম দিবসে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত[5] হইলেন। সেই দিবস তাঁহার নামে খ্যাত হইল। ॥ ৩০-৩৩ ॥

রাজা উত্তিয় এই সংবাদ পাইয়া দুঃখে শরাহত হইয়া শীঘ্র উক্ত স্থানে গিয়া পেঁাছিলেন। ভিক্ষুর মরদেহের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও কিছুক্ষণ

বিলাপ করিয়া রাজা সেই মরদেহে সুগন্ধি দ্রব্য ছিটাইয়া একটি ভাণ্ডারে উহা স্থাপন করিলেন। সেই ভাণ্ডারটি ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া ভাণ্ডারটি একটি সজ্জিত সুবর্ণ শকটে স্থাপন করাইলেন। ॥ ৩৪-৩৬ ॥

অতঃপর নানা স্থান হইতে আগত অসংখ্য শোকাহত জনগণ গুরুগম্ভীর সমারোহে শকটে স্থাপিত সেই মরদেহের সঙ্গে চলিলেন। রাজনির্দেশে সৈন্যগণও সঙ্গে চলিল। রাজার নির্দেশে রাজধানীর রাজপথ সকল সজ্জিত করা হইয়াছিল। ভিক্ষুর মরদেহে শোকার্ত জনগণ নানারূপ অর্ঘ্য প্রদান করিল। শোভাযাত্রা সহকারে সেই মরদেহ শকটে করিয়া রাজধানীর রাজপথ ধরিয়া চলিল। নানাস্থানে নগরবাসীগণ সেই মরদেহে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া পুষ্প অর্ঘ্য প্রদান করেন। এইরূপে ভিক্ষুর মরদেহ রাজপথ ধরিয়া একসময় মহামেঘবনারামের মহাবিহারে আসিয়া পেঁৗছিল। ॥ ৩৭-৩৯ ॥

উক্ত বিহারের পরিবেষ্টিত অঙ্গনে রাজা মরদেহবাহী শকটটি রাখিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষুর মরদেহ এক সপ্তাহ ছিল। রাজা মহাবিহারটি তোরণে, পুষ্পে, মাল্যে, সুগন্ধি পাত্রে ও নানারূপ দ্রব্যে সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। বিহারের চারিদিকে, তিন যোজন অবধি, রাজার নির্দেশে নানাভাবে সজ্জিত করা হইল। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ দেবগণের নির্দেশে নানারূপে সজ্জিত করা হইল। রাজার নির্দেশে সমুদ্রের ডুবুরিগণ সাতদিন ধরিয়া দানাদি দিয়া ভিক্ষুর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। ॥ ৪০-৪২ ॥

সাতদিন পর রাজা পূর্বদিকে, মহাস্তূপটিকে দক্ষিণে রাখিয়া, চন্দন কাষ্ঠের একটি চিতা রচনা করিলেন। শকটে করিয়া মরদেহটি সেই স্থানে আনিয়া রাজা মরদেহ রক্ষিত ভাণ্ডারটি সেই চিতায় স্থাপন করিয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। ॥ ৪৩-৪৪ ॥

ভিক্ষুর মরদেহের দাহ সমাপ্ত হইলে রাজা পূতাস্থি সকল একত্রিত করিয়া উহার অর্ধেক, চৈত্য পর্বতে একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া, উহার মধ্যে স্থাপন করিলেন। বাকি অর্ধেক নানা বিহারে সুরক্ষিত করিলেন। যেই স্থানে ভিক্ষুর মরদেহ দাহ করা হইল সেই স্থানে পরবর্তীকালে একটি চৈত্য নির্মাণ করা হইল। যে পরিবেষ্টিত অঙ্গনে ভিক্ষুর মরদেহ রাখা হইয়াছিল সেই স্থানটি ভিক্ষুর সম্মানার্থে 'ঈষিভূমঙ্গন' নামে খ্যাত হইল। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

পরবর্তীকালে কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার মরদেহ মহাবিহারের উক্ত প্রাঙ্গণে আনিয়া প্রথমে রাখা হইত। পরে চিতায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হইত। ॥ ৪৭ ॥

ইহার পর মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাজ্ঞানী, ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্তা সকল কর্ম

সম্পাদন করিয়া, জনগণকে তাঁহার আশীষে ধন্য করিয়া, উনষাট বৎসর বয়সে, রাজা উত্তিয়ের রাজত্বের নবম বর্ষে 'হত্থিআড়হক' বিহারে অবস্থানকালে সমাহিত চিত্তে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত[৬] হইলেন। তাঁহার মরদেহকেও সাতদিন ধরিয়া শ্রদ্ধা প্রদান করা হইল। রাজার নির্দেশে লংকাবাসীগণ ভিক্ষুণীকে পরম সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সারা লংকাদ্বীপ ভিক্ষুণীর সম্মানার্থে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ॥ ৪৮-৫১ ॥

সাতদিন পর ভিক্ষুণীর মরদেহ শকটে করিয়া নগরের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া থূপারামের পূর্বদিকে, পরবর্তী 'চিত্তশালা'র কাছে বোধিবৃক্ষের নিকটে, যে স্থান ভিক্ষুণী স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাজা ভিক্ষুণীর মরদেহ দাহ করাইলেন। সেই স্থানে রাজা উত্তিয় পরে একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। ॥ ৫২-৫৩ ॥

ভিক্ষু মহিন্দর সহিত যে পাঁচজন মহান ভিক্ষু লংকাদ্বীপে আসিয়াছিলেন, এবং যেই সকল ভিক্ষুগণের দলনেতা ছিলেন অরিট্‌ঠ সেইসকল ভিক্ষুগণ, এবং বহু শত অর্হত ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণী সংঘমিত্তার সঙ্গী বারোজন মহান ভিক্ষুণী, এবং বহুশত অর্হত ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের মহান ধর্ম প্রচার করিয়া, বিনয় ও অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থ সমগ্র লংকাদ্বীপে ব্যাখ্যা করিয়া কালক্রমে নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৫৪-৫৬ ॥

রাজা উত্তিয় কেবলমাত্র দশ বৎসর রাজত্ব করেন[৭]। নশ্বর এই জীবন! মৃত্যু সমস্ত বিশ্বকে ধ্বংস করে। ॥ ৫৭ ॥

মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া, উহার মহাশক্তি ও অবশ্যম্ভাবিতা জ্ঞাত হইয়াও জাগতিক বিষয়ে যদি অনিহা না জন্মায়, এবং সুখ-দুঃখে মানুষ নির্লিপ্ত না হয়, তবে উহাই তাহার মিথ্যা মোহের শৃঙ্খল স্বরূপ হয়। জ্ঞাত হইয়াও মানুষ এইরূপে প্রবঞ্চিত হয়। ॥ ৫৮ ॥

মহান ভিক্ষুর নির্বাণ সমাপ্ত

এইখানে বিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'মহান ভিক্ষুর নির্বাণ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. রাণী তিষ্যরক্ষার ডাক নাম ছিল 'চারুবাকি বা করুবাকি'। ইনি ছিলেন সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় রাণী। সম্রাটের স্তম্ভলিপিতে (এলাহাবাদে প্রাপ্ত) এই রাণীর উল্লেখ করা হয়েছে। সেই স্তম্ভলিপিতে

রাণী চারুবাকির দানের উল্লেখ আছে। সম্রাট সেই স্তম্ভলিপিতে বলেছেন—'আমার দ্বিতীয় রাণী যাহা কিছু দান করিয়াছেন, উহা কোন আম্রবাগান বা কোন উদ্যান হউক, অথবা কোন মহাপাকশালা হউক বা অন্য কোন কিছু হউক, সেই দাতা আমার দ্বিতীয় রাণী চারুবাকি, আমার পুত্র তিবর-এর মাতা, উহার নামে সরকারি খাতায় বিশেষভাবে লিপিবন্ধ রাখিতে হইবে।' ঐতিহাসিক প্রফেসর বাসাম বলেছেন, এই রাণীর আসল নাম হচ্ছে 'তিষ্যরক্ষা'। চারুবাকি বা কারুবাকি নামটি ছিল ওঁনার ডাক নাম। তিনি মহারাণী অসন্দিমিত্তার মৃত্যুর পর রাজমহিষীর পদে উন্নীত হলে সকলে তাঁহাকে 'তিষ্যরক্ষা' বলতেন।

২. কাঁটা দিয়ে বোধিবৃক্ষের কীরূপে ক্ষতি করা হলো সে বিষয়ে মহাবংশ কিন্তু নীরব। আর যে রাণী ধর্মের প্রতি অনুরাগে ভিক্ষুদের নানা কিছু দান করেছেন, তিনি হঠাৎ পবিত্র বৃক্ষের, যাহা বুদ্ধের ও ধর্মের প্রতীক, ক্ষতি করবেন কেন? ইতিহাস কিন্তু এই ঘটনা স্বীকার করে না। 'থূপবংশ' গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

৩. সম্রাট অশোকের মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ২৩২ অব্দে অর্থাৎ ৩৭ বছর রাজত্বের পর।

৪. রাজা তিষ্যের মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ২৩৭ অব্দে।

৫. ভিক্ষু মহিন্দের মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ১৯৯ অব্দে।

৬. ভিক্ষুণী সংঘমিত্তার মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে।

৭. রাজা উত্তিয়ের মৃত্যু হয় খ্রিঃ পূঃ ১৯৭ অব্দে।

২১
পাঁচজন রাজা

রাজা উত্তিয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'মহাশিব' দশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি সাধু ব্যক্তিগণের রক্ষাকারী ছিলেন। ভিক্ষু ভদ্দশাল-এর একান্ত ভক্তরূপে তিনি নগরের[১] পূর্ব ভাগে 'নগরঙ্গণ' নামক একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। ॥ ১-২ ॥

রাজা মহাশিব-এর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'সূরতিষ্য' দশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি পুণ্যকর্মের প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন। নগরের দক্ষিণভাগে তিনি একটি বিহার নির্মাণ করিলেন, যাহার নাম দিলেন 'নগরঙ্গণ বিহার।' নগরের পূর্ব ভাগে তিনি 'হতথিখন্ধ বিহার' ও 'পোনূণগিরি বিহার' নির্মাণ করিলেন। বঙ্গুত্তর পর্বতে তিনি 'পাচিনপব্বত বিহার' এবং কোলামুবহালক গ্রামের নিকটে 'রহেরক বিহার' নির্মাণ করিলেন। অরিট্‌ঠ পর্বতের পাদদেশে রাজা 'মকুলক বিহার', উহার পূর্ব দিকে 'অচ্ছগল্লক বিহার' নির্মাণ করিলেন। কণ্ডনগর গ্রামের উত্তর দিকে রাজা 'গিরিনেলবাহণক বিহার' নির্মাণ করিলেন।

এই সকল এবং আরও বহু মনোরম পাঁচশত বিহার লংকাদ্বীপের বহু স্থানে ও মহাওয়েলিগঙ্গা নদীর দূরবর্তী তীরে স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী রাজাগণের[২] ষাট বৎসরের রাজত্বকালে এবং রাজা সূরতিষ্যের রাজত্বে এই সকল পুণ্যকর্ম হইল। তাঁহারা সকলে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক ও ত্রিরত্নে অনুরক্ত। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এই রাজাকে 'সুবর্ণপিণ্ড তিষ্য' বলা হইত। রাজা হইবার পর তিনি হইলেন 'সূরতিষ্য'। ॥ ৩-৯ ॥

এক অশ্বনাবিকের[৩] দুই দমিল[৪] পুত্র সেন ও গুত্তক মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিয়া রাজা সূরতিষ্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। এই দুই ভ্রাতা ন্যায়পরায়ণতার সহিত বাইশ বৎসর[৫] রাজত্ব করেন। কিন্তু প্রয়াত রাজা মুতশিব-এর নবম পুত্র[৬] 'অসেল' উক্ত দুই দমিল ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দশ বৎসর অনুরাধপুরে রাজত্ব করেন। ॥ ১০-১২ ॥

পরে চোল রাজ্যের[৭] সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক দমিল—'ইলার' উক্ত রাজ্য হইতে লংকাদ্বীপে আসিয়া রাজা 'অসেল'-কে পরাস্ত করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। আইন সংক্রান্ত বিবাদে তিনি শত্রু-মিত্র সকলকে

সমদৃষ্টিতে বিচার করিতেন। এইভাবে তিনি চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।
॥ ১৩-১৪ ॥

রাজা ইলার-র শয়নকক্ষে শয্যার মাথার দিকে একটি ঘণ্টা লম্বা দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত। রাজাকে কোন বিষয়ে প্রয়োজন হইলে তাঁহার বিশ্রামের সময়ও ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহার উপস্থিতি কামনা করা যাইত। রাজার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। একদিন সেই রাজকুমার রথে চড়িয়া তিষ্য-পুষ্করিণীতে যাইতে গিয়া রাস্তায় শয়নরত একটি বাছুরের উপর দিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রথ চালাইয়া রথের চাকার প্রবল চাপে সেই বাছুরের মুণ্ডটি ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। বাছুরটি তাহার মাতার সহিত রাস্তায় শুইয়াছিল। ইহাতে গো-মাতার ক্রন্দনে কাতর হইয়া কোন ব্যক্তি[৮] সেই সংবাদটি ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা সেই সংবাদে এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্দেশে রাজকুমারের মস্তকও সেইভাবে সেই রথের চাকার চাপে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। ॥ ১৫-১৮ ॥

একটি তালগাছের উপরে উঠিয়া একটি সাপ পক্ষিশাবক গিলিয়াছিল। সেই শাবকের মাতার ক্রন্দনে কোন ব্যক্তি[৯] বিচলিত হইয়া সংবাদটি ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা সেই সংবাদ শুনিয়া সেই সাপটিকে ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিতে নির্দেশ দিলেন। সাপটিকে আনা হইলে রাজা সেই সাপটির পেট কাটিয়া পক্ষিশাবকটিকে বাহির করিয়া মৃত সাপটিকে গাছে ঝুলাইয়া দিলেন। ॥ ১৯-২০ ॥

রাজা ইলার দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিলেও তিনি ত্রিরত্নের অমূল্য গুণাবলি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। একদিন রাজা রথে চড়িয়া চৈত্য পর্বতে গিয়া ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ জানাইতে গিয়া রথের চাকা বুদ্ধের পূতাস্থি সম্বলিত স্তূপটির একটি অংশে আঘাত করে। ইহা দেখিয়া সঙ্গের অমাত্যগণ রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি স্তূপটিকে আঘাত করিয়াছেন।' ব্যাপারটি অনিচ্ছাকৃত হইলেও রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া পথের উপর স্বীয় দেহ বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনারা রথের আঘাতে আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন।' ইহা শুনিয়া অমাত্যগণ বলিলেন, 'মহারাজ! অন্যকে আঘাত করিবার চিন্তা কোন বিজ্ঞজনের মনে উদয় হইতে পারে না। আমাদের মহাপ্রভুর ইহাই বাণী। আপনি বরং ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আলোচনা করিয়া স্তূপটির সংস্কারের ব্যবস্থা করুন।'

উক্ত স্তূপের যে পনেরোটি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, রাজা পনেরো হাজার কাহাপন[১০] ব্যয় করিয়া উহার পরিবর্তে নতুন পনেরোটি প্রস্তর স্তূপে স্থাপন

করিলেন। ॥ ২১-২৬ ॥

এক বৃদ্ধা রৌদ্রে কিছু ধান শুকাইতে দিয়াছিলেন। অকালবৃষ্টিতে সেই ধান ভিজিয়া গেল। সেই বৃদ্ধা ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাকে এই সংবাদটি দিলে রাজা উপবাস পালন করিবার কথা চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, 'রাজা যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তবেই সেই রাজ্যে অকালে বৃষ্টিপাত হয় না।' অতএব আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' ॥ ২৭-২৯ ॥

নগররক্ষক দেবতা যিনি রাজার নিকট অর্ঘ্য লাভ করিতেন, রাজার উক্ত সংকল্প শুনিয়া উত্তপ্ত হইলেন। তিনি ছুটিয়া গিয়া চার মহারাজাদের[১] এই সংবাদটি জানাইলেন। সেই চারিজন মহারাজা নগররক্ষককে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রের নিকট গেলেন। ইন্দ্র ইহা শুনিয়া বৃষ্টির দেবতা পজ্জুন্নকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কেবল যথাসময়ে বৃষ্টিপাত করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহাতে নগররক্ষক দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া রাজাকে উহা ব্যক্ত করিলেন। ॥ ৩০-৩২ ॥

সেই দিন হইতে এই রাজার রাজ্যে অকালে এবং দিবসে আর বর্ষা নামিত না। প্রতি সপ্তাহে একবার কেবল রাত্রে বৃষ্টিপাত হইত। আর তাহাও হইত রাত্রির মধ্যযামে। সেই বৃষ্টিতে ক্ষুদ্র জলাশয়গুলিও ভরিয়া যাইত। ॥ ৩৩ ॥

কেবল অসৎ পথ হইতে মুক্ত ছিলেন বলিয়াই এই রাজা কুসংস্কার মুক্ত না হইলেও এইরূপ ঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তবে যে মানুষ বোধশক্তিসম্পন্ন, শুদ্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি কি আর অসৎ পথ হইতে মুক্ত থাকিবেন না ?

'পাঁচজন রাজা' সমাপ্ত

এইখানে একবিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'পাঁচজন রাজা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. অনুরাধপুরকে বোঝানো হয়েছে।
২. রাজা তিষ্য চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন (খ্রিঃ পূঃ ২৪৭-২০৭), তারপর রাজা উত্তিয় দশ বৎসর রাজত্ব করেন (খ্রিঃ পূঃ ২০৭-১৯৭), তারপর রাজা মহাশিব দশ বৎসর রাজত্ব করেন (খ্রিঃ পূঃ ১৯৭-১৮৭)। এই ষাট বছরে এই তিনজন বৌদ্ধ রাজারা প্রাচীন শ্রীলংকায় পাঁচশত বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. প্রাচীনকালে জাহাজে করে ঘোড়া এনে লংকাদ্বীপে বিক্রী করতেন যারা তাদের 'অস্সনাবিক' বলা হয়েছে।

৪. দমিল বলতে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত তৎকালীন দ্রাবিড়দের বলা হয়েছে।

৫. দ্বীপবংশ গ্রন্থে বলা হয়েছে এই দুই দমিল ভ্রাতারা বারো বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের মূলে বলা হয়েছে 'দুবে দ্বাবিশবস্সানি' অর্থাৎ উভয়ে বাইশ বছর রাজত্ব করেন।

৬. টীকাকার রাজা মুতশিব-এর বাকি আটজন পুত্রের নাম বলেছেন, অভয়, দেবানংপিয়তিষ্য, উত্তিয়, মহাশিব, মহানাগ, মুত্তাভয়, সুরতিষ্য ও কীড়।

৭. ভারতবর্ষের তাঞ্জোর অঞ্চলের রাজা। তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। চোল রাজারা যে প্রাচীন শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে 'চুলবংশ' গ্রন্থে। তাঞ্জোরে প্রাপ্ত রাজা রাজেন্দ্র চোলদেব-এর শিলালিপিতে চোল রাজা যে শ্রীলংকায় গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে। তবে সেটা হয়েছিল খ্রিস্টীয় ১০১৫ সালে (**South Indian Inscr ii—Hultzsch**)।

৮. মূল গ্রন্থে বলা হয়েছে গো-মাতা নিজে রাজার ঘণ্টাটি বাজালেন।

৯. মূলে বলা হয়েছে পক্ষিশাবকের মা রাজার ঘণ্টাটি বাজালেন।

১০. প্রাচীন টাকা।

১১. চার দিকপালদের বোঝানো হয়েছে।

২২

যুবরাজ গামণির আবির্ভাব

দুট্ঠগামণি রাজা ইলারকে হত্যা করিয়া রাজা হইলেন। কীরূপে ইহা হইল তাহা যথাসময়ে বলা হইবে। ইহার পূর্বের কাহিনী বলি ঃ

রাজা দেবানংপিয় তিষ্যের দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজ-প্রতিনিধি মহানাগ ছিলেন রাজার প্রিয়পাত্র। মূর্খ রাজমহিষী স্বীয় পুত্রকে রাজার উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে বসাইতে রাজ-প্রতিনিধি মহানাগকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিলেন। এই রাজপ্রতিনিধি যখন তরচ্ছ পুষ্করিণীর খননকার্য স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদারকী করিতেছিলেন সেই সময় রাজমহিষী তাহাকে এক ঝুড়ি আম পাঠাইলেন। সেই আমের গাদার উপরে ছিল একটি বিষ প্রবিষ্ট করা আম। মহারাণীর স্বীয় পুত্রও রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে গিয়েছিল। আমের ঝুড়ি আসিলে উহার আবরণ সরাইয়া সেই বালক না বুঝিয়া সেই বিষযুক্ত আমটি খাইলে তাহার সেই স্থলে মৃত্যু হয়। মহারাণীর দুরভিসন্ধি বুঝিয়া রাজপ্রতিনিধি মহানাগ তাহার স্ত্রীসকল, অনুচর, অশ্ব ইত্যাদি লইয়া প্রাণ বাঁচাইতে রোহণ-এ[১] চলিয়া গেলেন। ॥ ১-৬ ॥

মহানাগের এক অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী চলার পথে 'যট্ঠালয় বিহারে' একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। মহানাগ সেই পুত্রকে তাহার প্রিয় ভ্রাতার নাম দিলেন। পরে রোহণ-এ পৌঁছিয়া মহানাগ মহাগাম-এ অবস্থান করিয়া সমগ্র রোহণ-এর উপর রাজত্ব করিলেন। তিনি নিজের নামে নাগমহাবিহার স্থাপন করিলেন। তিনি আরও বহু বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন যেমন, 'উদ্ধখন্দরক বিহার' ইত্যাদি। ॥ ৭-৯ ॥

মহানাগের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র 'যট্ঠালয়ক-তিষ্য' সেই স্থানের রাজারূপে রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র 'গোঠা-অভয়' ও সেই স্থানের রাজারূপে রাজত্ব করিলেন। ॥ ১০ ॥

গোঠাঅভয়ের পুত্র কাকবন্ন-তিষ্য পিতার মৃত্যুর পর উক্ত স্থানে রাজত্ব করিলেন। এই সদ্ধর্মে বিশ্বস্ত রাজার রাণী ছিলেন কল্যাণী[২] রাজ্যের ধর্মপ্রাণ রাজকন্যা 'বিহারদেবী'। ॥ ১১-১২ ॥

কল্যাণী রাজ্যের রাজা ছিলেন তিষ্য। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অয্য-উত্তিক গোপনে রাণীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলে রাজা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হন্। সেই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি উক্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্য কোথায় চলিয়া যান্। পরে সেই প্রদেশ তাঁহার নামেই খ্যাত হয়। ॥ ১৩-১৪ ॥

একদিন উত্তিক ভিক্ষুর ছদ্মবেশী এক ব্যক্তিকে রাণীকে একটি চিঠি

গোপনে প্রদান করিতে কল্যাণী রাজ্যে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি ভিক্ষুরূপে এক অর্হত ভিক্ষুর পিছু পিছু কল্যাণীর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। উক্ত অর্হত ভিক্ষু প্রতিদিনই রাজার প্রাসাদে গিয়া ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন। ছদ্মবেশী ভিক্ষু ইহা অবগত ছিলেন না। সেইদিন এই ছদ্মবেশী ভিক্ষু অর্হত ভিক্ষুর পাশে উপবেশন করিয়া আহার গ্রহণ করিলেন। তাহাদের আহারের পর রাজা ও রাণী উভয়ে যাইতে উদ্যত হইলে সেই ছদ্মবেশী ভিক্ষু গোপন চিঠিটি রাণীর দৃষ্টিগোচরে আনিতে রাণীর সামনে ভূমিতে ফেলিয়া দিল। কিছুর একটা শব্দে রাজা ঘুরিয়া দাঁড়াইতে রাণীর উদ্দেশ্যে লেখা গোপন চিঠিটি রাজা ভিক্ষুগণের সামনে ভূমিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। ইহাতে রাজা ভিক্ষুগণের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা ক্রোধবশে হুকুম করিলেন যে উভয়কে হত্যা করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হউক। রাজার অনুচরগণ তাহাই করিলেন। মহাসমুদ্রের দেবতাগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া কল্যাণী রাজ্য ভাসাইয়া দিলেন। রাজা সত্বর তাঁহার প্রিয় কন্যার জীবন রক্ষা করিতে দেবী নামের সেই ধার্মিক, সুন্দরী কন্যাকে একটি স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া এবং তাহার পরিচয়াদি একটি কাগজে লিখিয়া সেই পাত্রে দিয়া সেই উন্মত্ত সাগরের জলে পাত্রটি ভাসাইয়া দিলেন। সেই পাত্র জলে ভাসিতে ভাসিতে লংকাবিহারের নিকটে আসিয়া ঠেকিল। রাজকন্যা দেবী এই বিহারে আশ্রয় পাইলেন। পরে সেই রাজ্যের রাজা কাকবন্ন-তিষ্য দেবীকে তাঁহার রাজমহিষী রূপে অভিষিক্ত করিলেন। কল্যাণীর রাজকন্যা 'দেবী' লংকাবিহারে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল 'বিহার দেবী'।

এইরূপে 'বিহার' বিশেষণটি তাঁহার নামের সহিত যুক্ত হইল।

॥ ১৫-২২ ॥

রাজা কাকবন্ন 'তিষ্য বিহার', 'চিত্তল পব্বত বিহার', 'গমিট্ঠবালি বিহার' ও 'কুটালি বিহার' ইত্যাদিস্থাপন করিলেন। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া তিনি ভিক্ষুসংঘকে প্রতিনিয়ত তাঁহাদের প্রয়োজনীয় চারি বস্তু-সকল[৩] প্রদান করিতেন। ॥ ২৩-২৪ ॥

সেই সময় 'কোটপব্বত বিহারে' এক শ্রদ্ধাশীল, পুণ্যকর্মে সর্বদা নিযুক্ত শ্রমণ অবস্থান করিতেন। আকাশ চৈত্যের প্রাঙ্গণে সহজে আরোহণ করিতে তিনি তিন খণ্ড প্রস্তরফলক পরপর স্থাপন করেন। তিনি ভিক্ষুদের পানীয় প্রদান করেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করেন। কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই শ্রমণ যখন দুর্বল হইয়া পড়ে তখন ভিক্ষুগণও তাহাকে তিষ্য-রামের শিলপস্সয় পরিবেণে রাখিয়া পরিচর্যা করেন। ॥ ২৫-২৮ ॥

বিহার দেবী প্রতিনিয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে সুরম্য রাজপ্রাসাদে

ভিক্ষুসংঘকে অন্নপানাদি দান করিতেন। পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তিনি সুগন্ধ দ্রব্য, ফুল, ঔষধ, চীবর প্রভৃতি লইয়া বিহারে গিয়া ভিক্ষুগণকে তাঁহাদের মর্যাদা অনুসারে দান করিতেন। ॥ ২৯-৩০ ॥

সেইদিন তিনি এইরূপ দানাদি করিয়া প্রধান ভিক্ষুর নিকট গিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিলে, ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন, 'হে দেবী! এই সকল করিয়া তুমি পুণ্যের ফলে মহাসুখ প্রাপ্ত হইবে। পুণ্য কর্ম করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করিও না।' ইহা শুনিয়া রাণী হতাশ হইয়া বলিলেন, ভন্তে! আমাদের সুখ কোথায়? আমরা সুখ শূন্য, আমাদের কোন সন্তান নাই।' ॥ ৩১-৩৩ ॥

ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষু দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন যে যদি কেহ রাণীর গর্ভে জন্মিবার বাসনা করে, তবে অবশ্যই রাণীর সন্তানাদি হইবে। তিনি রাণীকে ইহা বলিয়া বলিলেন, 'হে দেবী! অসুস্থ শ্রমণের নিকটে তুমি গিয়া বল।' রাণী সেই মত অসুস্থ মৃতপ্রায় শ্রমণের নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে শ্রমণ! তুমি যদি আমার পুত্র হইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা আমাদের মহা সুখের কারণ হইবে।' রাণী বুঝিলেন যে শ্রমণ সম্মত নয়। তখন রাণী বহু ফুলের অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং আবার শ্রমণকে উক্ত অনুরোধ করিলেন। ॥ ৩৪-৩৬ ॥

ইহাতেও শ্রমণ অনড় দেখিয়া রাণী ভিক্ষুসংঘকে শ্রমণের জন্য নানা প্রকার ঔষধ, চীবর ইত্যাদি প্রদান করিলেন এবং আবার শ্রমণকে উক্ত অনুরোধ করিলেন। অতঃপর সেই শ্রমণ রাজপরিবারে পুনরায় জন্মের জন্য বাসনা করিলেন। রাণী শ্রমণের অবস্থানের স্থান সুন্দরভাবে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অতঃপর সেই শ্রমণের মৃত্যু হইল এবং পুনরায় জন্মের জন্য রাণীর গর্ভে প্রবেশ করিল। রাণী তখনও প্রাসাদে পৌঁছায় নাই এবং পথের মধ্যে তিনি ইহা অনুভব করিলেন। প্রাসাদে পৌঁছিয়া রাণী সেই সংবাদ রাজাকে প্রদান করিলেন। উভয়ে বিহারে ফিরিয়া গিয়া শ্রমণের মরদেহের সৎকার করিয়া তাহার পুণ্য স্মৃতিতে ভিক্ষুসংঘকে নানা প্রকার দান সামগ্রী প্রদান করিলেন। ॥ ৩৯-৪১ ॥

পুণ্যবান রাণীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এইরূপ বাসনার উদয় হইল। সেই বাসনাগুলি হইল ঃ রাণীর শিয়রে একটি সাত হস্ত দীর্ঘ মৌভাণ্ড রাজা আনিয়া রাখিবেন যাহার মধু বারো হাজার ভিক্ষুগণকে প্রদান করিয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে। উহা তিনি সুন্দর শয্যার বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া শিয়রে অবস্থিত মধুভাণ্ড হইতে পান করিবেন ; যেই তরবারি দ্বারা রাজা ইলারর প্রধান যোদ্ধার মুণ্ডচ্ছেদ করা হইবে, সেই মুণ্ডুর উপর দাঁড়াইয়া

সেই তরবারি ধৌত করা জলপান করিবেন; অনুরাধপুরের পদ্মাকর হইতে আহরণ করা ফুটন্ত সতেজ পদ্মের মালায় নিজেকে সুশোভিত করিবেন। ॥ ৪২-৪৬ ॥

রাণী তাঁহার এই সকল মনোবাঞ্ছা রাজাকে জ্ঞাত করিলেন। রাজা গণৎকারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গণৎকার বলিলেন, 'মহারাজ! রাণীর যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে দমিলদের পরাস্ত করিয়া সর্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্মকে উজ্জ্বলতর করিবে।' ॥ ৪৭ ॥

রাজা সারা রাজ্যে ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ রাণীর বাসনা করা সাত হস্ত দৈর্ঘ্য মৌচাকের সন্ধান দিবেন তাঁহাকে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। এক গ্রামবাসী খবর দিলেন যে সমুদ্রের তীরে একটি উপুড় করা নৌকায় সেইরূপ দৈর্ঘ্য মৌচাক রহিয়াছে। সেই ব্যক্তি রাজাকে উহা দেখাইলেন। রাজা ইহা দেখিয়া রাণীকে সেই স্থানে লইয়া আসিলেন এবং একটি তাঁবু স্থাপন করিয়া রাণীকে রাখিয়া সেই মৌচাক হইতে মধু আনিয়া রাণীকে ইচ্ছামত সেই মধু পান করিতে দিলেন।

॥ ৪৮-৫০ ॥

রাণীর অন্য সকল বাসনাও চরিতার্থ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া রাজা তাঁহার যোদ্ধা ভেলুসুমনকে সেই কর্মভার প্রদান করিলেন। রাজা কাকবন্নের সেই যোদ্ধা অনুরাধপুরে গিয়া ইলার রাজার অশ্বশালার রক্ষকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। তিনি সেই রক্ষকের নির্দেশে তাহার কাজকর্ম করিতেন। সেই রক্ষক বুঝিলেন যে এই ব্যক্তি খুবই বিশ্বস্ত। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একদিন অনুরাধপুরের পদ্মাকর হইতে ফুটন্ত পদ্ম সংগ্রহ করিয়া সেই ফুল ও স্বীয় তরবারিটি প্রত্যুষে কদম্ব নদীর তীরে রাখিয়া নদীতে অবগাহনের জন্য নামিলে, সেই ব্যক্তি রাজার অশ্বশালার একটি অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া নদী তীর হইতে সেই তরবারি ও পদ্মগুলি লইয়া নগরের দ্বার রক্ষককে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া নগরের বাহিরে ছুটিয়া গেলেন। ॥ ৫১-৫৪ ॥

অনুরাধপুরের ইলার রাজা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার প্রধান যোদ্ধাকে পাঠাইলেন সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিতে। এই যোদ্ধা রাজার দ্বিতীয় প্রিয় দ্রুততর অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেলেন। কাকবন্ন রাজার যোদ্ধা ভেলুসুমন অশ্ব পৃষ্ঠে বসিয়া জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। রাজার প্রধান যোদ্ধা দ্রুততর অশ্ব চালাইয়া তীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া এই যোদ্ধা পাতালতা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে থাকিয়া শুধু মাত্র হস্তে ধৃত তরবারি প্রসারিত করিলেন। দ্রুতবেগে আসা প্রধান যোদ্ধা সেই তরবারি না দেখিয়া সেই পথে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিয়া আসিলে তরবারির

আঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইল। কাকবন্ন তিষ্য রাজার যোদ্ধা সেই মুণ্ডু ও অশ্ব দুইটি সহ সন্ধ্যায় মহাগামে আসিয়া পেঁীছিলেন।

রাণীর বাসনাপূর্ণ হইলে রাজা তাহার যোদ্ধাকে সৈনিকের উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করিলেন। ॥ ৫৫-৫৮ ॥

যথা সময়ে রাণীর শুভ লক্ষণযুক্ত একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। রাজপ্রাসাদে আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। সেই সন্তানের পুণ্যের ফলে সেই দিনই নানা মণিমাণিক্যপূর্ণ সাতটি জাহাজ নানা স্থান হইতে রাজ্যের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল। নব জাতকের পুণ্যের কারণে হিমালয়ের ছদ্‌দন্ত হ্রদের অঞ্চল হইতে বিশাল ছাদের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর একটি হস্তী আসিয়া তাহার শাবককে এই অঞ্চলে রাখিয়া গেল। কণ্‌দুল নামক এক ধীবর সমুদ্রের তীরস্থ জঙ্গলের একটি পুষ্করিণীর অপর পারে এই হস্তী শাবককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজাকে সেই সংবাদটি প্রদান করিল। রাজা ইহা শুনিয়া সত্বর রাজার হস্তী পালককে পাঠাইয়া হস্তী শাবকটিকে রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন এবং তাহার দেখাশোনার ব্যবস্থা করিলেন। কণ্‌দুল ধীবরের নামে সেই হস্তী শাবকের নাম রাখা হইল কণ্‌দুল।

॥ ৫৯-৬৩ ॥

রাজা শুনিলেন যে ধনরত্নে পূর্ণ বহু স্বর্ণপাত্র এবং বহু মূল্যবান সামগ্রীতে ঠাসা একটি জাহাজ বন্দরে আসিয়া পেঁীছিয়াছে। রাজা সেই জাহাজের বহু মূল্যবান সামগ্রীসকল তাহার নিকট আনিতে নির্দেশ দিলেন। ॥ ৬৪ ॥

পুত্রের নামকরণ দিবসে রাজা বারো হাজার ভিক্ষুগণকে আহারের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আমার এই পুত্র সমগ্র লংকাদ্বীপের রাজা হইয়া সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্ম উজ্জ্বল করিবে বলা হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে নিমন্ত্রিত বারো হাজার ভিক্ষুগণের মধ্যে অদ্য কেবল এক হাজার আট জন ভিক্ষুই আসিবেন। তাঁহাদের পরিহিত চীবরে তাঁহাদের হস্তে ধৃত ভিক্ষাপাত্র আড়াল হইবে না। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবার কালে চৌকাঠে তাঁহাদের ডান পা প্রথমে পড়িবে। তাঁহাদের ছাতা ও জল ছাকনি তাঁহারা এক পার্শ্বে রাখিবেন। ভিক্ষুগণের মধ্যে ভিক্ষু 'গোতম' আমার পুত্রকে পঞ্চশীল ও আশীষ প্রদান করিবেন।

রাজা যাহা ভাবিয়াছিলেন সকল কিছু সেই রকমই হইয়াছিল।

॥ ৬৫-৬৯ ॥

রাজা উক্ত শুভ নিদর্শনগুলি দেখিয়া আনন্দ-চিত্তে ভিক্ষুগণকে পায়সান্ন প্রদান করিলেন। মহাগাম রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা স্বরূপ

'গামণি' এবং তাঁহার পিতার নাম 'অভয়', এই দুইটি নাম একত্রিত করিয়া রাজা তাঁহার এই পুত্রের নাম রাখিলেন 'গামণি অভয়'। ॥ ৭০-৭১ ॥

এই পুত্রের নামকরণের নবম দিবসে রাজা মহাগামে অবস্থিত রাণীর সহিত উপগত হইলেন। ইহাতে রাণী সন্তানসম্ভবা হইলেন এবং যথা সময়ে রাণী আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা সেই পুত্রের নাম রাখিলেন তিষ্য। বহু পরিচারকে পরিবৃত হইয়া দুই রাজকুমার বড় হইতে লাগিলেন। ॥ ৭২-৭৩ ॥

উভয় রাজকুমারের অন্নপ্রাশনের সময় রাজা পাঁচশত ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভক্তিভরে পায়সান্ন প্রদান করিলেন। ভিক্ষুগণ সেই পায়সান্নের অর্ধেক আহার করিলে রাজা ও রাণী উভয়ে সোনার চামচে ভিক্ষুগণের পাত্র হইতে দুই চামচ পায়সান্ন তুলিয়া লইয়া উহা কুমারগণের মুখে দিয়া রাজা বলিলেন 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যদি সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্ম পরিত্যাগ কর তবে এই খাদ্য তোমাদের হজম হইবে না।' কুমারদ্বয় ইহা শুনিয়া সেই পায়সান্ন অমৃতের ন্যায় পান করিল। ॥ ৭৪-৭৭ ॥

কুমারদ্বয়ের বয়স যখন যথাক্রমে বারো ও দশ বৎসর, তখন রাজা একদিন রাজপ্রাসাদে ভিক্ষুগণকে অন্নদান করিবার পর তাঁহারা আহার করিয়া প্রস্থান করিলে, রাজা বাকি অন্ন একটি পাত্রে লইয়া উহা তিন ভাগ করিয়া পুত্রদের সামনে রাখিয়া বলিলেন 'হে পুত্রগণ! এই তিন ভাগের দুই ভাগ তোমাদের, আর বাকি ভাগটি ভিক্ষুগণের। এইরূপে তোমরা আমাদের সংসারের অভিভাবক ভিক্ষুগণের কথা কখনও ভুলিবে না। তাহাদের ভাগটি রাখিয়া তবে বাকি ভাগ দুইটি আহার করিবে।' রাজা আরও বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! এই ভাবে পৃথক ভাগ করিলে তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি কোনদিন শত্রুভাবাপন্নও হইবে না। যে যার অংশ কেবল গ্রহণ করিবে। নিজের অংশটি অমৃত ভাবিয়া কেবল সেই অংশটি গ্রহণ করিবে।' ॥ ৭৮-৮২ ॥

কিন্তু রাজা যখন পুত্রদের বলিলেন, 'হে পুত্রগণ! আমরা দমিলদের সহিত সংগ্রাম করিব না', রাজা এই কথা বলিলে যুবরাজ তিষ্য তাহার সামনের ভাতের থালাটি হাত দিয়া সরাইয়া দিলেন। আর যুবরাজ গামণি আসন ত্যাগ পূর্বক উঠিয়া স্বীয় বিছানায় হাত পা গুটাইয়া শুইয়া পড়িলেন। ॥ ৮৩-৮৪ ॥

রাণী আসিয়া পুত্র গামণিকে স্বস্নেহে আদর করিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র! তুমি এইভাবে হাত-পা গুটাইয়া শুইয়াছ কেন? হাত-পা লম্বা করিয়া বিছানায় শুইতেছ না কেন?'

পুত্র গামণি মাতাকে বলিল, 'মা! পায়ের দিকে, গঙ্গার ওপার,

দমিলরা অধিকার করিয়াছে। আর এই দিকে সমুদ্র রহিয়াছে। হাত-পা ছড়াইব কি করিয়া?' রাজা পুত্রের এই ভাবনার কথা শুনিয়া মৌন রহিলেন। ॥ ৮৫-৮৬ ॥

যুবরাজ গামণির বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তাহার মেধা, শক্তি, বীর্য, খ্যাতি ও রাজকীয়তা বর্ধিত হইল। ॥ ৮৭ ॥

এই পরিবর্তনশীল জগতে জীবসকল পুণ্যকর্মের ফলেই এইরূপ প্রার্থনীয় পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। ইহা চিন্তা করিয়া জ্ঞানীগণ পুণ্যকর্ম বর্ধিত করিতে উৎসাহিত হইবেন। ॥ ৮৮ ॥

যুবরাজ গামণির আবির্ভাব সমাপ্ত

এইখানে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'যুবরাজ গামণির আবির্ভাব'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. শ্রীলংকার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল।
২. শ্রীলংকার কলম্বোর নিকট অঞ্চল।
৩. 'চতুপচ্চয়া' হলো ভিক্ষুর চীবর, ভিক্ষান্ন, আবাসস্থল ও ঔষধ।

২৩

যোদ্ধাদের নিকট শুল্ক আদায়

রাজার কণ্দুল হস্তী শক্তিতে, সাহসে, রূপে, দ্রুততায় ও আকারে সর্বোচ্চ ছিল। তাহার দেহ ছিল প্রকাণ্ড। আর রাজার ছিল দশজন পরাক্রমশালী পরমবীর যোদ্ধা যথা, নন্দিমিত্ত, সুরনিমিল, মহাসোণ, গোটউম্বর, থেরপুত্তাভয়, ভরণ, ভেলুসুমন, খঞ্জদেব, ফুস্সদেব ও লভিয়বসভ। ॥ ১-৩ ॥

রাজা এলারর সেনাপতি ছিলেন মিত্ত। তাঁহার রাজ্যের পূর্বপ্রদেশের 'চিত্তপর্বতের' নিকটে একটি গ্রামে সেনাপতি মিত্তের এক ভাগিনেয় বাস করিত যাহাকে তাঁহার মামার নামে অভিহিত করা হইত। সেই ভাগিনেয়র গোপন অস্ত্র ছিল তাঁহার স্বীয় দেহই। শৈশবে এই বালক হামাগুড়ি দিয়া বহুদূরে চলিয়া যাইত। সেই কারণে তাহাকে রশির সাহায্যে জাঁতার একটি ভারী প্রস্তরের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইত। সেই বালক হামাগুড়ি দিয়া সেই ভারী প্রস্তরটিও টানিয়া দরজার চৌকাঠের উপর দিয়া লইয়া যাইতে গিয়া উহার সংলগ্ন রশিটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেই কারণে তাঁহার নাম হইল নন্ধিমিত্ত। তাঁহার শরীরে দশটি হস্তীর[১] বল ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নন্ধিমিত্ত গ্রাম ছাড়িয়া শহরে গিয়া তাহার মাতুলের কাজকর্ম করিত। ॥ ৪-৮ ॥

সেই সময় দমিলগণ[২] ধর্মীয় স্তূপসকল ও অন্যান্য ধর্মস্থানগুলি ভাঙচুর ও অপবিত্র করিত। এই মহাবলী সেই সকল দুষ্কৃতকারীদের জীবন্ত দেহ ছিঁড়িয়া ফেলিত। তাহার পা দিয়া দুষ্কৃতকারীর একটি পা চাপিয়া ধরিয়া হাত দিয়া অন্য পা টানিয়া ধরিয়া জীবন্ত দেহটি দুইভাগ করিয়া ছিঁড়িয়া নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া টুকরা দুইটি নগরের বাহিরে নিক্ষেপ করিত। দেবতাগণ সেই মৃতদেহগুলিকে অদৃশ্য করিয়া দিতেন।

॥ ৯-১০ ॥

এইরূপে নগরে দমিলগণের সংখ্যা কমিতে লাগিল। বিষয়টি একসময় রাজার কানে গিয়া পেঁছিল। রাজা হুকুম দিলেন, 'শয়তানকে হাতেনাতে ধরিতে হইবে।' কিন্তু ইহা মোটেও সম্ভব হইল না, কারণ এই দুষ্কৃতিকারী কে? তাহাই কেহ জানিতে পারিল না। ॥ ১১-১২ ॥

অতঃপর নন্ধিমিত্ত ভাবিল 'এইরূপে মানুষ ধ্বংস করিলে ধর্মের অখ্যাতিই হইবে। রোহণে ত্রিরত্নে বিশ্বস্ত যুবরাজ রহিয়াছেন। আমি বরং তাঁহার সেবা করিয়া দমিলদের জয় করিয়া যুবরাজকে সারা দ্বীপের

প্রভু করিয়া সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্মকে এই দ্বীপে উজ্জ্বল করিব।'

॥ ১৩-১৪ ॥

সেই মহাবলী যুবরাজ গামণির নিকট গিয়া তাঁহার মনস্কাম জানাইল। যুবরাজ বিষয়টি লইয়া তাঁহার মাতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই মহাবলীকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। এই মহাবলী যোদ্ধা নন্দিমিত্ত সম্মানের সহিত যুবরাজের নিকট অবস্থান করিতে লাগিল। ॥ ১৫ ॥

রাজা কাকবন্ন-তিষ্য দমিলদের অগ্রগতি রোধ করিতে মহাগঙ্গা নদীর নাব্য স্থানগুলিতে সর্বক্ষণ রক্ষী মোতায়েন করিবার নির্দেশ দিলেন। রাজার অপর এক রাণীর গর্ভে জাত পুত্র দীঘাভয়কে রাজা কচ্ছকতিত্থ নামক স্থানের দায়িত্বে রাখিলেন। রক্ষীর ব্যবস্থা করিতে সেই যুবরাজ রাজ্যের প্রতি দুই যোজনের মধ্যে অবস্থিত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি পুত্রকে উক্ত কাজের জন্য পাঠাইতে বলিলেন। ॥ ১৬-১৮ ॥

কোট্‌ঠিভাল প্রদেশের খণ্ডকভিট্‌ঠিক গ্রামের 'সঙ্ঘ' নামক প্রধানের সাতটি পুত্র সন্তান ছিল। সপ্তম পুত্রের নাম ছিল নিমিল বা সুরনিমিল। তাহার শরীরে দশটি হস্তীর সমতুল্য বল ছিল। এই ভ্রাতাকে অন্যান্য ভ্রাতারা হিংসা করিত। এবং তাহারা সকলে অলস জীবনযাপন করিত। সকল ভ্রাতাগণ চাহিল যে তাহাদের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রক্ষীর কাজে নিযুক্ত হোক। কিন্তু তাহাদের মাতাপিতার ইহাতে স্বীকৃতি ছিল না।

॥ ১৯-২১ ॥

সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্যান্য ভ্রাতাদের উপর রাগ করিয়া একদিন প্রত্যুষে ঘর হইতে সকলের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া তিন যোজক পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য উদয়ের কালে যুবরাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ তাহাকে যাচাই করিতে একটি সংবাদ দিয়া বহুদূর অঞ্চলে যাইতে নির্দেশ দিয়া বলিলেন, 'চৈত্য পর্বতের নিকটে দ্বারমণ্ডল গ্রামে কুণ্ডলি নামক এক ব্রাহ্মণ মিত্র বাস করেন। তাঁর কাছে সাগরপার[৩] হইতে আগত বস্তুসকল আছে। তুমি সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া তিনি যাহা প্রদান করিবেন উহা সত্বর আমার নিকট লইয়া আসিবে।'

এই নির্দেশ দিয়া যুবরাজ তাহাকে আহার প্রদান করিয়া একটি পত্র তাহাকে দিলেন। ॥ ২২-২৫ ॥

যুবরাজের নির্দেশে নিমিল চিঠি লইয়া সকালে রওনা হইয়া, অনুরাধপুরের নিকটস্থ অঞ্চলে, নয় যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, 'পুষ্করিণীতে অবগাহন করিবার পর তুমি আমার নিকট আসিও।' ব্রাহ্মণের নির্দেশে নিমিল তিষ্য-পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া মহাবোধি

বৃক্ষ ও থূপারামের চৈত্যকে প্রণাম-বন্দনা করিয়া নগর[৪] দর্শনে বাহির হইল। পূর্বে নিমিল কোনদিন এই নগর দেখে নাই, তাই সারা নগর ঘুরিয়া দেখিল। বাজার হইতে সুগন্ধি দ্রব্য কিনিল। তারপর নগরের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পদ্মাকর হইতে কিছু পদ্ম তুলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নিমিল তাঁহাকে নগর দর্শনেরকথা জানাইল। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, এই ব্যক্তি সকালে এত দীর্ঘ পথ[৫] পদব্রজে অতিক্রম করিয়াও অক্লান্ত শরীরে আবার পদব্রজে সারা নগর ঘুরিয়াছে। তবে নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত এবং প্রচুর বলশালী। যদি এই সংবাদ রাজা ইলারর কানে যায়, তবে রাজা অবশ্যই এই ব্যক্তিকে তাঁহার কুক্ষিগত করিবেন। সুতরাং এই ব্যক্তিকে দমিলদের নিকট হইতে দূরে রাখিতে হইবে। বরং সে প্রেরিত যুবরাজের পিতার নিকটে গিয়া অবস্থান করুক।
॥ ২৬-৩২ ॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার সেই অভিমত চিঠির মারফত যুবরাজাকে জানাইতে একটি পত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তির হাতে প্রদান করিলেন। সঙ্গে দিলেন কিছু 'পুণ্যবর্ধন পোষাক'[৬] ও অন্যান্য নানা প্রকার উপহার সামগ্রী। নিমিলকে উত্তম খাদ্য পানীয় দিয়া ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সেইদিনের পড়ন্ত বিকালে, ছায়াগুলি যখন দীর্ঘ হইতেছিল, নিমিল যুবরাজের নিকট পেঁীছিল। সেই ব্রাহ্মণের প্রদত্ত উপহারসকল এবং চিঠিটিও যুবরাজকে প্রদান করিল। ॥ ৩৫ ॥

যুবরাজ নিমিলের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট-অনুচরদের বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! এই ব্যক্তিকে এক হাজার মুদ্রা প্রদান করুন।' কিন্তু অনুচরগণ উহা অতি সামান্য মনে করিলে, যুবরাজ নিমিলের সম্মানার্থে দশ হাজার মুদ্রা তাহাকে প্রদান করিতে বলিলেন।

যুবরাজের অনুচরগণ নিমিলকে, উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিতে, তাহার কেশ কর্তন করিয়া নদীতে অবগাহন করাইয়া তাহাকে একটি পুণ্যবর্ধক পোযাক পরাইয়া সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পহার কণ্ঠে দোলাইয়া রেশম বস্ত্রের শিরস্ত্রাণ বাঁধিয়া সজ্জিত করিয়া তাহাকে যুবরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ॥ ৩৬-৩৮ ॥

যুবরাজ নির্দেশ দিলেন যে তাঁহার নিজস্ব রন্ধনশালা হইতে খাদ্য পানীয় এই ব্যক্তিকে প্রদান করা হোক এবং যুবরাজের দশ হাজার মুদ্রার পালঙ্কটিও তাহাকে বিশ্রামের জন্য প্রদান করা হোক।

যুবরাজের প্রদত্ত উক্ত উপহার এবং দশ হাজার মুদ্রা নিমিল একত্র করিয়া

তাহার মাতা পিতার নিকট লইয়া গেল। নিমিল তাহার মাতাকে যুবরাজের প্রদত্ত দশ হাজার মুদ্রা দিল এবং পিতাকে যুবরাজের প্রদত্ত মূল্যবান পালঙ্কটি প্রদান করিল। ॥ ৩৯-৪০ ॥

সেই রাত্রেই নিমিল ফিরিয়া আসিয়া রক্ষীরূপে যথা স্থানে পাহারায় রইল। ॥ ৪১ ॥

পরদিন সকালে যুবরাজ উক্ত বিষয়টি জ্ঞাত হইয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনি যাত্রাপথের পাথেয় ও দশ হাজার মুদ্রা (উপহার স্বরূপ) দিয়া একজন সহচরসহ নিমিলকে তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইলেন। নিমিল সেই চলার পথেই স্বীয় মাতা পিতার নিকট গিয়া উক্ত দশ হাজার মুদ্রা তাঁহাদের দিয়া পরে যুবরাজের পিতা রাজা কাকবন্ন-তিষ্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে যুবরাজ গামণির কাজে নিযুক্ত করিলেন। সেইদিন হইতে যোদ্ধা নিমিল বা সুরনিমিল সসম্মানে যুবরাজ গামনির নিকট অবস্থান করিল। ॥ ৪২-৪৪ ॥

কুলুম্বরি প্রদেশের হুনদরিবাপি গ্রামে তিষ্যর অষ্টম পুত্র সোণ বাস করিত। তার সাত বৎসর বয়সকালে সে কচি তালবৃক্ষ বলপূর্বক ছিঁড়িয়া ফেলিত। দশ বছর বয়সকালে সে মহা তালবৃক্ষ ছিঁড়িয়া ফেলিত। ক্রমে তাহার শরীরে দশ হস্তীর সমান বল হইল। সোণ সম্বন্ধে রাজা জ্ঞাত হইলে, তিনি তাহাকে তাহার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া যুবরাজ গামণির হাতে সোণকে অর্পণ করিলেন যাহাতে সে সোণকে কাজে লাগাইতে পারে। সেইদিন হইতে পরম বীর সোণ বা মহাসোণ সসম্মানে যুবরাজ গামণির নিকট অবস্থান করিল। ॥ ৪৫-৪৮ ॥

গিরি প্রদেশের নিট্ঠুলভিট্ঠিক গ্রামে মহানাগের এক প্রবল বলশালী পুত্র বাস করিত। তাঁহার দেহে দশ হস্তীর সমান বল ছিল। সে বেঁটে ছিল বলিয়া তাহার নাম ছিল গোট্হক। তাহার ছয়জন বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ এই কারণে তাহার সহিত মজা করিত। একদিন এই ভ্রাতাগণ সীমের চাষের উপযোগী ভূমি সংগ্রহ করিতে নিকটবর্তী বনে গিয়া কিছুটা ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য বাকি আগাছাপূর্ণ ভূমি রাখিয়া আসিয়া গোট্হককে উহা পরিষ্কার করিতে বলিল। গোট্হক তৎক্ষণাৎ বনে গিয়া সেই আগাছাপূর্ণ বনাঞ্চলটি মুহূর্তে পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। ডুমুর বৃক্ষসহ অন্যান্য বৃক্ষসকল সেই ভূমি হইতে সে বলপূর্বক সমূলে উৎপাটিত করিয়া, ভূমিটি সমতল করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতাগণকে ইহা জানাইল। ভ্রাতাগণ বনে গিয়া গোট্হক-এর বিস্ময়কর কীর্তি দেখিয়া সকলে তাহাকে প্রশংসা করিল। এই কারণে গোট্হক পরে গোট্উম্বর নামে খ্যাত হইল। তাহাকেও রাজা গ্রহণ করিয়া

যুবরাজ গামণি'র কাজে নিযুক্ত করিলেন। সেইদিন হইতে বলশালী গোঠইম্বর সসম্মানে গামণির নিকট অবস্থান করিল। ॥ ৪৯-৫৪ ॥

কোট পর্বতের নিকটস্থ কিত্তি গ্রামে গৃহপতি রোহণ বাস করিতেন। তিনি ছিলেন সেই গ্রামের মোড়ল। তাহার পুত্রের নামও ছিল অভয়, যাহা ছিল রাজ্যের এক রাজার নাম। সেই পুত্রের দশ বা বারো বৎসর বয়সে সে খেলার ছলে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড বহুদূরে নিক্ষেপ করিত যাহা চার বা পাঁচ ব্যক্তি ভূমি হইতে তুলিতে পারিতেন না। সেই বালকের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, পিতা তাহাকে আটত্রিশ ইঞ্চি পুরু ও ষোল হাত দৈর্ঘ একটি দণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দণ্ড দিয়া অভয় খেলার ছলে কোন তালবৃক্ষ বা নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ডে আঘাত করিলে, সেই প্রবল আঘাতে সেই বৃক্ষ ভূপাতিত হইত। এইরূপ প্রবল বলশালী ছিল বলিয়া সে যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজা এই যোদ্ধাকেও লইয়া গিয়া যুবরাজ গামণির কাজে নিযুক্ত করিলেন। সে তারপর হইতে যুবরাজ গামণির নিকট সসম্মানে অবস্থান করিল। ॥ ৫৫-৬০ ॥

অভয়ের পিতা ছিলেন ভিক্ষু মহাসুম্ম-এর পৃষ্ঠপোষক। একদিন তিনি কোট পর্বতের বিহারে সেই ভিক্ষুর ধর্মদেশনা শুনিয়া স্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্ত হইলেন। রাজাকে এই সংবাদ দিয়া তিনি গ্রামের দায়িত্ব স্বীয় পুত্রকে প্রদান করিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি ধ্যান সাধনার মাধ্যমে অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অভয়ের পিতা ভিক্ষু হইয়াছিলেন বলিয়া পরে সকলে অভয়কে 'থেরপুত্তাভয়' বলিতেন। ॥ ৬১-৬৩ ॥

কপ্পকন্দর নামক গ্রামের অধিবাসী কুমারের 'ভরণ' নামক এক পুত্র ছিল। সেই বালকের বয়স যখন দশ বা বারো বৎসর হইল, সে সঙ্গী বালকদের সহিত জঙ্গলে গিয়া শশকদের পিছনে ছুটিয়া পদাঘাতে একসঙ্গে একজোড়া শশকদের ভূপাতিত করিত। তাহার বয়স যখন ষোল হইল তখন সে জঙ্গলের কৃষ্ণসারমৃগ, বরাহ ও বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ প্রভৃতির পিছনে ছুটিয়া এক পদাঘাতে তাহাদের হত্যা করিত। এই প্রবল শক্তির জন্য ভরণ যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজা তাঁহাকেও লইয়া গিয়া যুবরাজ গামণির কাজে নিযুক্ত করিলেন। তারপর হইতে ভরণ যুবরাজ গামণির নিকট সসম্মানে অবস্থান করিল। ॥ ৬৪-৬৭ ॥

গিরি প্রদেশের কুটুম্বিয়ংগন গ্রামে সর্বজন পূজ্য 'বাসব' নামক এক গৃহপতি বাস করিতেন। গ্রামবাসী ভেলু এবং সেই প্রদেশের রাজ্যপাল সুমন গৃহপতি বাসবের মিত্র ছিলেন। গৃহপতি বাসবের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, এই দুই মিত্র নানা উপহার সামগ্রী লইয়া নবজাতককে

দেখিতে যায় এবং তাহাদের উভয়ের নাম যুক্ত করিয়া এই নবজাতকের নামকরণ করা হয় ভেলুসুমন। বড় হইলে এই বালক গিরি প্রদেশের রাজ্যপালের গৃহেই বাস করিত। রাজ্যপালের একটি সিন্ধু প্রদেশের অশ্ব[৭] ছিল। সেই অশ্ব কাহাকেও তাহার পৃষ্ঠে চড়িতে দিত না। কিন্তু সেই অশ্ব ভেলুসুমনকে আসিতে দেখিয়া ভাবিল 'এই ব্যক্তিই আমার উপযুক্ত সওয়ার'। অশ্ব খুশীতে হ্রেস্বা রব করিল। রাজ্যপাল সুমন ইহা দেখিয়া ভেলুসুমনকে বলিলেন, 'তুমি এই অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ কর।' ভেলুসুমন সেই অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে চক্রাকারে অশ্বকে দ্রুতবেগে ধাবিত করিল। এত প্রবল বেগে অশ্বটি চক্রাকারে একই স্থানে ছুটিল যে ভূমিতে দণ্ডায়মান একই ব্যক্তিকে বহু ব্যক্তি সারি দিয়া মালার ন্যায় গোল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হইল। আর সেই ব্যক্তি ভূমিতে দাঁড়াইয়া শুধুমাত্র ধাবমান অশ্বটিকেই দেখিল, তাহার আরোহীকে নয়[৮]। ॥ ৬৮-৭৪ ॥

ভেলুসুমন তীব্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া নির্ভয়ে বারবার লাগাম ছাড়িয়া দিয়া নিজের পোষাক ঢিলা করিল আর বাঁধিল। ইহা দেখিয়া অনেকে ছুটিয়া আসিয়া আনন্দে করতালি দিল। রাজ্যপাল ভেলুসুমনকে দশ হাজার মুদ্রা উপহার দিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ভেলুসুমন রাজার অধীনে কার্যের উপযুগী।' তিনি তাই খুশী মনে তাহাকে রাজার নিকট প্রদান করিলেন। রাজা তাহাকে সসম্মানে তাঁহার নিকট রাখিলেন। ॥ ৭৫-৭৭ ॥

নকুলনগ প্রদেশের মহিসদোণিক গ্রামে অভয়ের প্রবল বলবান কনিষ্ঠ পুত্র 'দেব' বাস করিত। সে কিঞ্চিত খোঁড়াইয়া চলিত বলিয়া সকলে তাহাকে খঞ্জদেব বলিত। সে যখন বালক, তখন সে গ্রামবাসীদের সহিত জঙ্গলে শিকার করিতে গেলে, সেই বয়সেই সে বন্য মহিষের পিছনে ছুটিয়া স্বহস্তে বন্য মহিষের পা ধরিয়া টানিয়া মাথার উপর তুলিয়া কয়েক পাক ঘুরাইয়া ভূমিতে আছাড় দিয়া মহিষের দেহের হাড়গোড় গুঁড়াইয়া দিত। রাজা এই সংবাদ পাইয়া খঞ্জদেবকে ডাকিয়া আনিয়া যুবরাজ গামণির নিকট তাহাকে থাকিতে নির্দেশ দিলেন। ॥ ৭৮-৮১ ॥

চিত্তল পর্বত বিহারের নিকটস্থ গভিত গ্রামে উপ্পল গৃহপতির পুত্র ফুস্সদেব বাস করিত। বাল্যকালে একবার সে সঙ্গী বালকদের সহিত বিহারে গিয়া বোধিবৃক্ষে দান স্বরূপ প্রদত্ত শঙ্খটি তুলিয়া লইয়া প্রবল জোরে শঙ্খধ্বনি[৯] করিয়াছিল। সেই শঙ্খধ্বনি ছিল বজ্রনিনাদের ন্যায় যাহাতে সঙ্গী বালকগণ সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই পাগলামীর কারণে তাহাকে সকলে 'উম্মাদফুস্সদেবা' বলিত। বংশের ধারানুসারে

তাহার পিতা তাহাকে ধনুর্বাণ চালনা করিতে শিখাইয়াছিল। সে সেই শিক্ষায় প্রখ্যাত ধনুর্ধর হইল। সে শব্দভেদী বাণ চালাইতে জানিত। অন্ধকারে সামান্য বিদ্যুতের দ্যুতিতে সে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিত। সূক্ষ্ম কেশাগ্রও সে বিন্ধ করিতে পারিত। শকট বোঝাই বালি, থাকে থাকে রাখা একশত বাণ্ডিল চর্ম, আট বা ষোল ইঞ্চি পুরু ডুমুর বৃক্ষের কাষ্ঠের পাটাতন অথবা দুই বা চার ইঞ্চি পুরু লোহ বা তামার চাদর ইত্যাদি তাহার শর ছেদ করিয়া যাইত। তাহার নিক্ষিপ্ত শর ভূমির উপর আট উসভ[10] অবধি যাইত, এবং জলের মধ্যে উহা এক উসভ অবধি যাইত।

॥ ৮২-৮৮ ॥

মহান রাজা ইহা জ্ঞাত হইলে, তিনি ফুস্সদেবকে তাহার পিতার নিকট হইতে আনিয়া যুবরাজ গামণির নিকট তাহাকে থাকিতে নির্দেশ দিলেন। ॥ ৮৯ ॥

তুলাধার পর্বতের নিকটস্থ বিহারবাপি নামক গ্রামে গৃহপতি মত্ত-এর 'বসভ' নামক এক পুত্র ছিল। তাহার দেহসৌষ্ঠবের কারণে সকলে তাহাকে 'লভিয়বসভ' বলিত। তাহার কুড়ি বৎসর বয়সকালে সে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। একবার পুষ্করিণী খনন করিতে কিছু ব্যক্তিদের সহিত নিয়োজিত হইলে, দশ বা বারোজন ব্যক্তি যাহা একসঙ্গে করিতে পারে, সে নিজে একাই সেই পরিমাণ মাটি এক এক বারে ভূমি হইতে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে পুষ্করিণীটি প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। এই কার্যে তাহার খ্যাতি বাড়িল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া 'লভিয়বসভকে' তিনি ডাকিয়া যুবরাজ গামণির কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে 'লভিয়বসভ' যুবরাজ গামণির নিকট রহিল। তাহার খনন করা পুষ্করিণীর নাম হইল 'বসভ পুষ্করিণী'। ॥ ৯০-৯৫ ॥

রাজা উক্ত দশজন মহাযোদ্ধাদের তাঁহার পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। তিনি এই দশজনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা প্রত্যেকে দশজন করিয়া যোদ্ধার সন্ধান কর'। তাহারা রাজার নির্দেশে প্রত্যেকে দশজন করিয়া যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া রাজার নিকট আনিলে, রাজা এই একশ জন যোদ্ধাদের প্রত্যেককে দশজন করিয়া যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। রাজার নির্দেশে তাহারা এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া আনিলে, রাজা সেই এক হাজার যোদ্ধাদের প্রত্যেককে দশজন করিয়া যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা রাজার নির্দেশে তাহাই করিল। এইরূপে এগারো হাজার একশত দশ জন যোদ্ধা সংগ্রহ করা হইল। যোদ্ধাদের নিকট ইহাই হইল রাজার শুল্ক আদায়।

॥ ৯৬-১০০ ॥

এই সকল যোদ্ধাগণ প্রতিনিয়ত রাজার নিকট সসম্মানে পুরস্কৃত হইল এবং যুবরাজ গামণি তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিল। ॥ ১০১ ॥

স্বীয় মুক্তির জন্য সচেতন জ্ঞানীগণ যখন পুণ্যকর্মের শুভফল জ্ঞাত হয়, তখন তাহারা নিশ্চয়ই অকল্যাণকর মার্গ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলদায়ী মার্গে মহাসুখ প্রাপ্ত হয়। ॥ ১০২ ॥

যোদ্ধাদের নিকট শুল্ক আদায় সমাপ্ত

এইখানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'যোদ্ধাদের নিকট শুল্ক আদায়'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. এই রকম বলশালী মানুষ এই যুগে কাল্পনিক মনে হলেও প্রাচীনকালে তারা যে ছিল না তার প্রমাণ নেই। বরং পৃথিবীর নানা প্রাচীন গ্রন্থে তাদের অস্তিত্বের কথা রয়েছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে, মায়া ও ইন্‌কা সভ্যতার নিদর্শনে, গিল্‌গামিস-এর কাব্যে (এপিক অফ গিলগামিস্‌), মহাভারতে, এদের কথা রয়েছে। তাছাড়া, প্রত্নতাত্ত্বিকরাও কিছু কিছু প্রাচীন নরকঙ্কাল পেয়েছেন যা ছিল খুবই অস্বাভাবিক প্রকাণ্ড মানুষের, যেমন জাভার দৈত্য, দক্ষিণ চীনের দৈত্য, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে প্রাপ্ত দৈত্য প্রভৃতি। তাদের প্রকাণ্ড সব পাথুরে অস্ত্রও পাওয়া গেছে। এরা সবাই ছিল প্রকাণ্ডাকারের মহাবলশালী মানুষ।

২. দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের দমিল বলা হয়েছে।

৩. ভারতবর্ষ ও নানা দেশের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে শ্রীলঙ্কার বাণিজ্য চলতো।

৪. অনুরাধপুর নগর।

৫. কচ্ছকতীর্থ থেকে অনুরাধপুর নগরের নিকটস্থ দ্বারমণ্ডল গ্রাম।

৬. দামী পোষাক।

৭. প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলের অশ্বের খ্যাতি ছিল।

৮. এই কাহিনী আলেকজান্ডারের ঘোড়া 'বুকেফেলাস' সম্বন্ধেও বলা হয়।

৯. অনুরূপ কাহিনী বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে রয়েছে।

১০. এক উসভ হচ্ছে সাত হাত দৈর্ঘ।

২৪

দুই ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ

দক্ষ তীরন্দাজ, অসি চালনায় এবং হস্তী ও অশ্ব চালনায় সুদক্ষ যুবরাজ গামণি মহাগাম-এ বাস করিত। ॥ ১-২ ॥

রাজা যুবরাজ তিষ্যকে বহু সৈন্য ও রথসহ দীঘবাপিতে মোতায়েন করিলেন যাহাতে সে উন্মুক্ত রাজ্যের রক্ষার্থে নজর রাখিতে পারে। অতঃপর যুবরাজ গামণি তাহার নিকট অবস্থিত সৈন্য ও যোদ্ধা সকল পরিদর্শন করিয়া পিতাকে এই বার্তা পাঠাইল, 'আমি দমিলদের সহিত যুদ্ধ করিব।' রাজা পুত্রের মঙ্গলার্থে তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'গঙ্গার এই পারের[১] রাজ্যই যথেষ্ট।' যুবরাজ গামণি রাজাকে পর পর তিনবার তাহার সংকল্পের কথা জানাইল। রাজা প্রতিবার নিষেধ করিয়া সেই একই উত্তর পাঠাইলেন। যুবরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ মন্তব্য করিল, 'আমার পিতা যদি পুরুষ হইতেন, তবে তিনি এইরূপ উত্তর প্রদান করিতেন না। সুতরাং তাঁহার ইহাই ধারণ করা উচিত।' যুবরাজ এই বলিয়া পিতাকে নারীর অলংকার পাঠাইল। ॥ ৩-৫ ॥

রাজা যুবরাজ গামণির এইরূপ ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হইয়া নির্দেশ দিলেন 'স্বর্ণ-শৃঙ্খল প্রস্তুত কর। উহা দ্বারা আমি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। অন্যথা তাহাকে রক্ষা করা যাইবে না।' ॥ ৬ ॥

যুবরাজ গামণি ইহার পূর্বেই পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া মলয় অঞ্চলে পলায়ন করিল। যেহেতু গামণি পিতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে কটুকথা বলিয়াছিল, সেই কারণে সকলে তাহাকে 'দুট্ঠগামণি' বলিত। ॥ ৭ ॥

ইহার পর রাজা মহানুগ্গল চৈত্য নির্মাণ করিলেন। চৈত্য নির্মিত হইলে রাজা ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিলেন। চিত্তল পর্বত বিহার হইতে বারো হাজার ভিক্ষুগণ এবং অন্যান্য অঞ্চল হইতে আরও বারো হাজার ভিক্ষুগণ রাজার আহ্বানে উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ॥ ৮-৯ ॥

রাজা উক্ত চৈত্যের উদ্বোধন করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর সেই দশজন মহাবলী যোদ্ধাদের সেই স্থানে আনয়ন করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুসংঘের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন, 'আমরা যুবরাজগণের যুদ্ধে সামিল হইব না।' সকল যোদ্ধাগণ এই প্রতিজ্ঞা করিল এবং পরে যুবরাজদের যুদ্ধে তাহারা সামিল হয় নাই। ॥ ১০-১১ ॥

রাজা কাকবর্ণ তিষ্য চৌষট্টিটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

আয়ু পূর্ণ হইলে রাজা মহাগামে মৃত্যুবরণ করেন। রাণী ঢাকা দেওয়া শকটে রাজার মরদেহ বহন করিয়া তিষ্যমহারাম বিহারে আনিয়া ভিক্ষুসংঘকে রাজার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন। ॥ ১২-১৩ ॥

যুবরাজ তিষ্য পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দীঘবাপি হইতে সত্বর আসিয়া পিতার শেষকৃত্য যথাযথ সম্মানে সম্পন্ন করিয়া রাণীমাতা ও হস্তী কণ্দুলকে সঙ্গে লইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভয়ে সত্বর দীঘবাপিতে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ১৪-১৫ ॥

অতঃপর অমাত্যগণ সকলে মন্ত্রণা করিয়া রাজ্যের পরিস্থিতি জানাইতে যুবরাজ গামণিকে একটি পত্র পাঠাইলেন। পত্র পাইয়া যুবরাজ গুত্তহাল অঞ্চলে একটি ছাউনি স্থাপন করিয়া মহাগামে আসিলেন এবং নিজেকে রাজারূপে অভিসিক্ত করিলেন। ॥ ১৬-১৭ ॥

রাজা হইয়া দুট্ঠগামণি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে পত্র পাঠাইয়া রাণীমাতা ও হস্তী কণ্দুলকে ফিরাইয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। পরপর তিনবার চাহিয়াও যুবরাজ তিষ্য যখন রাণীমাতা ও কণ্দুল হস্তীকে ফেরৎ পাঠাইলেন না, তখন রাজা গামণি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ॥ ১৮ ॥

চুড়ংগনিয়াপিট্ঠি অঞ্চলে দুই ভ্রাতার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাজার বহু হাজার সৈন্য নিহত হইল। রাজা, তাঁহার অমাত্য তিষ্য এবং ঘোটকী দীঘথুনিকা সহপ্রাণ বাঁচাইতে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। যুবরাজ তিষ্য তাঁহাদের পিছে ধাওয়া করিলেন। সেই সময় ভিক্ষুসংঘ অলৌকিক শক্তিতে দুই ভ্রাতার দলের মধ্যস্থলে এক বিরাট পর্বতের প্রাচীর সৃষ্টি করিলেন। এই অলংঘ্য প্রাচীর দেখিয়া যুবরাজ তিষ্য ফিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন 'ইহা ভিক্ষুসংঘের কারসাজি।' ॥ ১৯-২১ ॥

রাজা গামণি ছুটিতে ছুটিতে কপ্পকন্দর নদীর অগভীর ও নাব্য 'জবমাল' নামক স্থানে পৌঁছিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহার অমাত্যকে বলিলেন 'হে মিত্র! আমি ক্ষুধায় বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।' অমাত্য একটি স্বর্ণপাত্রে তাহার সঙ্গের খাদ্য রাজাকে প্রদান করিলেন। রাজা সেই খাদ্য চার ভাগ করিলেন এবং অমাত্যকে বলিলেন 'হে মিত্র! আপনি আহারের সময় হইয়াছে ঘোষণা করুন।' অমাত্য তিষ্য রাজার নির্দেশে উচ্চস্বরে উহা ঘোষণা করিলেন। ॥ ২২-২৪ ॥

পিয়ঙ্গুদ্বিপে অবস্থিত ভিক্ষু গোতম, যিনি এই রাজাকে শীল প্রদান করিয়াছিলেন, এই ঘোষণা দিব্য শ্রবণ শক্তিতে শুনিতে পাইলেন। তিনি এক গৃহপতির পুত্র, ভিক্ষু তিষ্যকে, উক্ত ঘোষণার স্থানে পাঠাইলেন। সেই ভিক্ষু অলৌকিক শক্তিতে বায়ু পথে সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন।

অমাত্য তিষ্য ভিক্ষুর হাত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া উহা রাজাকে দিলেন। রাজা সেই ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষুগণের জন্য রাখা খাদ্যের একটি ভাগ এবং তাঁহার নিজের ভাগ্যটি ঢালিয়া দিলেন। অমাত্য তিষ্য তাহার ভাগটিও সেই পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। ঘোটকীও তাহার ভাগটি দিতে ইঙ্গিত করিলে, অমাত্য তিষ্য সেই ভাগটিও ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রে ঢালিয়া দিলেন।

॥ ২৫-২৭ ॥

রাজা ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রটি খাদ্যে পূর্ণ করিয়া পাত্রটি ভিক্ষুর হাতে তুলিয়া দিলেন। ভিক্ষু পাত্রটি লইয়া বায়ুপথে শীঘ্র ভিক্ষু গোতমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ॥ ২৮ ॥

ভিক্ষু গোতম এক মুষ্টি করিয়া সেই খাদ্য পাঁচশত ভিক্ষুগণকে প্রদান করিলেন। ভিক্ষুগণ পরম তৃপ্তি সহকারে সেই খাদ্য গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষু গোতম ইহার পর সেই শূন্য ভিক্ষাপাত্রটি আবার উক্ত পাঁচশত ভিক্ষুগণের দেওয়া খাদ্যে পূর্ণ করিয়া উহা মহাশূন্যে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত ভিক্ষাপাত্রটি বায়ুপথে গিয়া রাজা গামণির নিকট গিয়া পেঁাছিল। অমাত্য তিষ্য সেই ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া সেই খাদ্যে রাজার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিয়া বাকি খাদ্যে তিনি নিজের এবং ঘোটকীর ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন।

অতঃপর রাজা গামণি সেই ভিক্ষাপাত্রের তলায় নিজের বস্ত্র ভাঁজ করিয়া দিয়া সেই পাত্রটিকে শূন্যে উড়াইয়া দিলেন। পাত্রটি বায়ুপথে গিয়া ভিক্ষু গোতমের হাতে গিয়া থামিল। ॥ ২৯-৩১ ॥

রাজা গামণি মহাগামে ফিরিয়া গিয়া ষাট হাজার সৈন্য একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। রাজা তাঁহার ঘোটকীর পৃষ্ঠে চড়িয়া এবং যুবরাজ তিষ্য কণ্দুল হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া দুই ভ্রাতা যুদ্ধে মুখোমুখি হইলেন। রাজা হস্তীর চারিদিকে ঘুরিয়াও তিষ্যের কোন অরক্ষিত স্থান দেখিতে পাইলেন না যে আঘাত করিবেন। তখন তিনি হস্তীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে মনস্থ করিয়া ঘোটকীসহ হস্তীর উপর লম্ফ দিয়া উঠিয়া উহার পৃষ্ঠে অবস্থিত তিষ্যের উপর[২] তীর নিক্ষেপ করিলেন। সেই তীর কেবল হস্তীর পৃষ্ঠের চর্মে সামান্য আঘাত করিল। ॥ ৩২-৩৫ ॥

যুদ্ধে যুবরাজ তিষ্যের বহু হাজার সৈন্য নিহত হইল এবং বাকি সৈন্যগণ চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। হস্তী কণ্দুল ভাবিল, 'আমার আরোহীর ভুলে সামান্য ঘোটকী আমাকে লঙ্ঘন করিল[৩]'। হস্তী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আরোহীকে তাহার পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিতে প্রবল বেগে একটি বৃক্ষের দিকে ছুটিল। ভীত হইয়া যুবরাজ তিষ্য হস্তীর পৃষ্ঠ

হইতে লম্ফ দিয়া সেই বৃক্ষটিকে ধরিয়া উহার উপর চড়িল। আরোহী শূন্য হস্তী ইহার পর তাহার প্রভু রাজা গামণির নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুবরাজ তিষ্যের সন্ধানে ছুটিলেন। যুবরাজ তিষ্য বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়া গিয়া একটি বিহারে প্রবেশ করিয়া, সেই বিহারের বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষুর কক্ষে গিয়া তাঁহার খাটের নীচে লুকাইলেন। ভিক্ষু যুবরাজকে চীবর দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। ॥ ৩৬-৪০ ॥

রাজা গামণি ভ্রাতার খোঁজে সেই বিহারে প্রবেশ করিয়া এক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে। যুবরাজ তিষ্য কোথায় বলিতে পারেন?' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! তাঁহার জন্য কি আপনি বিহারকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিবেন?' ॥ ৪১ ॥

রাজা গামণি লজ্জিত হইয়া সহসা বিহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি বিহারের চারিদিকে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'যাঁহারা আমাদের রক্ষাকারী দেবতা, তাঁহাদের আশ্রমস্থল আমার দ্বারা অপবিত্র হইতে পারে না। তিষ্যকে তাঁহারা রক্ষা করিলেও উহাতে কাহারও কিছু করণীয় নাই। বরং রক্ষাকারী দেবতাগণের এই সদ্গুণ মনে রাখিবে।'

রাজা গামণি চলিয়া গেলে ভিক্ষুগণ যুবরাজের প্রাণ বাঁচাইতে তাঁহাকে একটি খাটের উপর শয়ন করাইয়া, উপরে বস্ত্রের আচ্ছাদন দিয়া, সেই খাট চারিজন তরুণ শ্রমণ বহন করিয়া, যেন কোন মৃতদেহ তাহারা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এইরূপে বিহার হইতে বাহির করিয়া সৈন্যগণের ব্যূহ অতিক্রম করিয়া যুবরাজকে পলায়ন করিতে সাহায্য করিলেন। ॥ ৪২-৪৫ ॥

রাজা গামণি মহাগাম-এ গিয়া তাঁহার মাতাকে সসম্মানে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। এই রাজা ধর্মে অবিচল থাকিয়া আটষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যে আটষট্টিটি বিহার নির্মাণ করেন। ॥ ৪৬-৪৭ ॥

যুবরাজ তিষ্য বিহার হইতে বাহির হইয়া অজ্ঞাত[৪] অবস্থায় দীঘবাপিতে ফিরিয়া আসেন। যুবরাজ ভিক্ষু গোধগত্ত[৫] তিষ্যকে বলিলেন, 'ভন্তে! আমি ভুল করিয়াছি। সংশোধনের জন্য আমি আমার ভ্রাতার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক।' ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অতঃপর উক্ত ভিক্ষু পাঁচশত ভিক্ষুসহ যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজা গামণির নিকট গেলেন। ভিক্ষুগণ যুবরাজ তিষ্যকে বাহিরে রাখিয়া রাজার নিকট গেলে, রাজা তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মানের সহিত আসন প্রদান

করিয়া আহারের জন্য তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে পায়েস প্রদান করিতে গেলে, ভিক্ষুগণ তাঁহাদের পাত্র হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। রাজা বিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আমার দ্বারা কি কোন ভুল হইয়াছে?' ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি আমাদের কোন এক সঙ্গীকে এই স্থলে আসিতে না দিয়া বাহিরে অভুক্ত রাখিলে, আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আহার গ্রহণ করিব কী করিয়া? আমরা যুবরাজ তিষ্যকেও আমাদের সঙ্গে আনিয়াছি।' রাজা ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কোথায় সেই বিশ্বাসঘাতক।' ভিক্ষুগণ নির্দেশ করিলেন যুবরাজ তিষ্য কোথায় রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাণীমা বিহারদেবী সহসা পুত্রের নিকট ছুটিয়া গেলেন, পাছে রাজা তাহার কোন ক্ষতি করেন। রাজা হতাশ হইয়া বলিলেন 'হে পূজ্যবর ভন্তেগণ! আপনারা জানেন, আমিও তাহার ন্যায় আপনাদের পরম সেবক। পূর্বে যদি সাত বছর বয়স্ক কোন শ্রমণকেও আপনারা আমার নিকট, দুই ভ্রাতার মধ্যে মিত্রতার নির্দেশ দিয়া পাঠাইতেন, তবে আমাদের মধ্যে এই যুদ্ধও হইত না এবং এতো ক্ষয়ক্ষতিও হইত না। সকল কিছু শান্তিতে নিষ্পত্তি হইত।' ॥ ৫০-৫৪ ॥

ইহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ'! ইহা ভিক্ষুসংঘের অপরাধ স্বরূপ। ভিক্ষুসংঘ ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে।' ॥ ৫৫ ॥

'ভন্তে! এইবার আপনারা আহার গ্রহণ করুন। আপনাদের সঙ্গীকেও বঞ্চিত করা হইবে না'।[৫] এই বলিয়া রাজা ভিক্ষুগণকে স্বহস্তে খাদ্যসকল প্রদান করিলেন। রাজা ভিক্ষুগণের উপস্থিতিতে যুবরাজ তিষ্যকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইলেন। যুবরাজ তিষ্যকে রাজা আহার প্রদান করিয়া নিজেও তাহার সহিত আহার করিলেন। ॥ ৫৬-৫৭ ॥

ভিক্ষুগণ আহার শেষে প্রস্থান করিলে, রাজা ভেরির শব্দে ঘোষণা করিয়া যুবরাজ তিষ্যকে চাষ-আবাদের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়া দীঘবাপিতে পাঠাইলেন এবং নিজেও চাষ-আবাদের কাজ পরিচালনা করিলেন।[৬]

এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নানা কারণে উৎপন্ন শত্রুতা, উহা যত ভয়ানকই হউক, তাহা প্রশমিত করেন। জ্ঞানীগণ যাহা করেন, শান্তিপ্রিয় মানুষ কি অন্যের প্রতি এইরূপ ভাবাপন্ন হইবেন না? ॥ ৪৯ ॥

দুই ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত

এইখানে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'দুই ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. মহাগঙ্গার ওপারে ছিল দমিলদের রাজ্য।
২. টীকাকাররা বলেছেন যে রাজা কেবল নিজের ক্ষমতা দেখাতে এটা করেছিলেন, কাউকে হত্যা করতে নয়।
৩. 'লঙ্ঘন করা' কথাটা এখানে রূপকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪. ছদ্মবেশে।
৫. তাহার দেহের চর্ম ছিল গুঁই সাপের মতো পুরু ও দাগ বিশিষ্ট।
৬. টীকাকার বলেছেন যে দমিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে রাজা দেশের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ রাখতে চাষের তদারকির এই বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

২৫

রাজা দুট্ঠগামণির যুদ্ধ বিজয়

রাজা দুট্ঠগামণি স্বীয় প্রজাগণের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করিয়া তারপর রাজধ্বজা সম্মুখে রাখিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসহ দলবন্ধভাবে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। পথে তিষ্যমহারাম বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুসংঘকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া রাজা বলিলেন, 'ভন্তে, ধর্মের খ্যাতি বৃদ্ধি করিতে আমি মহাগঙ্গার অপর পারে যাইব। আমাদের সহিত কতিপয় ভিক্ষু প্রদান করুন যাঁহাদের শুভাশীষ আমাদের রক্ষা করিবে। আমরা তাঁহাদের যথাযথ সম্মানের সহিত সঙ্গে রাখিব।'

পূর্বের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভিক্ষুসংঘ রাজাকে পাঁচশত শ্রমণ প্রদান করিলেন। রাজা তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া রওনা হইলেন। মলয় প্রদেশ হইতে চলার পথটির সংস্কার করিয়া রাজা কণ্দুল হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার যোদ্ধাগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য নদীর ওপারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সারিবদ্ধ সৈন্যদলের প্রথম ভাগটি গুত্তহালক-এ পৌঁছিলেও শেষের ভাগটি তখনও মহাগাম-এ রহিয়াছে। এতই দৈর্ঘ ছিল সৈন্যদলের সারি। ॥ ১-৬ ॥

রাজা মহিয়ঙ্গনে দমিল ছত্তকে পরাস্ত করিলেন এবং বহু সংখ্যক দমিলদের হত্যা করিলেন। অতঃপর রাজা অম্বতিত্তথক অঞ্চলে গেলেন। সেই স্থানে দমিলগণ একটি সুড়ঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন যাহা নদীতীর অবধি দৈর্ঘ ছিল। দমিলগণ সেই সুড়ঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিল। চতুর ও প্রবল পরাক্রম দমিল তিত্থমব্ রাজার সহিত চারি মাস এইরূপে যুদ্ধ করিল। পরে রাজা দুট্ঠগামণি কৌশল[১] করিয়া স্বীয় মাতা বিহারদেবীকে দেখাইয়া দমিল তিত্থমব-কে পরাস্ত করিলেন। ॥ ৭-৯ ॥

অতঃপর পরাক্রম রাজা নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া আরও সাতজন প্রবল শক্তিমান দমিল যুবরাজগণকে একই দিনে জয় করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। যুদ্ধে প্রাপ্ত সামগ্রী সকল রাজা সৈন্যদের প্রদান করিলেন। সেই স্থানের নাম হইল ক্ষেমারাম। ॥ ১০ ॥

অন্তরাসোব্ভায় রাজা মহাকোট্ঠকে দমন করিলেন। দোণয়ে গভরুকে দমন করিলেন। হালকোলয় ইস্সরিয়কে এবং নালিসোব্ভায় নালিককে দমন করিলেন। দীঘাভয়গল্লক-এ রাজা সেইরূপে দীঘাভয়কে দমন করিলেন। চারিমাসের মধ্যে কচ্ছতিত্থতে রাজা কপিসিসকে দমন করিলেন। কোটনগরে রাজা কোটকে এবং পরে হালবহানককে দমন

করিলেন। বহিট্‌ঠতে দমিল বহিট্‌ঠ, গামণিতে দমিল গামণি, কুম্‌বগামে দমিল কুম্‌ব, নন্দিগামে দমিল নন্দিক, খানুগামে দমিল খানু, তম্‌ব এবং উন্‌নমতে দমিল তমব ও উন্‌নম, যাহারা কাকা ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জমবুতে দমিল জমবু প্রভৃতিকে রাজা দমন করিলেন। উক্ত দমিলগণের নামেই উক্ত স্থানের নামকরণ করা হইয়াছিল। ॥ ১১-১৫ ॥

রাজা শুনিলেন যে এইরূপ বলা হইতেছে, 'নিজেদের সৈন্যগণকে না চিনিয়া সৈন্যগণ নিজেদের সৈন্যগণকেই[১] হত্যা করিতেছে।' ইহাতে রাজা এই ঘোষণা করিলেন 'রাজ্য জয়ের জন্য আমার এই পরিশ্রম নয়। সম্যক সম্বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতেই আমি এই শ্রম করিতেছি। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার সৈন্যদের দেহের বর্ম অগ্নিবর্ণ ধারণ করিবে।' রাজা যাহা বলিলেন সেইরূপই হইল। ॥ ১৬-১৮ ॥

নদী তীরের দমিলগণ, যাহারা যুদ্ধে নিহত হয় নাই, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য বিজিতনগরে প্রবেশ করিল।

রাজা খোলা মাঠে ছাউনী ফেলিল। সেই স্থানটি পরে খন্‌ধাভারাপিটঠি নামে খ্যাত হইল। ॥ ১৯-২০ ॥

অতঃপর রাজা বিজিতনগর জয় করিবার অপেক্ষার কালে যোদ্ধা নন্দিমিত্তকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে কণ্‌দুল হস্তীকে তাহার দিকে ছাড়িয়া দিলেন। হস্তী তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিলে নন্দিমিত্ত হস্তীর দন্ত ধরিয়া বলপূর্বক তাহাকে ভূমিতে বসাইয়া দিল। যেই স্থানে এই ঘটনাটি হইল গ্রামবাসীগণ সেই বিশেষ স্থানটিকে 'হত্তিপোর' নামে অবিহিত করিল। ॥ ২১-২৩ ॥

রাজা এইভাবে হস্তী এবং যোদ্ধা উভয়কে যাচাই করিয়া বিজিত নগর অভিমুখে রওনা হইলেন। উক্ত নগরের দক্ষিণ দ্বারে দমিলগণের সহিত যোদ্ধাগণের ভয়ানক যুদ্ধ হইল। নগরের পূর্ব দ্বারে যোদ্ধা ভেলুসুমন অশ্বারূঢ় হইয়া বহু সংখ্যক দমিলগণকে হত্যা করিল। ॥ ২৪-২৫ ॥

দমিলগণ নগরের চারিটি দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করিয়া দিলে রাজা তাঁহার যোদ্ধাগণকে সৈন্যসহ নগরের চারিটি দ্বারে পাঠাইলেন। যোদ্ধা নন্দিমিত্ত এবং সুরনিমিলকে কুণ্‌দল হস্তীসহ নগরের দক্ষিণ দ্বারে পাঠাইলেন। আর তিনজন যোদ্ধা মহাসোণ, গোট্‌ঠ এবং থেরপুত্তকে নগরের বাকি তিনটি দ্বারে পাঠাইলেন। নগরের চারিদিকে তিনটি পরিখা ছিল উচ্চ পাঁচিল দিয়া রক্ষিত। পাঁচিলে অবস্থিত নগরের চারিটি দ্বার ছিল পিটানো লৌহ দ্বারা নির্মিত যাহা শত্রুদের পক্ষে ধ্বংস করা দুঃসাধ্য। ॥ ২৬-২৮ ॥

হস্তী কণ্‌দুল নগরের দক্ষিণ দ্বারের সামনে হাঁটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া

তাহার শুঁড় দিয়া ভারী ভারী পাথর, লৌহ ও ইস্টক প্রভৃতি ছুঁড়িয়া বন্ধ দরজাটিকে ভাঙিতে বারবার আঘাত করিল। দমিলগণ উক্ত দরজার উপরে অবস্থিত পরিদর্শন কেন্দ্র হইতে হস্তীর উপর নানা প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। তপ্ত লাল লৌহ গোলক, উষ্ণ গলিত কালো পিচ ইত্যাদি হস্তীর উপর তাহারা নিক্ষেপ করিল। উত্তপ্ত ধূমায়িত কাল পিচ হস্তীর পৃষ্ঠের উপর পড়িলে, হস্তী যন্ত্রণায় কাতর হইল। ইহাতে তাহাকে পুষ্করিণীর নিকট লইয়া গেলে, হস্তী উহার জলে মুহূর্তে ঝাঁপ দিল। ॥ ২৯-৩১ ॥

হস্তীকে পুষ্করিণীর জলে দেখিয়া, ইহার সঠিক কারণ জ্ঞাত না হইয়া, যোদ্ধা গোঠইম্বর তাহাকে বলিল, ফূর্তি করিতে তোমাকে এই স্থানে আনা হয় নাই। যাও, শীঘ্র গিয়া লৌহ নির্মিত দ্বারটি ধ্বংস কর।' হস্তী কণ্দুল ইহা শুনিয়া বীরদর্পে পুষ্করিণীর জল হইতে তীরে উঠিয়া আসিয়া রাগে এক তীব্র নিনাদ করিল। ॥ ৩২-৩৩ ॥

হস্তীর চিকিৎসক কণ্দুলের পৃষ্ঠ হইতে জমাট পিচ ধৌত করিয়া দিয়া ক্ষতস্থানে মলম লাগাইয়া দিলেন। ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর রাজা কণ্দুল হস্তীর উপর উঠিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া এই বলিয়া হস্তীকে সান্ত্বনা দিলেন 'হে প্রিয় কণ্দুল! তোমাকে আমি সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের প্রভুত্ব প্রদান করিতেছি।' রাজা হস্তীকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন। সাত ভাঁজ করা মহিষ চর্ম দিয়া হস্তীর চর্ম ঢাকিয়া উহার উপর কাপড়ের আবরণ দিয়া রাজার নিদর্শন সম্বলিত বর্ম হস্তীকে পরাইলেন। উহার উপর তৈলাক্ত চর্ম দিয়া ঢাকিয়া হস্তীকে ছাড়িয়া দিলেন। ॥ ৩৫-৩৭ ॥

হস্তী কণ্দুল বজ্র নিনাদে অকুতোভয়ে ছুটিয়া গিয়া তাহার দন্ত দিয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের বন্ধ দরজার কপাটের চতুষ্কোণ তক্তা বিদীর্ণ করিল ও চৌকাঠটি সবলে পদদলিত করিল। ইহাতে দরজাটি উহার উপরিস্থিত খিলানসহ সশব্দে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িল। তোরণের উপরিভাগ হস্তী কণ্দুলের উপর পড়িতে গেলে যোদ্ধা নন্দিমিত্ত উহা স্বীয় হস্ত দ্বারা প্রতিহত করিল। হস্তী ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় সে তাহার পূর্বের আক্রোশ ভুলিয়া গেল। এই যোদ্ধা তাহার দন্ত ধরিয়া সবলে ভূমিতে বসাইয়া দিয়াছিল, সেই কারণে হস্তী তাহার উপর ক্রুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় সেই রাগ হস্তী কণ্দুলের অন্তরে আর রহিল না। ॥ ৩৮-৪০ ॥

যোদ্ধা নন্দিমিত্তের পিছনে হস্তী কণ্দুল নগরে প্রবেশ করিবে মনস্থ করিয়া হস্তী উক্ত যোদ্ধার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু নন্দিমিত্ত ভাবিল, 'হস্তীর দ্বারা প্রস্তুত পথ দিয়া আমি নগরে প্রবেশ করিব না।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয় হস্তে নন্দিমিত্ত নগরের প্রাচীর আট হস্ত উচ্চ ও আট উসভ দীর্ঘ ধূলিসাৎ করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। হস্তী এইবার যোদ্ধা সুরনিমিল-এর দিকে তাকাইল। কিন্তু সুরনিমিলও অন্য যোদ্ধাগণের দ্বারা প্রস্তুত পথ দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে না এইরূপ চিন্তা করিয়া, ছুটিয়া গিয়া উল্লম্ফনে নগরের প্রাচীরের উপর দিয়া গিয়া নগরে ঢুকিল। যোদ্ধা মহাসোণ, থেরপুত্থ ও গোঠইম্বর তাহাদের দিকের নগরের দ্বারগুলিও ভাঙিয়া ফেলিয়া নগরে প্রবেশ করিল। হস্তী কণ্দুল তাহার প্রস্তুত পথ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। ॥ ৪১-৪৪ ॥

অতঃপর হস্তী কণ্দুল একটি শকটের চাকা তুলিয়া লইল, যোদ্ধা নন্দিমিত্ত সম্পূর্ণ শকটটি তুলিয়া লইল, যোদ্ধা গোঠইম্বর একটি নারিকেল বৃক্ষ উপড়াইয়া লইল, যোদ্ধা মহাসোণ একটি তালবৃক্ষ উপড়াইয়া লইল, যোদ্ধা থেরপুত্থ তাহার নিজের যষ্ঠিটি লইল এবং যোদ্ধা সুরনিমিল তাহার নিজের তরবারি লইল। এইভাবে তাহারা প্রত্যেকে নগরের বিভিন্ন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নগরে অবস্থিত দমিলগণদের ধ্বংস করিল।

॥ ৪৫-৪৬ ॥

চারি মাস যুদ্ধ করিয়া রাজা বিজিতনগর সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া গিরিলেক অঞ্চলে গিয়া দমিল গিরিলেককে হত্যা করিলেন। ইহার পর রাজা মহেলনগরে গেলেন। সেইস্থানে তিনটি পরিখা ছিল এবং কদম্ব বনে নগরটি পরিবৃত্ত ছিল। সেই নগরে প্রবেশের কেবল একটি মাত্র দ্বার, যাহা ছিল দুর্ভেদ্য। রাজা চারি মাস সেই স্থানে অবস্থান করিয়া কৌশলে[২] উক্ত নগরের সেনাপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। ॥ ৪৭-৪৯ ।

অতঃপর অনুরাধপুরের নিকটস্থ কাশ পর্বতের দক্ষিণে[৩] রাজা ছাউনি ফেলিলেন। সেইখানে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজা জল উৎসব[৪] করিলেন। সেই স্থানেই পজ্জোতনগর নামক গ্রামটি রহিয়াছে। ॥ ৫০-৫১ ॥

দমিল রাজা ইলার শুনিলেন যে রাজা দুট্ঠগামণি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তিনি অমাত্যদের ডাকিয়া বলিলেন, 'এই রাজা নিজেই একজন বীর যোদ্ধা। তাহার সহিত আরও বীর যোদ্ধাগণ আছেন। অতএব এখন কী করা উচিত।' রাজা ইলার-এর যোদ্ধাদের হইয়া যোদ্ধা দীঘযন্তু বলিল, 'মহারাজ! আমারা কল্য যুদ্ধে যাইব।' রাজা দুট্ঠগামণিও তাহার মাতার পরামর্শ লইলেন এবং সেই পরামর্শ অনুসারে রাজা বত্রিশটি সৈন্যদল প্রস্তুত করিলেন এবং কাঠের পুতুলে নির্মিত বহু গামণি রাজা ও তাঁহার ছত্রধারী প্রস্তুত করিয়া সৈন্যদলের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া নিজে সৈন্যদের অন্তঃস্থলে রহিলেন। ॥ ৫২-৫৬ ॥

রাজা ইলার পূর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার মহাপর্বত নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যখন যুদ্ধ সুরু হইল মহাবীর যোদ্ধা দীঘযতনু তাহার তরবারি ও ঢাল লইয়া যুদ্ধে নামিয়া আঠারো হাত ঊর্ধ্বে উল্লম্ফন করিয়া নামিতে রাজা দুটুঠগামণির সারিবদ্ধ কাঠের পুতুলগুলিকে এবং কাষ্ঠে নির্মিত রাজাদের, তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সকল জীবন্ত সৈনিকদের পৃথক করিয়া ফেলিল। এইবার সে সৈনিক পরিবৃত রাজা দুটুঠগামণির দিকে ধাবিত হইল। সেই সময় যোদ্ধা সুরনিমিল দীঘযনতুকে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাকে 'জন্তু' বলিয়া ভৎসনা করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবীর দীঘযনতু তাহাকে প্রথমে হত্যা করিবে মনস্থ করিয়া উচ্চে লাফাইয়া উঠিল। যোদ্ধা সুরনিমিল তাহার ঢাল উচ্চ করিয়া ধরিয়া যোদ্ধার আঘাত প্রতিহত করিতে চাহিলে দীঘযনতু ভাবিল, 'আমি প্রথমে তাহার ঢাল ও পরে তাহাকে লতার ন্যায় দ্বিখণ্ডিত করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাবীর স্বীয় তরবারি দ্বারা সুরনিমিলের উদ্ধত ঢালটিতে আঘাত করিতে গেলে, সুরনিমিল ঢালটি ছাড়িয়া দিল। ইহাতে দীঘযনতু উর্ধ্ব হইতে নামিবার বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হইল। সেই মুহূর্তে সুরনিমিল সেই ভূপতিত বীরের উপর ঝাপাইয়া বর্শা দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। যোদ্ধা ফুসসদেব শঙ্খনিনাদে ইহা ব্যক্ত করিলে দমিল সৈন্যগণ ছড়াইয়া ছিটাইয়া গেল। রাজা ইলার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া রাজা দুটুঠগামণি ভেরির শব্দে ঘোষণা করিলেন যে, কেবল তিনিই রাজা ইলারকে হত্যা করিবেন, অন্য কেহ নয়।

সেই যুদ্ধে বহু দমিল সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। পুষ্করিণীর জল রক্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সেই কারণে সেই পুষ্করিণীকে বলা হইল কুলতথ্‌বাপি'[৫]। ॥ ৫৭-৬৭ ॥

রাজা দুটুঠগামণি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কণ্‌দুল হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা ইলারকে ধাওয়া করিয়া অনুরাধপুরের দক্ষিণ দ্বারের নিকটে গিয়া পেঁাছিলেন। ॥ ৬৮ ॥

উক্ত স্থানে দুই রাজার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। রাজা ইলার তীর নিক্ষেপ করিলে রাজা দুটুঠগামণি উহা প্রতিহত করিলেন। তিনি তাঁহার কণ্‌দুল হস্তীর দীর্ঘ দন্ত দ্বারা রাজা ইলার-এর হস্তীকে বিদ্ধ করাইয়া রাজা ইলার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে রাজা ইলার হস্তীসহ সেই স্থানে মৃত্যুবরণ করিলেন। ॥ ৬৯-৭০ ॥

এইরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র লঙ্কাদ্বীপকে এক ছত্রের নীচে

যুদ্ধ করিয়া রাজা দুট্ঠগামণি চতুরঙ্গ সৈন্যসহ রাজধানী নগরে চলিলেন। সেই নগরে গিয়া ভেরির শব্দে এক যোজন অবধি দূরের জনগণকেও একত্রিত করিয়া রাজা দুট্ঠগামণি দমিল রাজা ইলারের নশ্বর দেহ সসম্মানে দাহ করিলেন। যেই স্থানে রাজা ইলার মৃত্যুবরণ করেন, সেই স্থানে একটি অস্থায়ী কাষ্ঠের বেদী প্রস্তুত করিয়া উহার উপর শবাধারটি স্থাপন করিয়া সেই অস্থায়ী কাষ্ঠের বেদীসহ রাজা ইলারের মৃতদেহসহ শবাধারটি দাহ করা হইল। সেই স্থানটিতে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া পূজ্যস্থানরূপে চিহ্নিত করা হইল। আজও লংকাদ্বীপের রাজাগণ ও অন্যান্যরা বাদ্যসহ শোভাযাত্রায় বাহির হইয়া উক্তস্থানের নিকটস্থ হইলে তাঁহারা বাদ্য থামাইয়া পূজ্যস্থানটির সম্মানার্থে মৌন থাকেন। ॥ ৭১-৭৪ ॥

রাজা দুট্ঠগামণি বত্রিশ জন দমিল রাজাকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র লংকাদ্বীপের একছত্র অধিপতি হইয়া রাজত্ব করেন। ॥ ৭৫ ॥

যখন বিজিতনগর ধ্বংস হয় তখন ইলার রাজার মহাবীর যোদ্ধা দীঘযনতু রাজা ইলারকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভল্লুক-এর বীরত্বের কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন। রাজা তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে লংকাদ্বীপে আসিতে সংবাদ[৬] পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্র পাইয়া রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ভল্লুক লংকাদ্বীপে যাইতে রওনা হইয়া রাজা ইলারের শেষকৃত্যের সাতদিন পরে ষাট হাজার সৈন্যসহ লংকাদ্বীপে পেঁছায়। ॥ ৭৬-৭৮ ॥

যদিও রাজা ইলারের মৃত্যু সংবাদ লংকাদ্বীপে অবতরণের পরেই তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তবু সেই লজ্জা ঢাকিতে তিনি সকল্প করিলেন 'আমি যুদ্ধ করিব।' তিনি মহাতিত্থ হইতে সসৈন্যে রাজধানীর দিকে রওনা হইয়া 'কোলমুবহালক[৭] নামক স্থানে ছাউনি ফেলিলেন। ॥ ৭৯-৮০ ॥

রাজা দুট্ঠগামণি এই সংবাদ পাইয়া সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পূর্ণ বর্ম পরিধান করিয়া কণ্দুল হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্যসহ রওনা হইলেন। ॥ ৮১ ॥

যোদ্ধা উম্মাদফুস্সদেব ছিলেন সমগ্র লংকাদ্বীপের পরম শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তিনি পঞ্চ অস্ত্রে[৮] সজ্জিত হইয়া অন্যান্য বীরগণের সহিত যুদ্ধে চলিলেন। ॥ ৮২ ॥

সেই প্রবল যুদ্ধ চলাকালীন ভল্লুক বর্মে সজ্জিত হইয়া রাজার প্রতি ধাবিত হইলে রাজার হস্তী কণ্দুল অতি ধীরে পিছাইয়া গেল। সৈন্যরাও হস্তীর সহিত ধীরে পিছু হটিল। ইহা দেখিয়া রাজা নিকটস্থ যোদ্ধা ফুস্সদেবকে বলিলেন, 'হে মিত্র! পূর্বের আঠাশটি যুদ্ধে এই হস্তী কখনও পিছু হটে নাই। এখন কেন এইরূপ হইল?' যোদ্ধা ফুস্সদেব বলিল 'মহারাজ! পিছনের ভূখণ্ডেই জয় সূচিত হইবে। হস্তী ইহা

বুঝিয়া সেই ভূখণ্ডের দিকেই পিছু হটিয়াছে। যেই স্থলে আপনার জয় সূচিত হইবে, হস্তী পিছু হটিয়া সেই স্থানে গিয়াই থামিবে।' ॥ ৮৩-৮৬ ॥

হস্তী কণ্দুল ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া মহাবিহারের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে, নগররক্ষাকারী দেবগণের সান্নিধ্যে আসিয়া স্থির ও দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল। ॥ ৮৭ ॥

ইহা দেখিয়া দমিল ভল্লুক সেই স্থানে আসিয়া রাজার দিকে ধাবিত হইয়া রাজাকে ধিক্কার দিল। স্বীয় তরবারী দিয়া রাজা নিজের মুখ-গহ্বর ঢাকিয়া দমিল ভল্লুককে তাহার কথার যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। ভল্লুক ভাবিল 'আমি রাজার মুখগহ্বরে তীর প্রবিষ্ট করিব।' এইরূপ ভাবিয়া সে রাজার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। সেই তীর রাজার মুখে রাখা তরবারীতে লাগিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু ভল্লুক উহা না দেখিয়া ভাবিল যে তাহার নিক্ষিপ্ত তীর রাজার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়াছে। ইহাতে সে আনন্দিত হইয়া উচ্চ রবে হা হা করিয়া চীৎকার করিতেই রাজার পিছনে হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট যোদ্ধা ফুস্সদেব তাহার তীর নিক্ষেপ করিল। সেই তীর রাজার কর্ণের দুল মৃদু স্পর্শ করিয়া ভল্লুকের হা-মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দমিল ভল্লুক ভূপাতিত হইলে তাহার পদযুগল রাজার দিকে হইবে দেখিয়া ফুস্সদেব আর একটি তীর নিক্ষেপ করিল যাহা ভল্লুকের হাঁটুতে গিয়া আঘাত করিল। ইহাতে দমিল ভল্লুক সামনের দিকে ভূমিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মস্তক রাজার দিকে হইল। তাহার মৃত্যুতে চারিদিকে জয়ের উল্লাস ধ্বনিত হইল। ॥ ৮৮-৯৩ ॥

নিজের দোষ স্খলনের জন্য ফুস্সদেব তাহার কানের একটি লতি কাটিয়া রাজাকে দেখাইল। কান দিয়া রক্ত ঝরিতেছে দেখিয়া রাজা বিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যোদ্ধা ফুস্সদেব বলিলেন 'মহারাজ! আমি নিজের উপর রাজদণ্ড প্রদান করিয়াছি।' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্র! তোমার কী অপরাধে এইরূপ করিলে?' ফুস্সদেব বলিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার কর্ণের দুলে তীরের স্পর্শ দিয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'হে মিত্র! উহা কোন অপরাধই নয়। তুমি কেন বিনা অপরাধে নিজেকে এইরূপে শাস্তি দিলে?' রাজা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বলিলেন 'তোমার মহান তীরের ন্যায় তোমার এই ক্ষতিপূরণ প্রদানও মহান।' ॥ ৯৪-৯৭ ॥

রাজা দুট্ঠগামণি রাজ্যের সকল দমিলদের হত্যা করিয়া যুদ্ধজয়ের পর, রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজদরবারে বসিয়া সকল অমাত্যদের এবং সভাসদদের সম্মুখে যোদ্ধা ফুস্সদেবের একটি শর আনয়ন করিলেন। সেই শর

রাজদরবারের সভাতলে গাঁথিয়া, দীর্ঘ শরটির নীচ হইতে উপর পর্যন্ত রাজা স্তূপাকার কাহাপনে[৯] ঢাকিয়া দিলেন। সেই মুদ্রা রাজা ফুসসদেবকে প্রদান করিলেন। ॥ ৯৮-১০০ ॥

অতঃপর আলো ও সুগন্ধজাত দ্রব্যে সজ্জিত রাজপ্রাসাদের ছাদে অপ্সরাগণের ন্যায়, রাজনর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নরম, কোমল, মূল্যবান আচ্ছাদন যুক্ত আরামপ্রদ আসনে রাজা দেহ এলাইয়া দিয়া বিগত নানা যুদ্ধের ও বিজয়ের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দের পরিবর্তে বিমর্ষ হইলেন[১০]। তিনি ভাবিলেন, কতই না ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে। কত অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ॥ ১০১-১০৩ ॥

পিয়ংগুদ্বীপের অর্হতগণ রাজার এইরূপ ভাবনার কথা অবগত হইয়া সত্বর আটজন অর্হত ভিক্ষুদের রাজাকে সান্ত্বনা দিতে পাঠাইলেন। রাত্রির মধ্যযামে তাঁহারা রাজপ্রাসাদের দ্বারে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা শূন্যে ভাসিয়া আসিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত করিতে তাঁহারা প্রাসাদের ছাদে গিয়া উঠিলেন।

রাজা তাঁহাদের দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সম্মানে আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে রাজা তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ! পিয়ংগুদ্বীপের ভিক্ষুসংঘ আমাদের পাঠাইয়াছেন আপনাকে সান্ত্বনা দিতে।' ইহাতে রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! কীরূপে আমি সান্ত্বনা লাভ করিব। আমি যে বহুসংখ্যক মানুষকে হত্যা করিয়াছি। সংখ্যায় উহা কোটিরও অধিক হইবে।' ॥ ১০৪-১০৮ ॥

ইহা শুনিয়া অর্হত ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! উক্ত কর্মে স্বর্গের দ্বার আপনার জন্য রুদ্ধ হইবে না। আপনি কেবল মাত্র একজন এবং এক অর্ধ মানুষ হত্যা করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল একজন ব্যক্তি ত্রিশরণ লইয়াছিলেন এবং আর একজন কেবল পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত বাকি মৃতেরা সকলেই ছিল বিধর্মী ও পাপী। উহারা পশুর সমান।[১১] তাছাড়া, আপনি নানাভাবে বুদ্ধের ধর্মের খ্যাতি বৃদ্ধি করিবেন। অতএব মহারাজ! মন হইতে দুঃচিন্তা দূর করুন।'

॥ ১০৯-১১১ ॥

এই কথা শুনিয়া রাজা সান্ত্বনা পাইলেন। ভিক্ষুগণ প্রস্থান করিলে রাজা তাঁহাদের সসম্মানে বিদায় দিয়া পুনরায় আসনে দেহ এলাইয়া দিয়া ভাবিলেন, 'আমার মাতা পিতা শৈশবে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, ভিক্ষুসংঘকে প্রথমে না দিয়া নিজে কখনও কিছু আহার করিবে না। আমি কি কখনও তাহা অমান্য করিয়াছি?' তখন রাজা চিন্তা করিয়া দেখিলেন

যে, তিনি একবার ভিক্ষুসংঘকে কিছু না দিয়া প্রাতঃরাশে বসিয়া একটি গোলমরিচ মুখে দিয়াছিলেন।

রাজা ভাবিলেন, 'পূর্বকৃত এই কর্মের জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত[১৬] করিতে হইবে।' ॥ ১১২-১১৫ ॥

যে মানুষ নিজের বাসনার বশে অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, সে যদি ইহা চিন্তা করে এবং ইহাতে উদ্ভূত পাপের কথা চিন্তা করে, যদি চিন্তা করে যে সেও মরণশীল, তবে কি সে এইরূপ কর্মের কারণে ক্ষণিকের জন্যও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হইবে? ॥ ১১৬ ॥

রাজা দুট্‌ঠগামণির যুদ্ধ বিজয় সমাপ্ত

এইখানে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'রাজা দুট্‌ঠগামণির যুদ্ধবিজয়'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. টীকাকার বলেছেন যে রাজা গামণি তাঁহার প্রতিপক্ষের দলনেতার সহিত তাঁহার বিধবা মাতার পুনরায় বিবাহ দিবেন এবং এই আশায় তিনি তাঁহার মাতাকে সঙ্গে আনিয়াছেন। রাজা এই মিথ্যা প্রস্তাবটি অপরপক্ষের শিবিরে পৌঁছাইলে দমিলরা ভাবিল যে, এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজা গামণির রাজ্যও তাঁহার মাতার মারফত তাহারা অধিকার করিতে পারিবে। অতঃপর বিপক্ষের দমিল নেতা রাজা গামণির প্রস্তাব মানিয়া আর যুদ্ধ করিল না।

২. মহেল নগর চার মাস ধরে রাজা গামণি অবরোধ করে রাখেন। রসদ ও পানীয় জলের অভাবে মরণাপন্ন সৈনিকরা বাধ্য হয়ে সেনাপতির মাধ্যমে রাজা গামণির নিকট আত্মসমর্পণ করে। রাজা গামণি সকল দমিলদের হত্যা করেন।

৩. দোল উৎসবের মতো এই জল উৎসব। রঙ না দিয়ে একে অন্যের গায়ে সুগন্ধি জল নিক্ষেপ করে। শ্রীলংকা, কাম্বোডিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশে আজও এই উৎসব হয়।

৪. স্থানটি অনুরাধপুর থেকে আঠারো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

৫. 'কুলতথবাপি' শব্দের অর্থে এক টীকাকার বলেছেন 'কুলের ক্ষয় বা সমাপ্তি'।

৬. সংবাদ কীরূপে পাঠালো, মূল গ্রন্থে তা না থাকলেও টীকাকার 'তসস' শব্দের সঙ্গে 'লেখসন্দেসং' শব্দটি যুক্ত করেছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, যে চিঠির মারফত সংবাদনটি কারও হাত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

৭. স্থানটি ছিল অনুরাধপুর নগরের উত্তর দ্বারের কাছে।

৮. পঞ্চ অস্ত্র হলো, তরবারী, ধনুক, কুড়োল, বর্শা ও ঢাল।

৯. প্রাচীন চতুষ্কোণ তামার মুদ্রা। অনুমান ওজন ছিল ৯.৪৮ গ্রাম (**Rapson, Indian Coins, P. 2**)।

১০. সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের পরের অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। রাজা গামণি ত্রিরত্নে শরণ নিয়েও যুদ্ধ করেছিলেন। সম্রাট অশোকও কি তবে বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণের পর কলিঙ্গের যুদ্ধে নেমেছিলেন? অনেক ঐতিহাসিক কিন্তু তাই বলেন। খুব সম্ভবত সেই কারণে সম্রাট অশোকের অনুশোচনা এতো প্রবল ছিল। রাজা গামণির অনুশোচনা অনেকটা উক্ত সম্রাটের মতোই। হয়তো এই রাজার অনুশোচনার চিত্রটি সম্রাট অশোকের অনুশোচনার প্রতিবিম্ব।

১১. অর্হত ভিক্ষুগণের এই উক্তিটি খুবই ক্ষতিকর। এর মধ্যে মৌলবাদের ইঙ্গিত রয়েছে যা কোন অর্হত ভিক্ষুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বিদেশী উপনিবেশকারীদের উচ্ছেদ করা এক কথা, কিন্তু বিধর্মীদের খুন করা দোষের নয়, পাপীদের খুন করা দোষের নয়, এবং তারা পশুর সমান বলে পশু হত্যাকেও নির্দোষ বলা, এইসব কিন্তু বুদ্ধের ধর্মের আদর্শ নয়। গ্রন্থকার এইখানে বুদ্ধের ক্ষমা-ধর্মের বিকৃতি করে প্রাণীহত্যাকে ধর্মীয় জেহাদের রূপ দিয়ে হত্যাকে ন্যায়রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। এখানে বুদ্ধের ধর্মের বরং বিনাশই করা হয়েছে। যুদ্ধ করে বিধর্মীদের হত্যা করলে স্বর্গের দ্বার সেই কারণে রুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারে। বুদ্ধ কি কখনও এইসব বলেছেন? দুঃখের বিষয়, এইসব জঘন্য কট্টরপন্থি ভুল মতবাদ অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুদের মাধ্যমে বলিয়ে প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বে প্রচার করে বুদ্ধের সঠিক ধর্মের হানিই করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় আজও কোন টীকাকার এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। এমন কি বুদ্ধঘোষও এইবিষয়ে নীরব। এই লাইন কটি কি মূল গ্রন্থে ছিল? না পরে ঢোকানো হয়েছে, বলা মুস্কিল।

১২. অন্য ধর্মে থাকলেও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বৌদ্ধধর্মে নেই।

২৬

মরিচভট্টি বিহার উৎসর্গ

যখন সেই সুবিখ্যাত রাজা সমগ্র লঙ্কাদ্বীপকে একটি রাজ্যে পরিণত করিলেন, তখন তিনি তাঁহার খ্যাতিমান যোদ্ধাগণকে তাঁহাদের উপযুক্ততা অনুসারে বিশেষ বিশেষ পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু যোদ্ধা থেরপুত্তাভয় তাঁহাকে প্রদত্ত পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাজা ইহার কারণ জানিতে চাহিলে সেই যোদ্ধা বলিলেন, 'মহারাজ! আমি যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে চাই।' রাজা বলিলেন, 'হে মিত্র! যখন সমগ্র লঙ্কাদ্বীপ একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কোথায়?' যোদ্ধা থেরপুত্তাভয় বলিলেন, 'মহারাজ! যে সকল বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।' রাজা যোদ্ধাকে বারবার যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে বলিলে যোদ্ধা থেরপুত্তাভয় রাজার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তিনি যথাসময়ে অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন, এবং পাঁচশত অর্হত ভিক্ষুগণের সহিত পঞ্জলি পর্বতে অবস্থান করিলেন। ॥ ১-৫ ॥

ভয়শূন্য রাজার সপ্তাহকাল ধরিয়া মহাসমারোহে অভিষেক উৎসব সমাপ্ত হইলে, রাজা উৎসবে সজ্জিত তিষ্য-পুষ্করিণীতে গেলেন যেখানে প্রথামত অভিষিক্ত রাজাগণের জন্য মহাসমারোহে উৎসব হইত। সেই স্থানে রাজাকে বহুশত উপহার প্রদান করা হইল। এইস্থানে পরে মরিচভট্টি বিহার স্থাপন করা হয়। পরে যেখানে স্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, সেইখানে রাজার অনুচরগণ রাজার ধ্বজা প্রোথিত করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া রাজা রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের সহিত পুষ্করিণীতে জলক্রীড়ায় চিত্ত বিনোদন করিয়া আসন্ন সন্ধ্যায় রাজা জল হইতে উঠিয়া বলিলেন, 'এইবার আমরা প্রাসাদে ফিরিব। আমার ধ্বজাটি আমাদের সম্মুখভাগে রাখিয়া বহন কর।' ॥ ৬-১০ ॥

কিন্তু ধ্বজাধারী রাজার অনুচর সেই ধ্বজা ভূমি হইতে তুলিতে পারিল না। তখন রাজার সৈন্যগণ সুগন্ধ দ্রব্য ও ফুল মালা ইত্যাদি সেই স্থানে ছড়াইয়া দিল। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন। তিনি উহার পাহারার ব্যবস্থা করিয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। পরে রাজা সেই ধ্বজার উপর স্তূপ স্থাপন করিলেন এবং সেই স্তূপকে ঘিরিয়া বিহার নির্মাণ করিলেন। ॥ ১১-১৩ ॥

তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত বিহারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে, রাজা

বিহারের উৎসর্গ উৎসবে ভিক্ষুসংঘকে সেই স্থানে আমন্ত্রণ করিলেন। দশ সহস্র ভিক্ষুগণ ও নব্বই হাজার ভিক্ষুণীগণ সেই উৎসবে উপস্থিত হইলেন। সেই মহতী সমাবেশে রাজা ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হে ভন্তে! আপনাদের প্রথমে দান প্রদান না করিয়া আমি প্রাতঃরাশে বসিয়া একটি গোলমরিচ মুখে দিয়াছিলাম। সেই পূর্বকৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি এই মনোরম মরিচভট্টি[1] বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করিলাম। ভিক্ষুসংঘ যেন আমার এই দান গ্রহণ করেন।' ।। ১৪-১৮ ।।

এই বলিয়া রাজা জল ঢালিয়া উক্ত দান উৎসর্গ করিয়া বিহার ও চৈত্য ভিক্ষুসংঘকে দান-স্বরূপ প্রদান করিলেন। উক্ত বিহারের চতুর্দিকে রাজা একটি বিশাল গোলাকৃতির হলঘর নির্মাণ করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন সেই হলঘরে ভিক্ষুসংঘকে প্রচুর পরিমাণে দানাদি প্রদান করা হয়। সেই হলঘরটি এত বিশাল ছিল যে উহার কিছু থাম ছিল নিকটস্থ অভয়-পুষ্করিণীর মধ্যে। বাকি অংশের কথা আর কী বলিব। ।। ১৯-২০ ।।

সপ্তাহকাল ধরিয়া রাজা সেই হলঘরে ভিক্ষুসংঘকে খাদ্যপানীয় ও অন্যান্য বহু মূল্যবান, ভিক্ষুগণের প্রয়োজনীয়, বস্তুসকল প্রদান করিলেন। ভিক্ষুগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। রাজা উক্ত দানাদির জন্য একশত-সহস্র কাহাপন খরচ করিলেন। ।। ২১-২২ ।।

মহাজ্ঞানী রাজা যুদ্ধে জয়ের কারণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, নির্মল চিত্তে, ত্রিরত্নের[2] প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, ধর্মের খ্যাতি বর্ধনের জন্য ত্রিরত্নের সম্মানার্থে, স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করিয়া এবং উহার উৎসর্গ উৎসব করিয়া, বহুমূল্য দানসকল বাদ দিয়াও উক্ত স্থানে উনিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিলেন। ।। ২৩-২৫ ।।

ধনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, যাহা পাঁচপ্রকার ভয়ের[3] উদ্রেক করে, মহান রাজা পঞ্চপ্রকার সুবিধার্থে[4] প্রাপ্ত ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন পার্থিব ধন দানস্বরূপ প্রদান করিয়া বহুমূল্যবান শান্তিসুখ ও মহাপুণ্য অর্জন করিলেন। জ্ঞানীগণ এইরূপ সম্পদ[5] প্রাপ্তির জন্য যেন সর্বদা সচেষ্ট হন। ।। ২৬ ।।

মরিচভট্টি বিহার উৎসর্গ সমাপ্ত

এইখানে ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'মরিচভট্টি বিহার উৎসর্গ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. মরিচভট্টি শব্দের অর্থ হলো 'গোলমরিচের প্রতি বাসনা'।
২. ত্রিরত্ন হলো—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ।
৩. ধন হতে উৎপন্ন পাঁচপ্রকার ভয় হলো—চুরির ভয়, জল বা বন্যার ভয়, অগ্নির ভয়, প্রাণীতে ক্ষতির ভয় ও তস্করূপের ভয়। এই পাঁচ প্রকারে ধন-সম্পত্তির ক্ষতি বা নাশ হতে পারে। ধন-সম্পত্তি থাকলে এইসব ভয় থাকে।
৪. ধন-সম্পত্তিতে যে পাঁচ প্রকার সুবিধা থাকে, তা হলো—খ্যাতি, সম্মান, প্রতিপত্তি, কর্তব্য পূরণে তৃপ্তি, ও দানাদি করার ক্ষমতা।
৫. সুখ-শান্তি ও পুণ্যলাভ ইত্যাদিকে সম্পদ বলা হয়েছে।

২৭
লোহপাসাদ উৎসর্গ

অতঃপর রাজা তাঁহার ঐতিহ্যময় বংশের প্রাচীন রাজাদের কথা মনে করিয়া ভাবিলেন, একসময় এক পুণ্যবান ভিক্ষু, যিনি এই দ্বীপে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, শুভকর্মের উদ্দেশ্যে আমার এক পূর্বপুরুষ রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'হে মহারাজ! আপনার রাজবংশে রাজা দুট্ঠগামণির আবির্ভাব হইবে। সেই মহাজ্ঞানী রাজা সুবর্ণ মালায় ভূষিত একটি বিশাল স্তূপ ও সম্মেলনআগার নির্মাণ করিবেন। সম্মেলনআগারের উচ্চতা হইবে একশ কুড়ি হস্ত। অসংখ্য মণিমাণিক্যে খচিত নয়তলা উচ্চ আগারটিকে বলা হইবে 'লোহপাসাদ'। ॥ ১-৪ ॥

রাজার মনে উক্ত চিন্তার উদয় হইলে তিনি রাজপ্রাসাদের সিন্দুক তল্লাসি করিয়া একটি সোনার থালা পাইলেন। সেই থালায় এই কথা খোদাই করা রহিয়াছে। রাজা সেই লিপি উচ্চস্বরে পাঠ করিলেন। 'একশত ছত্রিশ বৎসর পরে, ভবিষ্যতে, রাজা কাকবর্ণের সুযোগ্য পুত্র দুট্ঠগামণি এই এই জিনিষ এই এই ভাবে নির্মাণ করিবেন।' রাজা এই প্রাচীন লিপি পড়িয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া হাততালি দিয়া উঠিলেন। ॥ ৫-৮ ॥

পরদিন প্রত্যূষে রাজা মনোরম মহামেঘ উদ্যানে গিয়া সম্মিলিত ভিক্ষুগণকে বলিলেন, 'আমি আপনাদের জন্য দেবতাদের প্রাসাদের ন্যায় একটি সম্মেলন আগার[১] নির্মাণ করিব। আপনারা কেহ দেবলোকের প্রাসাদের নক্‌সা আনিয়া দিন।' ইহা শুনিয়া ভিক্ষুসংঘ আটজন অর্হত ভিক্ষুগণকে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ॥ ৯-১০ ॥

কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে অশোক নামের এক ব্রাহ্মণ তাহার গৃহের পরিচারিকা বিরাণীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন শতকর্মের মধ্যেও প্রতিদিন ভিক্ষুগণকে খাদ্য দিয়া আসে। এইরূপে সে যেন পরপর আটদিন ধরিয়া খাদ্য প্রদান করে। সেই পরিচারিকা কেবল আটদিন নয়, সারা জীবন ধরিয়া ভিক্ষুগণকে খাদ্য প্রদান করে। এই পুণ্যের ফলে পরিচারিকা বিরাণী মৃত্যুর পর এক সুন্দরী যুবতী হইয়া স্বর্গের উজ্জ্বল এক প্রাসাদে হাজার অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হইয়া বিরাজ করে। তাহার সেই মণিমুক্তা খচিত প্রাসাদটি ছিল বারো যোজন উচ্চ এবং আটচল্লিশ যোজন পরিবৃত। নয়তলা সেই প্রাসাদে ছিল আলোকোজ্জ্বল হাজারটি কক্ষ যাহার ছিল হাজার অভিক্ষিপ্ত বাতায়ন। প্রতিটি কক্ষ ছিল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। চারি দেওয়ালে ছিল শঙ্খের মালা। বাতায়নগুলি ছিল

কক্ষগুলির নয়ন সদৃশ। কক্ষগুলির অভিক্ষিপ্ত জানলার কার্নিসের থামের উপর ছোট ছোট ঘণ্টা দুলিত। প্রাসাদের মধ্যস্থলে ছিল আমের চারাগাছ সম্বলিত উন্মুক্ত বাগান। সেই সকল গাছে সরু ও লম্বা বহু বর্ণের পতাকা ঝুলিত। ॥ ১১-১৭ ॥

অর্হত ভিক্ষুগণ তাবতিংশ দেবলোকে গিয়া উক্ত প্রাসাদটি দেখিয়া উহার নক্সা সাদা কাপড়ে লাল রঙ দিয়া আঁকিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া উহা ভিক্ষুসংঘকে দেখাইলেন। ॥ ১৮-১৯ ॥

ভিক্ষুসংঘ সেই নক্সাটি রাজার নিকট পাঠাইলেন। রাজা সেই নক্সা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেইরূপ লোহপাসাদ নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। ॥ ২০ ॥

উক্ত প্রাসাদ নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইলে মহানুভব রাজা নির্দেশ দিলেন যে আটশত সহস্র মুদ্রা যেন প্রাসাদের চারিটি প্রবেশদ্বারের ভূমিতে রাখা হয়। সেইরূপ প্রতিটি দ্বারে পোষাক-পরিচ্ছদের বাণ্ডিল, কলসপূর্ণ মধু, গুড়, তৈল, সর্করা প্রভৃতি যেন রাখা হয়। রাজা ঘোষণা করিলেন যে, বিনা পারিশ্রমিকে কেহ যেন শ্রম না করে। রাজা শ্রমিকগণকে তাহাদের কার্য সমাপ্তির পর উক্ত জিনিষগুলি মজুরি হিসাবে প্রদান করিলেন। ॥ ২১-২৩ ॥

চতুষ্কোণ বিশিষ্ট সেই প্রাসাদটি ছিল প্রতিটি দিকে একশত হস্ত দীর্ঘ। উচ্চতাও ছিল সেইরূপ। এই পরম রমণীয় প্রাসাদটি ছিল নবমতল বিশিষ্ট। প্রতিটি তলায় ছিল একশত অভিক্ষিপ্ত বাতায়ন সম্বলিত কক্ষ। প্রতিটি বাতায়ন ছিল রৌপ্য ও প্রবালে আচ্ছাদিত কার্নিস সংযুক্ত ও মণিমুক্তা খচিত। কার্নিসে ছিল নানা মণিমাণিক্যের প্রস্ফুটিত কমল। কার্নিসের চারদিকে ছিল ঝুলন্ত রৌপ্য ঘণ্টার সারি। ॥ ২৪-২৭ ॥

প্রাসাদটিতে ছিল সুবিন্যস্ত, মণিমাণিক্য খচিত, বাতায়নযুক্ত এক হাজারটি কক্ষ। বেস্সবনের[২] রথের কথা রাজা শুনিয়াছিলেন যাহাতে মহিলাগণ ভ্রমণ করিতেন। রাজা সেই রথের অনুরূপ একটি রত্নখচিত তাঁবু প্রাসাদের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। উহার স্তম্ভগুলিতে ছিল দামি পাথর বসানো। স্তম্ভগুলিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি এবং দেবতাগণের ন্যায় প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হইল। উক্ত তাঁবুর কাপড়ের পাড় ছিল মুক্তা ও প্রবালের মালায় গাঁথা। এইরূপে তাঁবুটি বেদিকার ন্যায় সজ্জিত হইল। ॥ ২৮-৩১ ॥

উক্ত তাঁবুর মধ্যে ছিল হস্তীদন্তের, সপ্তরত্ন সম্বলিত অপরূপ একটি সিংহাসন, যাহার আসনটি ছিল স্বচ্ছ পাহাড়ী-স্ফটিকে নির্মিত। সিংহাসনের পশ্চাত ভাগে অঙ্কিত ছিল সুবর্ণের সূর্য, রৌপ্যের চন্দ্র,

মুক্তার তারকা এবং নানা রঙের প্রস্ফুটিত কমল। আর ছিল কিছু কিছু জাতকের কাহিনী-চিত্র ও সুবর্ণ পতাকার চিত্র। ॥ ৩২-৩৪ ॥

অপরূপ মনোরম উক্ত সিংহাসনে মূল্যবান নরম তাকিয়া রাখা হইল। উজ্জ্বল শুভ্র হস্তীদন্তের পাখা ও প্রবালের বাটযুক্ত শ্বেতশুভ্র ছত্র রাখা হইল। পাহাড়ী-স্ফটিকের বেদীতে প্রোথিত রৌপ্য ধ্বজদণ্ডটি সিংহাসনের উপরেও দেখা যাইত। সেই দণ্ডটিতে ছিল সপ্তরত্ন খচিত আটটি মঙ্গলকর পবিত্র বস্তুর[৩] প্রতিকৃতি ও মণিমুক্তার ফাঁকে ফাঁকে ছিল জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি। ছত্রের চারিধারে ছিল ঝুলন্ত ঘণ্টা।

উক্ত প্রাসাদ, সিংহাসন, তাঁবু ও ছত্র ছিল মূল্যাতীত। ॥ ৩৫-৩৮ ॥

এই প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে ভিক্ষুগণের গুরুত্ব অনুসারে রাজা অনুরূপ বিছানা, কেদারা ও গালিচার ব্যবস্থা করিলেন। মুখ ধুইবার পাত্র ও হাতা প্রভৃতিও ছিল সুবর্ণ নির্মিত। প্রাসাদের অন্যান্য থালা-বাসন সম্বন্ধেও কী কিছু আর বলিতে হইবে? ॥ ৩৯-৪০ ॥

প্রাসাদটি ছিল সুন্দরভাবে পরিবেষ্টিত। উহার চারিদিকে ছিল চারিটি প্রবেশ দ্বার। চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল এই প্রাসাদটি যেন তাবতিংশ দেবলোকের কোন সভাগৃহ। প্রাসাদের বাহির দেওয়ালগুলি ছিল তামার পাতে ঢাকা। এই কারণে ইহা 'তাম্রপ্রাসাদ' নামেও খ্যাত হইল।

॥ ৪১-৪২ ॥

এই 'লোহপাসাদ' নির্মিত হইয়া গেলে রাজা ভিক্ষুসংঘকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ভিক্ষুগণ পূর্বে যেমন বিহার উৎসর্গকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সকলে এইবারও উক্ত প্রাসাদ স্থলে একত্রিত হইলেন।

॥ ৪৩ ॥

যাহারা ছিল সাধারণ পর্যায়ের[৪] মানুষ, তাহারা প্রাসাদের নীচের তলায় গেলেন আর সাধারণ ভিক্ষুরা প্রথম তলে গেলেন। যাঁহারা ছিলেন ত্রিপিটকজ্ঞ ভিক্ষু তাঁহারা প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে গেলেন। আর যাঁহারা স্রোতপত্তি প্রাপ্ত ও অন্যান্য ধাপে উন্নিত ভিক্ষু, তাঁহারা যথাক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলে গেলেন। নবমতলের বাকি চারিটি তলে গেলেন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ। এইরূপে প্রাসাদের কক্ষগুলি ভিক্ষুগণের বাসের জন্য বিভক্ত হইল। ॥ ৪৪-৪৫ ॥

রাজা যথারীতি জল ঢালিয়া উক্ত প্রাসাদটি ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করিলেন। ইহার পর সপ্তাহকাল অবধি রাজা ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল দান করিলেন। মহানুভব রাজা এইরূপে, মূল্যাতীত বিষয় সকল বাদ দিয়াও, ত্রিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিলেন। ॥ ৪৬-৪৭ ॥

যে সকল জ্ঞানীগণ স্বীয় ব্যবহারের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করাকে মূল্যহীন জ্ঞান করিয়া দানাদিকে মূল্যবান জ্ঞান করেন, তাঁহারা এইরূপে মুক্ত চিত্তে, জীবের হিতার্থে প্রচুর দানাদি প্রদান করেন। ॥ ৪৮ ॥

লোহপাসাদ উৎসর্গ সমাপ্ত

এইখানে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'লোহপাসাদ উৎসর্গ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. সভাগৃহ সহ ভিক্ষুদের অবস্থানের কক্ষযুক্ত আগার।
২. কুবের।
৩. অষ্টমঙ্গল। বৌদ্ধ অষ্টমঙ্গল চিহ্ন হলো,—সিংহ, বৃষ, হস্তী, কলস, পাখা, পতাকা বা দণ্ড, শঙ্খ ও প্রদীপ।
৪. মূলে এইখানে 'পৃথুজ্জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থে 'ভিক্ষু' বোঝায় না। বিষয়াসক্ত সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকেই বোঝায়। তারা ছিল ভিক্ষুদের পরিচারকমণ্ডলী, যারা ভিক্ষুদের দেখাশোনা করতো। কিন্তু **Geiger** সাহেব তাদেরও 'ভিক্ষু' বলেছেন। মূলের প্রতি নিবন্ধ থেকে এই অনুবাদে তাদের ভিক্ষু বলা হয়নি। তাদের অবস্থান ছিল নীচের তলার একশত কক্ষে। একতলা থেকে নয়তলা পর্যন্ত নয়'শটি কক্ষে ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের ভিক্ষুরা, আর বাকি নীচের তলায় এক'শটি কক্ষে ছিল পরিচারকরা। এটাই ছিল এক হাজার কক্ষের সঠিক হিসাব।

২৮

মহাস্তূপ নির্মাণের সামগ্রী প্রাপ্তি

রাজা দুট্‌ঠগামণি শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহাবোধি বৃক্ষের লংকাদ্বীপে আগমনের দিনটি মহাসমারোহে উক্ত বৃক্ষের নীচে উদ্‌যাপন করিলেন। নগরের মধ্য দিয়া যাইবার কালে তিনি মহাস্তূপ নির্মিত হইবার স্থানে কিছু শিলা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সেই প্রাচীন ভবিষ্যত বাণীটি স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, 'আমি এইস্থানে মহাস্তূপটি নির্মাণ করিব।' ॥ ১-২ ॥

রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে আরামপ্রদ আসনে রাজা দেহ এলাইয়া দিয়া চিন্তা করিলেন, 'দমিলদের পরাস্ত করিতে যুদ্ধে নগরবাসীগণের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। অতএব এখন আর তাহাদের উপর কর বসানো যাইবে না। অথচ কর ছাড়া এই মহাস্তূপ নির্মাণের সামান্য ইষ্টকও প্রস্তুত করা যাইবে না।' ॥ ৩-৫ ॥

রাজার উক্ত চিন্তা ছত্রধর দেবগণ জ্ঞাত হইলে তাঁহাদের মধ্যে মহা সোরগোল উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা দেখিয়া বিশ্বকর্মাকে[১] ডাকিয়া বলিলেন, 'রাজা গামণি স্তূপ নির্মাণের জন্য ইষ্টকের প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। আপনি উক্ত নগরের এক যোজন দূরে গম্ভীর গ্রামের কদম্ব নদীর কূলে এই ইষ্টক প্রস্তুতের ব্যবস্থা করুন।' ॥ ৬-৭ ॥

দেবরাজ ইন্দ্রের উক্ত নির্দেশে বিশ্বকর্মা সেই স্থানে গিয়া ইষ্টক নির্মাণ করাইলেন। ॥ ৮ ॥

পরদিন প্রত্যুষে এক ব্যাধ তাহার শিকারী কুকুর লইয়া বনে শিকার করিতে বাহির হইলে, বনদেবতা একটি গোসাপের ছদ্মবেশে ব্যাধকে দেখা দিলেন। ব্যাধ সেই গোসাপকে শিকার করিতে উহার পশ্চাদানুসরণ করিলে গোসাপ ব্যাধকে তাহার পিছু পিছু সেই ইষ্টকের স্থানে লইয়া গিয়া অদৃশ্য হইলেন। ব্যাধ উক্ত স্থানে নবনির্মিত ইষ্টকসকল দেখিয়া ভাবিলেন, 'রাজা মহাস্তূপ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছেন। এই সকল ইষ্টক সেই কাজে লাগিতে পারে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যাধ রাজাকে এই সংবাদটি প্রদান করিলেন। মঙ্গলময় রাজা ব্যাধের মুখে নবনির্মিত ও পরিত্যক্ত ইষ্টক সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই ব্যাধকে পুরস্কৃত করিলেন। ॥ ৯-১২ ॥

নগরের উত্তর-পূর্ব দিকে, তিন যোজন দূরে 'আচারভিটঠিগ্রাম-এর নিকটে ষোল করিশ[২] বিস্তৃর্ণ এলাকায় অসংখ্য নানা আকারের স্বর্ণপিণ্ডের

আবির্ভাব হইল। সেই সকল স্বর্ণপিণ্ড, কোনটা এক বিঘত দীর্ঘ আর কোনটা এক আঙুল দীর্ঘ। উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিস্তীর্ণ স্বর্ণভূমি দেখিয়া উহার কিছু পিণ্ড পাত্রে করিয়া রাজার নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া বিষয়টি তাঁহার অবগত করিলেন। ॥ ১৩-১৫ ॥

নগরের পূর্ব দিকে, সাত যোজন দূরে, অম্বপিট্‌ঠ গ্রামের নিকটে নদীর অপর পারে, তাম্রের আবির্ভাব হইল। উক্ত স্থানের অধিবাসীগণ কিছু তাম্রপিণ্ড সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট লইয়া গিয়া দেখাইয়া বিষয়টি তাঁহাকে অবগত করিলেন। ॥ ১৬-১৭ ॥

নগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, চারি যোজন দূরে, সুমনভাপি গ্রামের নিকটে বহু মূল্যবান মণিরত্নের উদ্ভব হইল। গ্রামবাসীগণ একটি পাত্রে কিছু রত্ন, যাহা নীলকান্ত মণি ও পদ্মরাগ মণি, লইয়া রাজার নিকট গিয়া দেখাইয়া বিষয়টি তাঁহাকে অবগত করিলেন। ॥ ১৮-১৯ ॥

নগরের দক্ষিণ দিকে আট যোজন দূরে, অম্বট্‌ঠকোল গ্রামের পর্বতের গুহায় রৌপ্যের আবির্ভাব হইল। নগরের এক বণিক বহু শকটসহ নগর হইতে বাহির হইয়া মলয় প্রদেশ* হইতে হলুদ, আদ্রক ইত্যাদি আনিতে যাইতেছিলেন। তাহার হাতল দেওয়া কিছু কশার প্রয়োজন হইলে বণিক শকটগুলি উক্ত গুহার অনতিদূরে রাখিয়া শুষ্ক কাষ্ঠের সন্ধানে উক্ত পাহাড়ে উঠিল। তিনি সেই পাহাড়ে একটি বদরী গাছের শাখায় কলসের ন্যায় প্রকাণ্ড একটি কুল ঝুলিতেছে দেখিলেন। সেই ফলের ভারে শাখাটি নুইয়া পড়িয়াছে এবং ফলটি একটি শিলাখণ্ডের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। বণিক নিকটে গিয়া ফলটিকে স্পর্শ করিয়া বুঝিলেন যে উহা অতি পক্ক ফল। তিনি ছুরি দিয়া ফলটিকে শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ॥ ২০-২৩ ॥

বণিক মনস্থ করিলেন যে, সেই ফলের কিছু অংশ তিনি প্রথমে দান স্বরূপ প্রদান করিবেন। এইরূপ ঠিক করিয়া বণিক আহারের সময় ঘোষণা করিলেন। সেই মুহূর্তে চারিজন অর্হত ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল। বণিক তাঁহাদের সসম্মানে সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। অর্হত ভিক্ষুগণ আসন গ্রহণ করিলে, বণিক সেই ফলের নীচের দিকের অংশটি ছুরি দিয়া কাটিয়া উহার সুমিষ্ট রসে ভিক্ষুগণের চারিটি ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিলেন। ভিক্ষুগণ সন্তুষ্ট হইয়া ভিক্ষাপাত্র লইয়া আসন ত্যাগ পূর্বক অদৃশ্য হইলেন। ॥ ২৪-২৬ ॥

বণিক পুনরায় আহারের কাল ঘোষণা করিলেন। তখন আরও চারিজন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল। বণিক এই চারিজন ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র ফলের শাস দিয়া পূর্ণ করিলেন। ভিক্ষুগণ উক্ত দানে সন্তুষ্ট হইলেন

এবং তিনজন ভিক্ষু প্রস্থান করিলেও বাকি একজন ভিক্ষু উক্ত স্থানে রহিয়া গেলেন। এই ভিক্ষু বণিককে রৌপ্যে পূর্ণ পর্বতের গুহাটি দেখাইবার মানসে, উঠিয়া গিয়া উক্ত গুহার নিকটে বসিয়া প্রদত্ত দান আহার করিতে লাগিলেন। বণিকও স্বীয়স্থানে বসিয়া ফলের কিছুটা শাস আহার করিয়া অবশিষ্ট অংশটি তাহার কাঁধের পুটলির মধ্যে রাখিয়া, স্থানত্যাগ পূর্বক উক্ত ভিক্ষুর চলার পথ ধরিয়া নীচের দিকে চলিলেন। কিছুদূর গিয়া সেই ভিক্ষুকে বণিক দেখিতে পাইলে, তিনি ভিক্ষুকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ভিক্ষু তখন সেই রৌপ্যপূর্ণ গুহার মুখটিতে যাইবার পথটি বণিককে দেখাইয়া বলিলেন, 'হে সুধী! এখন এই পথ ধরিয়া যাও।' বণিক ভিক্ষুকে যথাযথ সম্মান দেখাইয়া তাঁহার নির্দেশিত পথ ধরিয়া গিয়া সেই গুহাটি দেখিতে পাইলেন। গুহার মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বণিক সেই রৌপ্য ভাণ্ডারটি দেখিলেন। ॥ ২৭-৩২ ॥

বণিক কুড়াল দিয়া রৌপ্য-পিণ্ডতে আঘাত করিয়া বুঝিলেন যে উহা শুদ্ধ রৌপ্যেরই পিণ্ড। তিনি একটি ক্ষুদ্র পিণ্ড লইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া শকটগুলি যে স্থানে রহিয়াছে, সেই স্থানে শকটগুলি রাখিয়া, সত্বর অনুরাধপুর অভিমুখে ছুটিলেন। রাজধানী নগরে পৌঁছিয়া রাজাকে রৌপ্য পিণ্ডটি দেখাইয়া বণিক রাজাকে বিষয়টি অবগত করিলেন।

॥ ৩৩-৩৫ ॥

নগরের পশ্চিম দিকে, পাঁচ যোজন দূরে, উরুবেলা গ্রামের নদীর ঘাটের[৪] নিকটে ছয় শকটপূর্ণ হরিতকী আকারের মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি সমুদ্র হইতে শুষ্ক ভূমির উপর উঠিয়া আসিল। ধীবরগণ সেই সকল দেখিয়া উহা একস্থানে একত্রিত করিয়া রাখিয়া, কিছু প্রবাল ও মুক্তা পাত্রে করিয়া রাজার নিকট লইয়া গিয়া বিষয়টি তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। ॥ ৩৬-৩৮ ॥

নগরের উত্তর দিকে, সাত যোজন দূরে, 'পেলীভাপিক' গ্রামের পুষ্করিণীর তীরে চারিটি সুদৃশ্য পেষণ প্রস্তরের ন্যায় বৃহৎ পল-কাটা রত্নের উদয় হইল। উহাদের বর্ণ হালকা হলুদ এবং দীপ্তময়। এক শিকারী তাহার পোষা কুকুর লইয়া শিকারে বাহির হইলে এই রত্নগুলি দেখিতে পান। শিকারী সত্বর রাজার নিকট গিয়া বিষয়টি জ্ঞাত করিলেন।

॥ ৩৯-৪১ ॥

পুণ্যবান ভূমিপতি রাজা গামণি একই দিনে সকল সংবাদ পাইলেন। তিনি বুঝিলেন যে ইষ্টক হইতে রত্ন অবধি সকল কিছু সেই মহাস্তূপ নির্মাণের জন্যই আবির্ভূত[৫] হইয়াছে। রাজা প্রীত হইয়া সকল সংবাদ-দাতাদের পুরস্কৃত করিলেন। তিনি সেই সকল বস্তুর পাহারায়

তাহাদেরই নিযুক্ত করিয়া পরে উহা সকল রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। ॥ ৪২-৪৩ ॥

স্বীয় বিপদ উপেক্ষা করিয়া মানুষ বিশ্বস্ত চিত্তে পুণ্য অর্জন করিলে, সেই উপার্জিত স্তূপাকার পুণ্যে সেই ব্যক্তি সুখদায়ী শত সহস্র ফলপ্রাপ্ত হন। অতএব বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া পুণ্যকর্ম করা উচিৎ। ॥ ৪৪ ॥

মহাস্তূপ নির্মাণের সামগ্রী প্রাপ্তি সমাপ্ত

এইখানে অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'মহাস্তূপ নির্মাণের সামগ্রী প্রাপ্তি'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. বিশ্বকর্মা প্রাচীন বৈদিক দেবতা। বেদের কিছু কিছু সূক্তিতে বিশ্বকর্মাকে সৃষ্টি ও স্থিতির দেবতা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মাকে সেই পদে বসিয়ে বিশ্বকর্মাকে ব্রহ্মার অনুচর করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বকর্মাকে ব্রহ্মার পুত্রও বলা হয়েছে। প্রথম দিকে বিশ্বকর্মাকে 'ত্বায়স্ত্রী' বলা হতো। গ্রীক পৌরাণিক দেবতা 'ভালকান'-এর অনুরূপ এই দেবতা। গুপ্ত যুগে 'বিষ্ণু পুরাণ' লেখা হয়। সেখানে ব্রহ্মাকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলা হলেও বিশ্বকর্মার কথাও রয়েছে। বলা হয় তিনি পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি তৈরী করেন। যাই হোক, এই প্রাচীন বৈদিক দেবতা এই গ্রন্থে বুদ্ধের স্তূপের ইট তৈরী করছেন। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। দেবরাজ ইন্দ্র এঁনাকে শুধুমাত্র ইট তৈরী করতে বললেন কেন? ইচ্ছা করলে এই দেবতা তো মহাস্তূপটিও তৈরী করে দিতে পারতেন। আসলে সবটাই মিথ্। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বেশ কিছু খ্যাতিমান যশস্বী স্থপতি ছিলেন যেমন, বিশ্বকর্মা, ময়দানব ইত্যাদি। এরাই পরবর্তীকালে কল্পনার জারক রসে দেবতা ও দানবে পরিণত হয়। ময়দানব-এর কথা মহাভারতে এবং রামায়ণে আছে। তিনি স্বর্ণলংকা নগরী ও রাবণের রাজপ্রাসাদ তৈরী করেন, বলা হয়েছে। আবার তিনি কুরুদের সভাগৃহটিও নির্মাণ করেন। মহাবংশের লেখক খুব সম্ভবত ময়দানবকে বাদ দিয়ে এখানে বিশ্বকর্মার উল্লেখ করেছেন, কারণ ময়দানবকে পুরাণে দানব বলা হয়েছে। মহাবংশ গ্রন্থে পুরাণের প্রভাব স্পষ্ট।

২. করিশ হচ্ছে এক একর ভূমি (**Rhys Davids, 'Ancient Coins and Measures of Ceylon'**).

৩. এই অঞ্চলটি হচ্ছে প্রাচীন অনুরাধপুরের দক্ষিণে। প্রাচীন শ্রীলঙ্কা ছিল তিন প্রদেশে বিভক্ত—উত্তর অঞ্চল হচ্ছে নাগদ্বীপ ; মধ্যের অঞ্চল হচ্ছে মলয় প্রদেশ ; দক্ষিণ অঞ্চল হচ্ছে 'রোহণ'।

৪. টীকাকার বলেছেন প্রাচীন উরুবেলা অঞ্চলটি ছিল গোননদীর মোহনায়, যেখানে নদীটি সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে।

৫. খুব সম্ভবত উল্লিখিত গ্রামের বাসিন্দারাই এই সকল জিনিষ রাজাকে দিয়েছিল। এতে কোন দেবতার কারসাজি নেই। রাজা যুদ্ধে নগর-বাসীদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তিনি তাদের উপর কোন শুল্ক চাপাননি। কিন্তু নানা গ্রামের অধিবাসীদের উপর হয়তো তিনি শুল্ক চাপিয়ে এইসব প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করেছিলেন। রাজভাণ্ডার থেকে যে রাজা কিছু দেননি, সেটা এই পরিচ্ছেদে স্পষ্ট। এখানে নানা গ্রামের নাম রয়েছে, যার অদূরে জিনিষগুলো পাওয়া গেছে—গম্ভীর গ্রাম, আচারভিট্‌ঠি গ্রাম, অম্বপিট্‌ঠ গ্রাম, সুমনভাপি গ্রাম, অম্বট্‌ঠকোল গ্রাম, উরুবেলা গ্রাম ও পেলীভাপিক গ্রাম। খুব সম্ভবত এইসব গ্রামবাসীদের সাহায্যেই হয়তো রাজা মহাস্তূপটি নির্মাণ করেন। এই কাল্পনিক কাহিনী তাদের এই অবদানকে ঢেকে দিয়ে রাজাকেই মহান দাতা রূপে চিত্রিত করেছে। অবশ্য কাহিনীতে জিনিষগুলো একটু বাড়িয়েই বলা হয়েছে।

২৯

মহাস্তূপ নির্মাণ আরম্ভ

মহাস্তূপ নির্মাণের সামগ্রীসকল প্রাপ্ত হইয়া রাজা গামণি বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র দিনে উক্ত স্তূপ নির্মাণের কাজ শুরু করিলেন। নির্দিষ্ট স্থানের স্তূপাকার শিলাখণ্ডগুলি সরাইয়া সেই স্থানে সাত হাত গভীর গর্ত করা হইল। রাজার নির্দেশে সৈনিকগণ বড় বড় প্রস্তর ভাঙিয়া হাতুড়ির সাহায্যে উহা গোল গোল খণ্ডে পরিণত করিয়া উক্ত গর্তে ঢালা হইল। কী করিলে ভূমি শক্ত করা যায় রাজার উহা জানা ছিল। তিনি প্রস্তর খণ্ডে গর্ত ভর্তি করিয়া হস্তী দ্বারা উহার উপর চাপ দিয়া ভূমিটি শক্ত করিলেন। এই কাজের জন্য হস্তীদের পায়ে চামড়ার ঢাকনা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ॥ ১-৪ ॥

গঙ্গা নদীর নরম মাটি সর্বদা মোলায়েম থাকে। গঙ্গা যেই স্থানে মর্ত্যে অবতরণ করে, সেই ত্রিশ যোজন অবধি স্থানের মাটি মাখনের ন্যায় মসৃণ। অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণ সেই স্থান হইতে মোলায়েম মাটি আনিয়া রাজাকে দিলেন। রাজা নির্দেশ দিলেন, 'এই মাটি পাথর কুচির ওপর ঢালিয়া দিয়া উহার উপর ইষ্টক সাজাইয়া দিবে।' উহা করা হইলে, উহার উপর মোটা দানার মাটি এবং চুনির ন্যায় গোল নুড়ির চূর্ণ ছড়ানো হইল। উহার উপর লোহার জাল বিছাইয়া দিয়া অর্হত-ভিক্ষুগণের দ্বারা আনিত হিমালয় অঞ্চলের স্ফটিক-প্রস্তর উহার উপর রাজার নির্দেশে দেওয়া হইল। উহার উপর আবার প্রস্তর খণ্ড বিছানো হইল। সর্বস্তরে গঙ্গার এঁটেল মাটি সিমেন্টের কাজ করিল। ॥ ৫-১১ ॥

কয়েতবেল গাছের রজন নারিকেলের জলে সিক্ত করিয়া সেই রজন উক্ত প্রস্তর খণ্ডের উপর ছড়াইয়া উহার উপর আট ইঞ্চি পুরু তাম্রপাতখণ্ড বিছাইয়া দেওয়া হইল। সেই পাতখণ্ডের উপর তিল তেলে মিশ্রিত সেঁকোবিষ ছড়াইয়া উহার উপর সাত ইঞ্চি পুরু রুপোর পাতখণ্ড বিছাইয়া দেওয়া হইল। রাজার নির্দেশে এইরূপে মহাস্তূপের ভূমি নির্মিত হইল।

রাজা উক্ত ভূমির প্রস্তুতিতে প্রীত হইয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমার চতুর্দশ দিবসে ভিক্ষুসংঘের মহা সমাবেশ করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আগামীকাল আমি মহাস্তূপের ভিত্তি স্থাপন করিব। সেই মহা সমারোহে ভিক্ষুগণ যেন উপস্থিত থাকেন। আর উপাসক-উপাসিকাগণ নিজেদের উক্ত উৎসবের জন্য সজ্জিত করিয়া পুষ্প-মাল্যসহ যেন এই স্থানে উপস্থিত হন।'

॥ ১২-১৭ ॥

রাজা অমাত্যগণকে[২] স্তূপের স্থানটিকে সজ্জিত করিবার দায়িত্ব দিলেন। রাজার নির্দেশে বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহারা নানাপ্রকারে স্থানটিকে সুন্দর করিয়া সজ্জিত করাইলেন। রাজার নির্দেশে সারা নগর এবং এই স্থানে পৌঁছিবার রাস্তাগুলি সুসজ্জিত করা হইল। পরদিন সকালে নগরের চারিটি প্রবেশ দ্বারের নিকটে রাজা ক্ষৌরকর্মকার ও পরিচারকদের রাখিলেন। নগরের অধিবাসীরা এবং গ্রামবাসিগণ চুল কাটিয়া, স্নান করিয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ হইতে প্রজাবৎসল রাজা এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের আহারের জন্য খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হইল। ফুল ও সুগন্ধ দ্রব্যেরও ব্যবস্থা করা হইল। নগরবাসী ও গ্রামবাসিগণ রাজার প্রদত্ত ব্যবস্থাদি সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেদের পছন্দমত ফুল, মালা লইয়া স্তূপের স্থানে আসিলেন। ॥ ১৮-২২ ॥

রাজপোশাকে শোভিত রাজা স্বয়ং সুন্দর পোশাকে সজ্জিত অমাত্যগণ-সহ স্বর্গের অপ্সরাসম সুন্দরী রাজনর্তকীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গীতবাদ্য সহ চল্লিশ হাজার মানুষের শোভাযাত্রা লইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহিমামণ্ডিত হইয়া সেইদিন সায়াহ্নে সেই মহাস্তূপের স্থানে গেলেন। এক হাজার আটটি শকটপূর্ণ কাপড়ের বাণ্ডিল মধ্যখানে রাখিয়া উহার চারিদিকে প্রচুর পরিমাণ মধু, ঘি, চিনি, ইত্যাদি উৎসবে দানের জন্য রাখা হইল। ॥ ২৩-২৮ ॥

বিদেশ[৩] হইতে আগত বহু ভিক্ষুগণ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বদেশের ভিক্ষুগণের কথা বলাই বাহুল্য। রাজগৃহ হইতে ভিক্ষু ইন্দগুপ্তের নেতৃত্বে আশী হাজার ভিক্ষু আসিলেন। ঋষিপত্তন হইতে মহান ভিক্ষু ধম্মসেন-এর নেতৃত্বে বারো হাজার ভিক্ষু আসিলেন। জেতবন-বিহার হইতে ভিক্ষু পিয়দশ্শির নেতৃত্বে ষাট হাজার ভিক্ষু আসিলেন। বৈশালীর মহাবন-বিহার হইতে ভিক্ষু উরুবুদ্ধরক্ষিতের নেতৃত্বে আঠারো হাজার ভিক্ষু আসিলেন। কৌশম্বীর ঘোষিতরাম-বিহার হইতে ভিক্ষু উরুধম্মরক্ষিতের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু আসিলেন: উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি হইতে ভিক্ষু উরুসঙ্ঘরক্ষিতের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার ভিক্ষু আসিলেন। পুষ্পপুরের অশোকারাম-বিহার হইতে ভিক্ষু মিত্তিণ্ন-এর নেতৃত্বে একশত ষাট হাজার ভিক্ষু আসিলেন। কাশ্মীর হইতে ভিক্ষু উত্তিণ্ন-এর নেতৃত্বে দুই শত আশী হাজার ভিক্ষু আসিলেন। মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহাদেব-এর নেতৃত্বে পল্লবভোগ্‌গ[৪] হইতে চারিশত ষাট হাজার ভিক্ষু আসিলেন। যোন রাজ্য অলসন্দ[৫] হইতে যোন ভিক্ষু মহাধম্মরক্ষিতের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু আসিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের বনাঞ্চলে অবস্থিত ভিক্ষু উত্তর-এর

নেতৃত্বে ষাট হাজার ভিক্ষু আসিলেন। ॥ ২৯-৪০ ॥

বুদ্ধগয়ার বোধিমণ্ড-বিহার হইতে মহান ভিক্ষু চিত্তগুপ্তের নেতৃত্বে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু আসিলেন। দক্ষিণ ভারতের বনবাস প্রদেশ হইতে ভিক্ষু চন্দগুপ্তের নেতৃত্বে আশী হাজার ভিক্ষু আসিলেন। ভিক্ষু সুরিয়গুপ্তের নেতৃত্বে কৈলাস-বিহার হইতে ছিয়ানব্বই হাজার ভিক্ষু আসিলেন। আর এই লঙ্কাদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কত সংখ্যক ভিক্ষু আসিয়াছিলেন উহার হিসাব প্রাচীনকালে রাখা হয় নাই। যত সংখ্যক ভিক্ষু সেই মহাস্তূপের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে ছিয়ানব্বই কোটি ছিলেন অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষু। ॥ ৪১-৪৫ ॥

উক্ত ভিক্ষুগণ মহাস্তূপের ভিতের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে রাজার জন্য জায়গা রাখা হইল। রাজা সেই জায়গায় গিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকের ভিক্ষুগণকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ভিক্ষুগণের সম্মুখ দিয়া তিনবার ভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া, ভিক্ষুগণকে ফুল মালা দিয়া, ভিতের ওপর রাখা পূর্ণ কলসের পবিত্র স্থানে গিয়া রাজা স্বর্ণ খুঁটিতে লম্বা রশি দ্বারা নিবদ্ধ রৌপ্য ছড়িটি চারিদিকে ঘুরাইয়া উক্ত প্রকাণ্ড স্তূপের জন্য প্রকাণ্ড বেড় নির্দিষ্ট করিতে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় অমাত্যকে ছড়িটি ঘুরাইতে নির্দেশ দিলেন। তখন মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, দূরদর্শী ভিক্ষু সিদ্ধথ রাজাকে নিষেধ করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, এইরূপ প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণে বহু সময় লাগিবে এবং উহা শেষ হইবার পূর্বেই হয়ত রাজার মৃত্যু হইবে। তাছাড়া, এইরূপ প্রকাণ্ড স্তূপের সংস্কার কর্ম করাও কষ্টকর। ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া ভিক্ষু সেইরূপ প্রকাণ্ড স্তূপ নির্মাণে নিষেধ করিলেন। ভিক্ষুগণের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এবং উক্ত ভিক্ষুর প্রতি সম্মানে রাজা ভিক্ষুর কথা মানিয়া লইলেন। ॥ ৪৬-৫৪ ॥

অতঃপর উপস্থিত সকল ভিক্ষুগণের সম্মতিক্রমে রাজা বিরাট স্তূপ নির্মাণের বাসনা ত্যাগ করিয়া মাঝারি গোছের স্তূপ নির্মাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাই স্থির করিলেন। ভূমিতে সেইরূপ বেড় দিয়া রাজা উহার মধ্যস্থলে আটটি রৌপ্য ও আটটি স্বর্ণকলস স্থাপন করিলেন। উহাদের ঘিরিয়া এক হাজার আটটি আরও নতুন কলস ও এক হাজার আটটি ইষ্টক রাজা স্থাপন করিলেন। এই সকল কলস এবং ইষ্টক সুগন্ধ কাদামাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল।

রাজা আটটি সুবর্ণ ইষ্টক এক স্থানে রাখিয়া একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় পারিষদকে দিয়া সেই ইষ্টকের একটি ভিতের পূর্বভাগে স্থাপন করাইলেন। সুগন্ধ কাদামাটির[৬] উপর ভিতের প্রথম ইষ্টকটি স্থাপিত

হইল। অন্যান্য আরও সাতজন পারিষদ বাকি সাতটি সুবর্ণ ইষ্টক রাজার নির্দেশে ভিতের উপর স্থাপন করিলেন। ইহার উপর যুঁই ফুল ছড়াইয়া রাজা সম্মান জানাইলেন। সেই সময় পৃথিবী প্রকম্পিত হইল।

রাজা এই ভিতের উপর পাথর সাজাইয়া দিলেন। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পঞ্চদশ উপসথ দিবসে রাজা এইরূপে মহাস্তূপের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ॥ ৫৫-৬৩ ॥

অতঃপর রাজা উপস্থিত অর্হত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুগণকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ দান প্রদান করিলেন। রাজা সর্বান্তঃকরণে উৎফুল্ল হইয়া ভিতের উত্তর-পূর্বভাগে উপস্থিত মহান ভিক্ষু প্রিয়দর্শিকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সেই মহাসমারোহ উৎসবকে মহিমান্বিত করিতে উক্ত অর্হত-ভিক্ষু বুদ্ধের ধর্মদর্শন ব্যক্ত করিলেন। সেই ধর্মদর্শন প্রদানের মাধ্যমে তিনি সমবেত জনগণের ওপর আশীষ বর্ষণ করিলেন। সেই ধর্মদর্শনের কারণে সেই স্থলে চল্লিশ হাজার ব্যক্তি ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। আরও চল্লিশ হাজার ব্যক্তি স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক হাজার ব্যক্তি আরও উচ্চ ধাপে উন্নীত হইলেন এবং হাজার জন অর্হত্বলাভ করিলেন। আশী হাজার ভিক্ষু ও চল্লিশ হাজার ভিক্ষুণী অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ॥ ৬৪-৬৯ ॥

এইরূপ বহু ব্যক্তি যাঁহারা ত্রিরত্নের প্রতি অনুরাগী, তাঁহারা লোক-হিতার্থী, দয়াময়, বিশ্বজনের সৌভাগ্যপ্রদায়ী ধর্ম জ্ঞাত হইয়া উক্ত গুণ-সম্পন্ন হইতে সচেষ্ট হইলেন। ॥ ৭০ ॥

মহাস্তূপ নির্মাণ আরম্ভ সমাপ্ত

এইখানে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'মহাস্তূপ নির্মাণ আরম্ভ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. মূল গ্রন্থে এই চূর্ণকে বলা হয়েছে 'মরুম্বা'। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বালিকা বা পাসানা।
২. টীকাকার এই অমাত্যগণের নাম বলেছেন—বিশাখ ও সিরিদেব।
৩. ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে ভিক্ষুরা লংকাদ্বীপে গেছিলেন বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা একদিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছলেন কী

করে ? 'থূপ বংশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে কৈলাস পর্বত অঞ্চলের ভিক্ষুরা আকাশপথে উড়ে গেছিলেন।

৪. পল্লবভোগ্‌গ হচ্ছে পল্লব বা পারস্য রাজ্য।

৫. অলসন্দ হচ্ছে আলেকজান্দ্রিয়া, কাবুলের নিকটে ছিল এই প্রদেশ।

৬. টীকাকার এই কাদামাটি জল দিয়ে তৈরি করার কারিগররূপে দুই ভিক্ষুর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ভিক্ষু মিত্তসেন ও ভিক্ষু জয়সেন।

৩০

ধাতুকক্ষ নির্মাণ

মহান রাজা ভিক্ষুসংঘকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের ভিক্ষান্ন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতে বলিলেন, 'ভন্তে! স্তূপ প্রস্তুত না হওয়া অবধি আপনারা আমার নিকট ভিক্ষান্ন গ্রহণ করুন।' ভিক্ষুসংঘ ইহাতে সম্মত হইলেন না। রাজা বারবার ভিক্ষুসংঘকে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ অনুরোধে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে এক সপ্তাহের জন্য রাজার নিকট ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা উক্ত স্থানে, আঠারোটি জায়গায় তাঁবু স্থাপন করিলেন। সেই সকল তাঁবুতে ভিক্ষুগণকে উপবেশন করাইয়া সাতদিন ধরিয়া রাজা তাঁহাদের অন্ন, পানীয় এবং নানা দানাদি প্রদান করিলেন। ভিক্ষুগণকে অনুরূপে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া রাজা তাঁহাদের বিদায় দিতে রাজি হইলেন। ॥ ১-৪ ॥

ভিক্ষুগণ প্রস্থান করিলে, রাজা ভেরীর শব্দ করিয়া দেশের স্থপতিদের সেই স্থানে ডাকিলেন। পাঁচশত দক্ষ স্থপতি ভেরীর শব্দে সত্বর উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে একজনকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্র! আপনি কীরূপে স্তূপটি নির্মাণ করিবেন?' সেই স্থপতি বলিলেন, 'মহারাজ! আমি প্রতিদিন এক শত কর্মচারী দ্বারা এক শকটপূর্ণ বালি ঢালিয়া এই কাজ করিব[১]।' রাজা ইহাতে অসম্মত হইলেন। ॥ ৫-৭ ॥

ইহার পর আর একজন স্থপতি বলিলেন, 'মহারাজ! আমি প্রতিদিন একশত কর্মচারী দিয়া অর্ধ শকটপূর্ণ বালি ঢালিয়া এই কাজ করিব।' আর একজন স্থপতি বলিলেন, 'মহারাজ! আমি প্রতিদিন একশত কর্মচারী দিয়া অর্ধ শকটেরও অর্ধেক পাঁচ অম্মন[২] পরিমাণ বালি ঢালিয়া এই কাজ করিব।' আর একজন স্থপতি বলিলেন, 'আমি উক্ত অর্ধেকেরও অর্ধেক, দুই অম্মন, বালি ঢালিয়া এই কাজ করিব।' রাজা এইরূপ কাজে অসম্মত হইলেন। তিনি এই চারিজন স্থপতিকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর এক বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ স্থপতি বলিলেন, 'মহারাজ! আমি বালি গুঁড়া করিয়া চালনি দিয়া ছাঁকিয়া উহার কেবল এক অম্মন লইয়া এই কাজ করিব।' ইন্দ্রের ন্যায় সাহসী ভূমিপতি ইহাতে সম্মত হইয়া ভাবিলেন, 'যাহা হউক, ইহাতে ভূমি শক্ত হইবে এবং চারিদিকে আগাছা জন্মিবে না।' রাজা সেই স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্র! স্তূপের

আকার কীরূপ হইবে?' সেই সুদক্ষ স্থপতি একটি জলপূর্ণ পাত্র আনিয়া, কিঞ্চিত জল হাতে লইয়া, উহার একটি বিন্দু সেই পাত্রের জলে ফেলিলেন। সেই জলবিন্দু পাত্রের স্থির জলে পড়িয়া চারিদিকে গোল একটি বৃত্ত সৃষ্টি করিল। সেই বৃত্তের মধ্যস্থলে পতিত জলবিন্দুটি উপর দিকে লাফাইয়া উঠিল। স্থপতি ইহা রাজাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ! স্তূপের আকার এইরূপই হইবে।' রাজা ইহাতে প্রীত হইয়া সেই স্থপতিকে এক হাজার মুদ্রা মূল্যের একজোড়া অঙ্গবস্ত্র, সুদৃশ্য পাদুকা এবং বারো হাজার কাহাপন প্রদান করিলেন। রাজা এইরূপে এই স্থপতিকে স্তূপ নির্মাণের কার্যে নিযুক্ত করিয়া বাকি স্থপতিগণকে বিদায় দিলেন।

॥ ৮-১৪ ॥

সেইদিন রাত্রে রাজা চিন্তা করিলেন, 'যেই স্থানে স্তূপ নির্মাণের ইষ্টক রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে উহা আনিতে শ্রমিকগণের প্রচুর দৈহিক ক্লেশ হইবে। তাহাদের কষ্ট না দিয়া কীরূপে ইষ্টক এইস্থানে আনিব?' রাজার এই ভাবনা দেবগণ জ্ঞাত হইলেন। তাঁহারা প্রতি রাত্রে, প্রতিদিনের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ইষ্টক রাতের অন্ধকারে আনিয়া স্তূপ নির্মাণের স্থলে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা ইহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্তূপ নির্মাণের কার্য আরম্ভ করিলেন। ॥ ১৫-১৭ ॥

রাজা মনস্থ করিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করিতে বলিব না।' রাজা ভবিষ্যৎ স্তূপের চতুর্দ্বারের প্রতিটি দ্বারে লক্ষ কাহাপন, বহু অঙ্গবস্ত্র, অলংকার, খাদ্য-পানীয়, মশলা, সুবাসিত পুষ্প, চিনি, মধু, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুসকল রাখিতে নির্দেশ দিলেন। রাজা মুখশুদ্ধির জন্যও পাঁচ প্রকার সুগন্ধ দ্রব্য রাখিতে বলিলেন। এই সকল রাখিয়া রাজা নির্দেশ দিলেন, 'কাজের শেষে শ্রমিকগণ তাহাদের পছন্দমত এই সকল জিনিষ পারিশ্রমিক রূপে গ্রহণ করিবে।' ॥ ১৮-২০ ॥

একজন ভিক্ষু এই স্তূপ নির্মাণে অংশ গ্রহণের বাসনায় স্বীয় নির্মিত একটি ইষ্টক লইয়া নির্মাণ স্থলে গিয়া সকলের অলক্ষ্যে উহা এক শ্রমিককে প্রদান করিলেন। সেই শ্রমিক ভিক্ষুর মনোবাসনা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু শ্রমিকগণের মধ্যে সেই বিসদৃশ্য ইষ্টক লইয়া দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইল। রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই শ্রমিকের নিকট সেই ইষ্টক-দাতা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন। কিন্তু 'ভিক্ষু' ব্যতীত সেই শ্রমিক সেই দাতা সম্বন্ধে রাজাকে কিছুই আর বলিতে পারিল না। কেবল বলিল 'প্রভু! সেই ভিক্ষুর এক হাতে কিছু ফুল ছিল। তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন জানি না।' ইহা শুনিয়া রাজা সেই ভিক্ষুকে শনাক্ত করিতে একজন তত্ত্বাবধায়ককে সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই ভিক্ষু উক্ত স্থানে পুনর্বার

আসিলে সেই শ্রমিক উক্ত তত্ত্বাবধায়ককে তাঁহাকে দেখাইলেন। তত্ত্বাবধায়ক রাজাকে ভিক্ষুকে দেখাইলেন। ॥ ২১-২৬ ॥

অতঃপর রাজা তিনটি পাত্র প্রস্ফুটিত যুঁই ফুলে পূর্ণ করিয়া পবিত্র বোধিবৃক্ষের চত্বরে সেইগুলি রাখিয়া তত্ত্বাবধায়ককে উহা সেই ভিক্ষুকে প্রদান করিতে বলিলেন। সেই ভিক্ষু পবিত্র বোধিবৃক্ষের নিকটে গেলে, তত্ত্বাবধায়ক সেই পুষ্প পাত্রগুলি ভিক্ষুকে প্রদান করিয়া বোধিবৃক্ষের পূজার জন্য উহা ব্যবহার করিতে বলিলেন। ভিক্ষু সেই ফুল বোধিবৃক্ষের সম্মুখে সুন্দরভাবে বিছাইয়া দিয়া পরম ভক্তিভরে বোধিবৃক্ষের পূজা করিলেন। ভিক্ষুর পূজা সমাপ্ত হইলে সেই তত্ত্বাবধায়ক ভিক্ষুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! রাজা এই পুষ্পসকল আপনার প্রদত্ত ইষ্টকের মূল্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তিনি আপনাকে ভক্তিমাখা প্রণাম জানাইয়াছেন।' রাজার মূল্য প্রদানের কারণ ভিক্ষু বুঝিতে পারিলেন। ॥ ২৭-২৮ ॥

কোট্‌ঠিভাল প্রদেশের পিয়ঙ্গল্ল নামক স্থানে এক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। তিনিও স্তূপ নির্মাণে অংশ গ্রহণ করিতে একটি ইষ্টক স্বীয় হস্তে নির্মাণ করিলেন। স্তূপে ব্যবহৃত ইষ্টকের সম আকারের ছিল এই ইষ্টক। সেই স্থানে কর্মরত এক শ্রমিকের তিনি ছিলেন নিকট আত্মীয়। ভিক্ষু সকলের অলক্ষ্যে সেই আত্মীয়কে তাঁহার ইষ্টকটি স্তূপে ব্যবহার করিতে প্রদান করিলেন। সেই শ্রমিক ইষ্টকটি লইয়া অন্যান্য ইষ্টকের সহিত উহা স্তূপে স্থাপন করিল। অন্যান্য শ্রমিকগণ দেখিল যে, উক্ত শ্রমিক তাহার কোঁচড় হইতে একটি ইষ্টক বাহির করিয়া অন্যান্য ইষ্টকের সহিত মিশাইয়া স্তূপের কার্যে ব্যবহার করিল। ইহাতে শ্রমিকগণের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল। রাজা ইহা শুনিয়া সেই স্থানে আসিয়া উক্ত শ্রমিককে সেই ইষ্টকটি নির্মিত স্থানের ইষ্টকের মধ্যে শনাক্ত করিতে বলিলেন। শ্রমিক উহা শনাক্ত করিতে পারিলেও বলিল, 'মহারাজ! উহা সম্ভব নয়।' রাজা তখন শ্রমিককে সেই ভিক্ষুকে চিনাইয়া দিতে বলিয়া এক তত্ত্বধায়ককে সেই কর্মে নিযুক্ত করিলেন। সেই শ্রমিক ভিক্ষুকে পরে তত্ত্বাবধায়ককে চিনাইয়া দিলে, সেই তত্ত্বাবধায়ক রাজার অনুমতি লইয়া সেই ভিক্ষুর নিকটে গেলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। সেই ভিক্ষু তখন কট্‌ঠহাল-পরিবেণে[৩] অবস্থান করিতেছিলেন। ভিক্ষু একসময় সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পিয়ঙ্গল্ল-বিহারে যাইতে উদ্যত হইলে রাজার তত্ত্বাবধায়ক রাজার নির্দেশে সেই ভিক্ষুর সহিত যাইতে চাহিলেন। রাজা সেই ভিক্ষুকে প্রদান করিতে একজোড়া অঙ্গবস্ত্র ও লাল বর্ণের উত্তরাসঙ্গ, উভয়ের মূল্য হইবে প্রায় একহাজার মুদ্রা, চিনি, সুগন্ধি তৈল ও

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তত্ত্বাবধায়ককে দিলেন। ॥ ২৯-৩৭ ॥

সেই ব্যক্তি ভিক্ষুর সহিত চলিলেন এবং পিয়ঙ্গল্ল-বিহারের নিকটস্থ হইলে তাঁহারা এক বৃক্ষের ছায়াতলে পথশ্রান্ত হইয়া বসিলেন। সেই ব্যক্তি নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল আনিয়া উহাতে চিনি মিশাইয়া ভিক্ষুকে পান করিতে দিলেন। ভিক্ষুর পদদ্বয়ে সুগন্ধি তেল মাখাইয়া মর্দন করিয়া দিলেন। তারপর তিনি ভিক্ষুকে রাজার প্রদত্ত বস্তুসকল প্রদান করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আমার গৃহের কুলগুরু ভিক্ষুকে দানের জন্য এই সকল বস্তু আমি আনিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি উহা আপনাকে প্রদান করিতেছি।' ভিক্ষু বস্তুসকল সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিহার উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা করিলে, সেই তত্ত্বাবধায়ক ভিক্ষুকে জ্ঞাত করিলেন যে, প্রদত্ত বস্তুসকল আসলে রাজাই ভিক্ষুকে প্রতিদানে প্রদান করিয়াছেন, যদিও উহা ভিক্ষুর প্রদত্ত ইষ্টকের সমতুল্য নয়। এই বলিয়া সেই ব্যক্তি ফিরিয়া আসিলেন। ॥ ৩৮-৪১ ॥

উক্ত মহাস্তূপ নির্মাণকালে যে সকল বহু সংখ্যক শ্রমিক পারিশ্রমিক লইয়া কঠিন শ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরে দীক্ষা লইয়া মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করিলেন। জ্ঞানীগণ জানেন যে তথাগতের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা থাকিলে স্বর্গলাভ হয়। সেই কারণে তাঁহারা এই স্তূপে অর্ঘ্য প্রদান করেন। ॥ ৪২-৪৩ ॥

দুইজন মহিলা শ্রমিক মহাস্তূপ নির্মাণের কার্যে, পারিশ্রমিকসহ নিযুক্ত হইলে, মৃত্যুর পর তাঁহারা তাবতিংস দেবলোকে গিয়া আবির্ভূত হন। স্বর্গারোহণের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহারা এই মহাস্তূপে সুগন্ধি পুষ্পের অর্ঘ্য প্রদান করেন। সেই সময় ভটিবংক নামক স্থানের ভিক্ষু মহাশিব রাত্রে মহাস্তূপে অর্ঘ্য প্রদান করিতে আসিয়া উক্ত দুই স্বর্গীয় সুসমা মণ্ডিত দেবলোকের মহিলাদের স্তূপে অর্ঘ্য প্রদান করিতে দেখিয়া, সেই স্থানে অবস্থিত একটি সপ্তপর্ণী বৃক্ষের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে অলক্ষ্যে থাকিয়া ভিক্ষু উক্ত দেবলোকবাসীদের স্তূপে অর্ঘ্য প্রদানের মনোরম দৃশ্যটি দেখিলেন। তাঁহাদের পূজা সমাপ্ত হইলে, এই ভিক্ষু তাঁহাদের বলিলেন, 'হে দেবীগণ! আপনাদের দিব্য আলোর দ্যুতিতে সমগ্র দ্বীপ আলোকিত হইয়াছে। কী কর্মের ফলে আপনারা দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন?' দেবীগণ তাঁহাদের পূর্ব কর্মের কথা ভিক্ষুকে জানাইলেন। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই এই প্রাপ্তি। ॥ ৪৪-৫০ ॥

মহাস্তূপের নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্ত হইলে রাজা স্তূপে অর্ঘ্য প্রদানের জন্য তিন থাকের বেদী স্তূপের চারিধারে নির্মাণ করাইলেন। কিন্তু ঋদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুগণ সেই বেদী নীচে নামাইয়া ভূমির সমতলে রাখিলেন।

রাজা নয়বার সেই বেদী ভূমি হইতে উর্ধে তুলিলে নয়বারই উহা নীচে নামিয়া গেল। রাজা ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভিক্ষুসংঘকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আশী হাজার ভিক্ষু রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদের সসম্মানে খাদ্যপানীয় প্রদান করিয়া তৃপ্ত করিলেন। ইহার পর রাজা ভিক্ষুগণকে উক্ত অলৌকিক ঘটনাটি ব্যক্ত করিয়া উহার শুভাশুভ ফল জানিতে চাহিলেন। ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! ইহাতে ভীত হইবার কিছু নাই। স্তূপটি দৃঢ় রাখিতে ঋদ্ধিসম্পন্ন ভিক্ষুগণের ইচ্ছায় ইহা হইয়াছে। তাঁহারা আর ইহা করিবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে মহাস্তূপের কাজ সম্পন্ন করুন।' ॥ ৫১-৫৫ ॥

রাজা ইহা শুনিয়া প্রীত হইয়া মহাস্তূপের কাজ সম্পন্ন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজা উক্ত স্তূপের চারিধারে দশটি অর্ঘ্য প্রদানের বেদী নির্মাণ করিলেন যাহাতে দশ কোটি ইষ্টক ব্যবহৃত হইল। ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর ভিক্ষুসংঘ দুইজন অর্হত ভিক্ষু উত্তর ও সুমনকে নির্দেশ দিলেন, 'মহাস্তূপের গহ্বরের ধাতুকক্ষের জন্য সমান আকারের ছয়টি মেদ-বর্ণের প্রস্তর খণ্ড আনিয়া দাও।' উক্ত নির্দেশে ভিক্ষুদ্বয় উত্তরকুরু অভিমুখে রওনা হইলেন। সেই স্থান হইতে ভিক্ষুদ্বয় আশী হস্ত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এবং আট ইঞ্চি পুরু ছয়টি সমান মাপের উজ্জ্বল মেদবর্ণের[৪] প্রস্তর খণ্ড আনিয়া দিলেন। ॥ ৫৭-৫৯ ॥

সেই প্রস্তর খণ্ড চারদিকে চারটি স্থাপন করিয়া উহার তলদেশে আর একটি প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করা হইল। এইরূপে একটি চারি দেওয়াল বিশিষ্ট বৃহৎ সিন্দুকের ন্যায় প্রস্তুত করা হইল। উহার ঢাকনার জন্য আর একটি প্রস্তর খণ্ড স্তূপের পূর্বদিকে সকলের দৃষ্টির অগোচরে রাখা হইল। ইহাই হইল মহাস্তূপের গহ্বরের ধাতুকক্ষ বা ধাতু রাখিবার সিন্দুক বিশেষ। ॥ ৬০-৬১ ॥

রাজা উক্ত ধাতুকক্ষের মধ্যস্থলে রত্ন দ্বারা নির্মিত বোধিবৃক্ষের অনুরূপ একটি বৃক্ষের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেন। আট হস্ত দীর্ঘ, প্রবালে নির্মিত ছিল সেই বৃক্ষের শিকড়। উহার পাঁচটি শাখা ছিল নীলকান্ত মণিতে প্রস্তুত। উহার পত্রগুলি রৌপ্য নির্মিত ; ফলগুলি ছিল সোনায় নির্মিত। অষ্টমঙ্গলে পরিবৃত সেই বৃক্ষের উপরে ছিল চাঁদোয়া, মুক্তাখচিত। উহার চারি কোণে ছিল স্বর্ণ ঘণ্টা ; উহার প্রান্তভাগে নয় লক্ষ মুদ্রার মুক্তামালা লাগানো ছিল। চাঁদোয়ার অঙ্গে ছিল রত্নখচিত চন্দ্র, সূর্য, তারকা, পদ্ম ইত্যাদির প্রতিকৃতি। আরও নানাপ্রকার বহুবর্ণের বিচিত্র একহাজার আটটি মূল্যবান রত্নাদি দ্বারা অলংকৃত ছিল সেই চাঁদোয়া। ॥ ৬২-৬৯ ॥

উক্ত রত্ননির্মিত বোধিবৃক্ষের চারিধারে ছিল রত্নখচিত বেদীকা। উহার স্থানে স্থানে ছিল হরীতকী আকৃতির মুক্তার শোভা। বোধিবৃক্ষের পাদদেশে চারিধারে রাখা হইল কিছু শূন্য কলস পুষ্পশোভিত, আর কিছু কলস চারিপ্রকার সুগন্ধ জলে পূর্ণ। কলসগুলি ছিল রত্ননির্মিত। বোধিবৃক্ষের নীচে, পূর্বদিকে, রাখা হইল এক কোটি মুদ্রা মূল্যের একটি সিংহাসন যাহার উপর ছিল সুবর্ণ বুদ্ধমূর্তি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মূর্তির অঙ্গে ছিল নানাবর্ণের নানা প্রকারের উজ্জ্বল রত্নসকল। সেই সিংহাসনের পার্শ্বে ছিল মহাব্রহ্মার প্রতিমূর্তি, যিনি রৌপ্যনির্মিত ছত্র বুদ্ধমূর্তির উপর ধরিয়া আছেন। আর ছিল ইন্দ্র ও পঞ্চশিখের প্রতিমূর্তি। ইন্দ্র 'বিজয়োত্তর' শঙ্খ মুখে দিয়া ধ্বনি করিয়া বুদ্ধকে অভিষিক্ত করিতেছেন; আর পঞ্চশিখ বংশীধারণ করিয়া সেই বংশীর সঙ্গীত প্রদান করিতেছেন। আর ছিল 'কালনাগ' ও নর্তকীবৃন্দের প্রতিমূর্তি; সহস্র বাহুর মার তাহার হস্তীর পৃষ্ঠে ও তাহার অনুচরগণের প্রতিমূর্তি। আর ছিল আট দিকে আটটি আসন দিক্‌পতিদের উদ্দেশে। প্রতিটি আসনের মূল্য ছিল এক কোটি মুদ্রা। বুদ্ধের মহানির্বাণের প্রতীক স্বরূপ একটি শয্যায় শায়িত বুদ্ধের প্রতিমূর্তিও ছিল বুদ্ধের সিংহাসনের নীচের দিকে। একপ্রকার রত্নে খচিত এই শয্যাটির মূল্যও ছিল এক কোটি মুদ্রা। এই সকল উক্ত ধাতুকক্ষের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

॥ ৭০-৭৭ ॥

বুদ্ধত্বলাভের পর সাতদিন অবধি বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী[৫] উক্ত ধাতুকক্ষে প্রদর্শন করিতে রাজা নির্দেশ দিলেন। ইহা ছাড়া, ধর্মপ্রচারের জন্য বুদ্ধকে মহাব্রহ্মার প্রার্থনা; যশ-এর সঙ্ঘভুক্তি; ভদ্দবগ্গিগণের গৃহ-ত্যাগ; বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন; জটাধারী ঋষি জটিলগণের ধর্মগ্রহণ; রাজা বিম্বিসারের আগমন; বেণুবন-বিহার গ্রহণ; রাজগৃহে প্রবেশ। আশীজন ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ; কপিলাবস্তুতে গমন ও সেই স্থানে ঋদ্ধি প্রদর্শন; রাহুল ও নন্দের দীক্ষা; জেতবন গ্রহণ; আম্রবৃক্ষের পাদদেশে ঋদ্ধি প্রদর্শন; স্বর্গে ধর্মপ্রচার; ঋদ্ধি প্রদর্শন; রাহুলকে উপদেশ প্রদান; মঙ্গলসূত্র প্রদান; ধনপাল[৬] হস্তীর সম্মুখীন; যক্ষ আলবক; দস্যু অঙ্গুলিমাল ও নাগরাজ অপলালকে প্রশমন; পারায়ণগণের সহিত সাক্ষাৎ; পরিনির্বাণের সংকল্প; চুন্দের অন্নগ্রহণ; অঙ্গবস্ত্র গ্রহণ; জলপান; পরিনির্বাণ; দেবতা ও মানুষের বিলাপ; ভিক্ষুগণের অন্তিম প্রণাম; নশ্বর দেহ দাহ; চিতার অগ্নি নির্বাপন; ধাতু ভাগ; কিছু জাতকের কাহিনী ও বেস্যানতর জাতক। তুষিত স্বর্গ হইতে অবতরণ ও বোধি-বৃক্ষের পাদদেশে আসন গ্রহণ অবধি বুদ্ধের জীবনের সকল মূল্যবান

ঘটনার বর্ণনা করিয়া প্রদর্শন করিতে রাজা নির্দেশ দিলেন ; শিল্পিগণ সেইসকল ঘটনাবলী নানা মূর্তির সাহায্যে ধাতুকক্ষের মধ্যে স্থাপন করিলেন। ॥ ৭৮-৮৮ ॥

ধাতুকক্ষের মধ্যে চারিদিকে চারিজন লোকপালের মূর্তি ; তেত্রিশজন দেবতা, বত্রিশজন দেব-নর্তকী ও আঠাশজন যক্ষপতির মূর্তি ; দেবগণ ঊর্ধ্ববাহু হইয়া পুষ্পপাত্র ধরিয়া আছেন, এইরূপ মূর্তি ; দেব-নর্তকীগণের নৃত্যরতা মূর্তি ; গন্ধর্বগণের নানা বাদ্যযন্ত্রসহ মূর্তি ; অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি—কেহ পুষ্প হস্তে, কেহ আয়না হস্তে, কেহ বৃক্ষশাখা ধরিয়া আছেন, কেহ পদ্ম হস্তে ইত্যাদি। সারি সারি তোরণ, ধর্মচক্র ; —রত্নখচিত ; সারি সারি অসি-হস্তে দেবগণ ও কলস-কাঁখে দেবীগণের মূর্তি, কিছু দেবীগণের মস্তকে আলোকিত প্রদীপের প্রতিমূর্তি ; এই সকল ধাতুকক্ষে স্থাপিত হইল।

কক্ষের চারি কোণে স্তূপাকার স্বর্ণ, মূল্যবান রত্ন, মণিমুক্তা ইত্যাদি রাখা হইল। কক্ষের দেওয়ালে বিদ্যুতলতার আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত করিয়া কক্ষের শোভা বর্ধন করা হইল। রাজার নির্দেশে কক্ষের উক্ত সকল মূর্তিগুলি স্বর্ণে নির্মিত হইল। ॥ ৮৯-৯৭ ॥

মহান ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষু ইন্দগুত্তের তত্ত্বাবধানে ধাতুকক্ষের মধ্যে উক্ত সকল কিছু নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজার ধর্মবলে, ভিক্ষুগণের ও দেবগণের ঋদ্ধিবলে বিনা বাধায় উক্ত কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইল। ॥ ৯৮-৯৯ ॥

যদি ধর্মের শুভাশীষ ধন্য কোন বিজ্ঞজন পরম-জ্ঞানী, পরম-শ্রেষ্ঠ, পরম-পূজ্য, অন্ধকার-মুক্ত, প্রভু বুদ্ধকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার পরিনির্বাণের পর তাঁহার ধাতুসমূহকে সজ্ঞানে (যাহা সকল মানুষের মুক্তির জন্য চারিদিকে বিতরিত হইয়াছে) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তবে তিনি এই ধাতুপূজায় জীবন্ত প্রভু বুদ্ধকে পূজার সম-পর্যায়ের পুণ্য অর্জন করিবেন। ॥ ১০০ ॥

ধাতুকক্ষ নির্মাণ সমাপ্ত

এইখানে ত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'ধাতুকক্ষ নির্মাণ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. বেশী বালিতে তৈরী স্তূপ বেশীদিন স্থায়ী হবে না। তাই এতে রাজা অসম্মত হলেন।

২. এগারো কুনকেতে এক অম্মন হয়।

৩. 'পরিবেণ' হল, যে স্থানে ধর্মের আলোচনা ও শিক্ষা দেয়া হয়।

৪. ঘি রঙের।

৫. বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী মহাযানী গ্রন্থাদি থেকে নেয়া হয়েছে। সুতরাং কিছু কাল্পনিক কাহিনীও রয়েছে।

৬. বুদ্ধের প্রতি দেবদত্ত যে মত্ত হস্তী লেলিয়ে দিয়েছিল তাকে বলা হয়। এইখানে এবং 'মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থে উক্ত হস্তীর নাম 'ধনপাল' বলা হলেও অন্যান্য গ্রন্থে এই হস্তীর নাম বলা হয়েছে 'নালাগিরী' অথবা 'মালাগিরী'। আবার কিছু মহাযানী গ্রন্থে এই হস্তীর নাম বলা হয়েছে 'বসুপাল'।

৩১

মহাস্তূপে ধাতু প্রতিষ্ঠা

শত্রুবিজয়ী রাজা গামণি ধাতুকক্ষের কার্য সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, 'ভন্তে! ধাতুকক্ষের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। আগামীকল্য আমি উহাতে ধাতু প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। অতএব আপনারা ধাতু আনয়নের ব্যবস্থা করুন।' রাজা ইহার পর নগরে প্রবেশ করিলেন। ভিক্ষুসংঘ উক্ত স্থানে থাকিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া ঠিক করিলেন যে ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষু সোনুত্তর রাজার স্তূপের জন্য ধাতু আনিবেন। সেই ভিক্ষু তখন বিহারের পরিবেণে অবস্থান করিতেছিলেন। ॥ ১-৪ ॥

কথিত আছে, কোন এককালে অতীতের কোন এক শাস্তা যখন ভিক্ষুগণের সহিত গঙ্গার তীর ধরিয়া ধর্মপ্রচারের জন্য চলিতেছিলেন, তখন নন্দুত্তর নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বুদ্ধ ও তাঁহার ভিক্ষুগণকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন।

একসময় শাস্তা ভিক্ষুগণ সহ প্রয়াগের ঘাটে নৌকায় আরোহণ করেন। সেই সময় ষড়ভিজ্ঞ ঋদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষু ভদ্দজি দেখিলেন যে নদীর জলে একস্থানে ঘূর্ণি সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! এক জন্মে আমি যখন রাজা মহাপনাদ ছিলাম, তখন আমার কুড়িযোজন দীর্ঘ যে বিশাল স্বর্ণপ্রাসাদটি ছিল, উহা বর্তমানে এই ঘূর্ণির স্থানে নিমজ্জিত আছে। গঙ্গার জল তাই এই স্থানে ঘুরিতেছে।
॥ ৫-৯ ॥

ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুর কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং শাস্তাকে উহা জানাইলেন। শাস্তা ইহা শুনিয়া সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভিক্ষু! তুমি ভিক্ষুগণের মনের অবিশ্বাস দূর কর।'

অতঃপর সেই ভিক্ষু ব্রহ্মলোক অবধি বিস্তৃত স্বীয় ঋদ্ধিশক্তি দেখাইতে মহাশূন্যে সাততলা অবধি ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিত দুস্স স্তূপটি তাহার বিস্তৃত হস্তে ধারণ করিয়া সকলকে উহা দেখাইলেন। ইহার পর সেই স্তূপটি আবার তিনি যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

সেই ভিক্ষু এইবার গঙ্গার ঘূর্ণিজলে প্রবেশ করিয়া অলৌকিক শক্তিতে প্রাচীন স্বর্ণ প্রাসাদের চূড়াটি পায়ের বুড়ো আঙুলের ফাঁকে চাপিয়া ধরিয়া নদীর জল হইতে উহা উপরে তুলিয়া আনিয়া সকলকে দেখাইয়া আবার উহা নদীর জলে নিমজ্জিত করিলেন। ভিক্ষু সোনুত্তর, যিনি সেই সময় ব্রাহ্মণ নন্দুত্তর ছিলেন, এই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সংকল্প

করিয়াছিলেন, 'আমি যেন এইরূপ ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধর্মের কাজে নিযুক্ত হই।' ॥ ১০-১৪ ॥

উক্ত সংকল্পের কারণেই ভিক্ষুসংঘ এই জন্মে এই ভিক্ষুকেই বুদ্ধের ধাতু আনয়ন করিবার দায়িত্ব প্রদান করেন যদিও তাঁহার বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। তিনি ভিক্ষুসংঘের নির্দেশ শুনিয়া বলিলেন 'ভন্তে! বুদ্ধের ধাতু কোথা হইতে আনিতে হইবে?' ভিক্ষুসংঘ তখন ভিক্ষুকে ধাতু সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন :—

'প্রভু বুদ্ধ পরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন, 'হে দেব! আমার পরিনির্বাণের পর এই নশ্বর দেহ দাহ করিয়া যে আট দ্রোণ ধাতু (পূতাস্থি) জগতের হিতের জন্য চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে, তাহার এক দ্রোণ পূতাস্থি যাইবে রামগ্রামের কোলিয়দের[১] নিকটে। সেই স্থান হইতে সেই পূতাস্থি নাগলোকে যাইবে। তথায় পূজ্য হইলেও উহা শেষে লংকাদ্বীপের মহাস্তূপে গিয়া অবস্থান করিবে।' ॥ ১৫-১৯ ॥

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাজ্ঞানী ভিক্ষু মহাকশ্যপ[২]. রাজা ধর্মাশোকের কালে বুদ্ধের পূতাস্থি নানাস্থানে পুনঃ বিতরণ করা হইবে জ্ঞাত হইয়া, বুদ্ধের সাত দ্রোণ পূতাস্থি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া রাজা অজাতশত্রুর সময়ে উহা রাজগৃহে একত্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজা ধর্মাশোক সেই সকল পূতাস্থি দেখিয়া ভাবিলেন বুদ্ধের সম্পূর্ণ আট দ্রোণ পূতাস্থিই একত্রিত করা হইয়াছে।

ভিক্ষু মহাকশ্যপ প্রভু বুদ্ধের ইচ্ছার কথা জানিতেন। তাই তিনি কোলিয়দের নিকটে প্রদত্ত আর এক দ্রোণ পূতাস্থি সংগ্রহ করেন নাই। অন্যান্য অর্হতগণ ও রাজা ধর্মাশোককে উক্ত পূতাস্থির সন্ধান করিতে দেন নাই। ॥ ২০-২৪ ॥

রামগ্রামের কোলিয়রা গঙ্গার ধারে একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া উহার মধ্যে বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। গঙ্গার প্লাবনে স্তূপটি ভাঙিয়া জলে পড়িলে বুদ্ধের পূতাস্থির কৌটাটিও নদীর জলে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে একসময় মহাসমুদ্রে গিয়া পড়ে। মহাসমুদ্রে উহা দুই বিপরীত স্রোতের[৩] মধ্যস্থলে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিয়া ভাসিতে থাকে। ॥ ২৫-২৬ ॥

সমুদ্রের নাগগণ পূতাস্থির কৌটাটি দেখিয়া সত্বর 'মঞ্জেরিক' প্রাসাদে গিয়া উহা তাঁহাদের রাজা কালনাগকে জানাইলেন। দশ হাজার কোটি নাগসহ রাজা কালনাগ ছুটিয়া গিয়া বুদ্ধের পূতাস্থি সম্বলিত কৌটাটি তাঁহার প্রাসাদে লইয়া আসেন। সেইখানে রত্নখচিত একটি চৈত্য নির্মাণ

করিয়া পূতাস্থির কৌটাটি উহার মধ্যে স্থাপন করিয়া পূতাস্থির পূজা করিতে লাগিলেন। রাজা কালনাগ সেই চৈত্যের চারিধারে রক্ষীও নিযুক্ত করেন। ॥ ২৭-২৯ ॥

বুদ্ধের পূতাস্থির অবস্থানস্থল সম্বন্ধে ভিক্ষুসংঘ সোনুত্তরকে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, 'হে ভন্তে! উক্ত পূতাস্থি এইখানে আনুন। রাজা উহা আগামীকল্য মহাস্তূপে প্রতিষ্ঠা করিবেন।'

ভিক্ষু সোনুত্তর ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। ॥ ৩০-৩১ ॥

বিহারে নিজের কক্ষে বসিয়া ভিক্ষু সোনুত্তর ভাবিলেন, রাজা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামীকল্য বুদ্ধের পূতাস্থি মহাস্তূপে প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং সেই কারণে যাহা করণীয় তাহা করিতে হইবে। রাজা নির্দেশ দিয়েছেন যেন সারা নগর ও উহার মার্গসকল[৪] সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। নগরবাসিগণ যেন উৎসব সজ্জায় সজ্জিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিয়েছেন সমগ্র লংকাদ্বীপকে সুন্দর-রূপে সাজাইতে। ॥ ৩২-৩৪ ॥

নগরের চারটি প্রবেশদ্বারে রাজা রাজ্যবাসিগণের জন্য বস্ত্র, আহার্য প্রভৃতি রাখিয়াছেন। ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চদশ উপসথ দিবসের সায়াহ্নে রাজা প্রফুল্লচিত্তে অলংকার ও রাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, রণসজ্জায় সজ্জিত চতুরঙ্গ সৈন্যদলের ও হস্তীদলের সম্মুখভাগে, চারিটি শ্বেতশুভ্র সিন্ধুদেশের অশ্বে চালিত স্বীয় রথে চড়িয়া, সুসজ্জিত প্রিয় কণ্ডুল হস্তীকে তাঁহার সম্মুখে গজেন্দ্রগমনে চলিতে দিয়া, সালংকারা সুন্দরী রাজনর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। শ্বেতছত্রের নীচে ধাতু রাখিবার সুবর্ণ কৌটা হস্তে রাজা রথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নগরের অসংখ্য সুন্দরী রমণীগণ নিজেদের প্রসাধনে ও অলংকারে ভূষিত করিয়া জলপূর্ণ মঙ্গলকলস, পুষ্পপাত্র, প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ প্রভৃতি লইয়া রাজার রথের দুই পাশে দাঁড়াইল। নগরের অসংখ্য বালক-বালিকাগণ উৎসব সাজে সজ্জিত হইয়া বহুবর্ণের পতাকা হস্তে সারিবদ্ধ ভাবে সেই শোভাযাত্রার শোভাবর্ধন করিল। অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের শব্দের মধুর সঙ্গীত এবং অশ্ব, হস্তী ও চতুরঙ্গ সৈন্যদলের পদশব্দে ধরণী যেন জাগিয়া উঠিল। রাজা এইরূপে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া মহামেঘ বনের দিকে চলিলে, মনে হইল ঠিক যেন দেবরাজ ইন্দ্র নন্দন বনের দিকে চলিয়াছেন। ॥ ৩৬-৪৪ ॥

ভিক্ষু সোনুত্তর স্বীয় কক্ষে বসিয়া রাজার শোভাযাত্রার শব্দ শুনিতে

পাইলেন। তিনি সেই সময় অলৌকিক শক্তিতে ভূমি ভেদ করিয়া মুহূর্তে নাগরাজের রাজপ্রাসাদে কালনাগের[৫] সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। রাজ-অতিথিকে যেইরূপ আতিথেয়তা প্রদান করা হয়, সেইরূপে রাজা ভিক্ষুকে সম্মান দেখাইলেন।

রাজা ভিক্ষুকে তাঁহার আগমনের কারণ এবং কোথা হইতে তিনি আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু রাজাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত ভিক্ষুসংঘের বার্তাটিও প্রদান করিলেন। ভিক্ষুসংঘ নাগরাজকে এইরূপ বার্তা দিয়াছেন, 'মহারাজ! আপনার নিকট বুদ্ধের যে পূতাস্থি রহিয়াছে উহা লংকাদ্বীপের মহাস্তূপে প্রতিষ্ঠা করিতে প্রভু বুদ্ধ নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব উহা আপনি প্রদান করুন।'

নাগরাজ উক্ত বার্তা শুনিয়া মানসিক যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষু অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। তিনি এই পূতাস্থি বলপূর্বক লইয়া যাইবার শক্তি রাখেন। অতএব পূতাস্থি এইস্থান হইতে গোপনে সরাইয়া দেওয়াই মঙ্গল।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেইস্থানে উপস্থিত তাঁহার ভাগিনেয়কে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে অলক্ষ্যে ইশারা করিলেন। সেই ভাগিনেয়, বাসুলদত্ত, রাজার উক্ত ইঙ্গিত বুঝিয়া পূতাস্থির চৈত্যে গিয়া পূতাস্থি-রক্ষিত কৌটাটি বাহির করিয়া উহা গিলিয়া ফেলিয়া মুহূর্তে সুমেরু পর্বতের[৬] পাদদেশে গিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া অবস্থান করিল। তাহার কুণ্ডলীর বেড় ছিল এক যোজন এবং দৈর্ঘে সে ছিল তিনশত যোজন। সেই নাগ কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়া অসংখ্য ফণা বাহির করিয়া অগ্নি ও ধূম্র উদ্‌গীরণ করিল। অসংখ্য বিষধর সর্পগণ আসিয়া এই সর্পের চারিদিকে বসিল। ॥ ৪৫-৫৫ ॥

সেই সময় বহু নাগ ও দেবতাগণ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন 'আমরা দুই মহানাগের[৭] দ্বন্দ্ব দেখিতে পাইব।' রাজা কালনাগ যখন বুঝিলেন যে পূতাস্থি তাঁহার ভাগিনেয় এই স্থান হইতে লইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ভিক্ষুকে বলিলেন, 'হে ভন্তে! আমার নিকট বুদ্ধের পূতাস্থি নাই।' ভিক্ষু রাজাকে বুদ্ধের পূতাস্থি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! সেই পূতাস্থি আপনি আমাকে প্রদান করুন।' ॥ ৫৬-৫৮ ॥

অতঃপর রাজা কালনাগ ভিক্ষুকে পূতাস্থির চৈত্যের নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! এই রত্নখচিত মনোরম চৈত্যটি বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপনের জন্যই নির্মিত হইয়াছে। সমগ্র লংকাদ্বীপে যত মণিরত্ন রহিয়াছে উহা এই চৈত্যের ভূমিস্থিত শেষ ধাপের প্রস্তর খণ্ডেরও সমতুল্য নয়।

চৈত্যের আর অন্যান্য মণিরত্ন সম্বন্ধে আর কী বলিব। তবে, নিশ্চয় আপনি এইরূপ উচ্চস্থান হইতে বুদ্ধের পূতাস্থিকে কোন নীচু স্থানে লইয়া গিয়া রাখিয়া উহার অসম্মান করিবেন না ?' ।। ৫৯-৬২ ।।

ইহা শুনিয়া ভিক্ষু সোনুত্তর বলিলেন, 'মহারাজ! এই রাজ্যের নাগগণ বুদ্ধের চতুরার্যসত্য সম্বন্ধে উদাসীন। যে রাজ্যে বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, পূতাস্থি সেই রাজ্যে থাকিলেই উহার যথার্থ মূল্য হইবে। জগতের সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তির মানসে তথাগতরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। এই পূতাস্থিও বুদ্ধের সেই আদর্শ প্রচার করিবে। বুদ্ধের প্রদত্ত নির্দেশ পালন করিতে আমি উহা লঙ্কাদ্বীপে লইয়া যাইব। লঙ্কার রাজা এই পূতাস্থি অদ্য মহাস্তূপে স্থাপন করিবেন। অতএব সত্বর উহা আমাকে প্রদান করুন।' ।। ৬৩-৬৫ ।।

রাজা কালনাগ বলিলেন, 'ভন্তে! বুদ্ধের উক্ত পূতাস্থি আমার নিকট নাই। আপনি উহা পাইলে স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে পারেন।' ভিক্ষু তিনবার রাজাকে পূতাস্থি প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনবারই রাজা উক্ত কথাগুলি বলিলেন।

অতঃপর ভিক্ষু সোনুত্তর সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঋদ্ধিবলে তাঁহার হস্ত প্রসারিত করিয়া, দীর্ঘ সরু হস্তটি রাজার ভাগিনেয়র মুখ-গহ্বর দিয়া প্রবেশ করাইয়া সেই সর্পের পেট হইতে বুদ্ধের পূতাস্থি-রক্ষিত কৌটাটি বাহির করিয়া আনিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া ভিক্ষুর দিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলে, ভিক্ষু চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'হে নাগ! স্থির থাক।' সেই কথা বলিবা মাত্র মহারাজ কালনাগ প্রস্তর মূর্তির ন্যায় স্থাণুর হইল। তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না। ।। ৬৬-৬৮ ।।

ভিক্ষু সোনুত্তর পূতাস্থি লইয়া ভূমিতে ডুব দিয়া মুহূর্তে বিহারে নিজের কক্ষে গিয়া উঠিলেন। ভিক্ষু চলিয়া গেলে নাগরাজ ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে যাহা দেখাইলেন উহা মায়ামাত্র। আমরা তাঁহাকে ঠকাইয়াছি।' তিনি তাঁহার ভাগিনেয়র নিকট নির্দেশ পাঠাইলেন পূতাস্থি সহ ফিরিয়া আসিতে। কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় বাসুলদত্ত পূতাস্থির কৌটাটি তাহার পেটের মধ্যে পাইল না। উহা যেন উধাও হইয়া গিয়াছে। বাসুলদত্ত দুঃখে রোদন করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে উহা ব্যক্ত করিল।

ইহা শুনিয়া নাগরাজ কালনাগ দুঃখে হতাশ হইলেন। রোদন করিয়া তিনি বলিলেন, 'ভিক্ষু আমাদের ঠকাইয়াছেন।' অন্যান্য নাগগণও রাজার সহিত দুঃখে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু দেবতাগণ ভিক্ষুর এই জয়ে

আনন্দিত হইলেন। নাগশ্রেষ্ঠ এই ভিক্ষুকে তাঁহারা অভ্যর্থনা করিলেন।

নাগগণ দুঃখে রোদন করিতে করিতে লংকাদ্বীপের ভিক্ষুসংঘের নিকট গিয়া ভিক্ষুর পূতাস্থি অপহরণের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। ভিক্ষুসংঘ তাহাদের দুঃখ দেখিয়া অনুকম্পাবশতঃ সামান্য কিছু পূতাস্থি নাগদের প্রদান করিলেন। তাহারা পূতাস্থির পূজা করিবে এবং ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে বলিয়াও অঙ্গীকারবন্ধ হইল। নাগগণ পূতাস্থি পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের রাজ্যের সেই চৈত্যে উহা স্থাপন করিয়া পূজা বন্দনা শুরু করিল। ।। ৬৯-৭৪ ।।

যে কক্ষের ভূমি ভেদ করিয়া ভিক্ষু সোনুত্তর বুদ্ধের পূতাস্থির কৌটা লইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ আসিয়া একটি রত্নখচিত সিংহাসন স্থাপন করিয়া পূতাস্হি সম্বলিত কৌটাটি ভিক্ষুর হাত হইয়া লইয়া সেই সিংহাসনে রাখিয়া উহার পূজা-বন্দনা করিলেন।

বিশ্বকর্মা মহামেঘবনে একটি রত্নখচিত তাঁবু স্থাপন করিলেন। ভিক্ষুসংঘ পূতাস্থিসহ উক্ত রত্নখচিত স্বর্ণ সিংহাসনটি শোভাযাত্রা সহকারে আনিয়া এই তাঁবুর নীচে রাখিলেন। ব্রহ্মা পূতাস্থির উপর ছত্র ধরিলেন। দেবপুত্র সন্তুষিত চামর হস্তে এবং দেবপুত্র সুয়াম রত্নখচিত পাখা হস্তে উক্ত সিংহাসনের দুই দিকে দাঁড়াইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র শঙখ হস্তে দাঁড়াইলেন। চারিজন দিকপাল রাজা তরবারি হস্তে পাহারায় রহিলেন এবং তেত্রিশজন অলৌকিক শক্তিধর দেবগণ স্বর্গীয় পুষ্প ছড়াইয়া পুষ্পেরৎ পাত্র হস্তে দাঁড়াইলেন। বত্রিশজন অপ্সরা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইলেন। দুষ্ট যক্ষগণ যাহাতে সেই স্থানে না আসে তাই আঠাশজন যক্ষপতি উক্ত স্থানে পাহারায় রহিলেন। পঞ্চশিখ[১] ও তাঁহার অনুচরগণ বাঁশী, তানপুরা ইত্যাদি নানা যন্ত্রে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। নানা দেবতাগণ সেই সঙ্গীতের সহিত সুর মিলাইয়া মধুর গীত গাহিতে লাগিলেন। স্বর্গের নাগরাজ মহাকালও বুদ্ধের স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় গীত ও সঙ্গীতে চারিদিক ব্যাপ্ত হইল। দেবতাগণ সুগন্ধী আতর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ।। ৭৫-৮৪ ।।

ভিক্ষু ইন্দগুত্ত স্থানটি মার-এর প্রভাব মুক্ত করিতে ঋদ্ধিবলে একটি বিশাল তাম্রনির্মিত ছত্রও প্রস্তুত করিলেন।

অতঃপর চারিদিক হইতে ভিক্ষুগণের সমবেত মধুর গীত শোনা গেল। প্রফুল্ল চিত্তে তখন রাজা দুট্‌ঠগামণি বিশাল শোভাযাত্রা সহ মহামেঘবনে প্রবেশ করিয়া তাঁবুর নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্ষুসংঘ রাজাকে বুদ্ধের পূতাস্হির কৌটাটি প্রদান করিলে রাজা উহা তাঁহার হস্তের সুবর্ণ কৌটার মধ্যে স্হাপিয়া সিংহাসনে কৌটাটি রাখিয়া করজোড়ে

পূতাস্থিকে প্রণাম ও বন্দনা করিলেন। ॥ ৮৫-৮৮ ॥

রাজা উক্ত স্থানে স্বর্গীয় বাদ্য ও সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বর্গীয় ছত্র, চামর, পাখা ইত্যাদি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা ও অপ্সরাদের চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন না। রাজা স্বর্গীয় সঙ্গীতে এবং এই অলৌকিক দৃশ্যে আনন্দিত হইলেনও রাজা ছত্রের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি পূতাস্থিকে লংকাদ্বীপের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন।

'জগৎপতি ও শাস্তার উপর তিনটি ছত্র রহিয়াছে—স্বর্গীয় ছত্র, জাগতিক ছত্র ও মুক্তির ছত্র, আমি তাঁহাকে তাই তিনবার লংকাধিপতি-রূপে অভিষিক্ত করিলাম।' এই কথা বলিয়া রাজা বুদ্ধের পূতাস্থিকে অভিষিক্ত করিলেন। ॥ ৮৯-৯২ ॥

অতঃপর দেবগণ ও নরগণ উক্ত পূতাস্থিকে প্রণাম বন্দনা করিলে, রাজা পূতাস্থির স্বর্ণ কৌটাটি নিজের মস্তকের উপরে ধরিয়া ভিক্ষুসংঘ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বামদিক হইতে মহাস্তূপটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহার পর রাজা স্তুপের পূর্বদিকের দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ধাতুকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। নব্বই কোটি অর্হত ভিক্ষু মহাস্তূপের চারিদিকে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা মনস্থ করিলেন 'আমি এই পূতাস্থির কৌটাটি বহুমূল্যের আসনের উপর রাখিব।' মুহূর্তে পূতাস্থির কৌটাটি রাজার মস্তকের উপর হইতে শূন্যে উঠিয়া গেল। কৌটাটি খুলিয়া গিয়া পূতাস্থিগুলি বাহির হইয়া প্রভু বুদ্ধের রূপ ধারণ করিল। সেই প্রতিচ্ছবি বুদ্ধের প্রদর্শিত ঋদ্ধি প্রদর্শন করিল। উহা দুইটি বুদ্ধের রূপ ধারণ করিল[১০]। ইহা দেখিয়া বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ ও দেবতাগণ অর্হত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অসংখ্যজন 'অনাগামী' হইলেন। ॥ ৯৩-১০১ ॥

উক্ত অলৌকিক দৃশ্য দেখাইয়া পূতাস্থিগুলো আবার কৌটার মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেই কৌটা রাজার মস্তকের উপর আসিয়া বসিল। রাজা ভিক্ষু ইন্দগুত্তসহ ধাতুকক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া পূতাস্থির কৌটাটি ধাতু-কক্ষের আসনে স্থাপন করিলেন। ইহার পর রাজা সুগন্ধি জলে স্বীয় হস্ত ধৌত করিয়া, পাঁচ প্রকার সুগন্ধি আতর হস্তে মাখিয়া রাজা পূতাস্থির কৌটাটি খুলিয়া পূতাস্থিসহ কৌটা বাহির করিয়া সংকল্প করিলেন, 'এই ধাতু জনগণের হিতের জন্য যদি চিরকাল স্থিত হয়, যদি ইহা মানুষের পরম আশ্রয়স্থল হয়, তবে এই ধাতু যেন প্রভু বুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া নির্বাণ-শয্যায় চিরকাল শায়িত থাকে।' ॥ ১০২-১০৭ ॥

রাজা উক্ত সংকল্প করিয়া বুদ্ধের পূতাস্থি তাঁহার নির্বাণ শয্যা

কল্পিত আসনে বিছাইয়া দিলেন। পুতাস্থি সেই আসনে প্রভু বুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়া রহিল।

আষাঢ় মাসের পঞ্চদশ উপশথ দিবসের পূর্ণিমায় উত্তরাষাঢ় নক্ষত্র তিথিতে বুদ্ধের পুতাস্থি এইরূপে মহাস্তূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সময় পৃথিবী প্রকম্পিত হইল। বহু অলৌকিক ঘটনার উদ্ভব হইল। সাতদিন ধরিয়া রাজা মহাস্তূপের পূজা করিলেন এবং এই মহাস্তূপকে লঙ্কাধিপতি রূপে জ্ঞান করিলেন। ॥ ১০৮-১১১ ॥

রাজা তাঁহার দেহের অলঙ্কার সকল মহাস্তূপের ধাতুকক্ষে রাখিয়া দিলেন। রাজনর্তকীগণ, অমাত্যগণ, পরিচারিকাগণ ও তাহাই করিলেন। রাজা ভিক্ষুসংঘকে চীবর, চিনি, ঘি ইত্যাদি প্রদান করিলেন। ভিক্ষুগণ সারারাত্রি ব্যাপী সূত্র পাঠ করিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ভেরীর শব্দে ঘোষণা করিলেন যে, নগরবাসিগণ যেন সাতদিন ধরিয়া এই ধাতু দর্শন ও পূজা করেন। রাজা জনগণের মঙ্গলকামনা করিয়াই ইহা করিলেন। মহাজ্ঞানী ষড়ভিজ্ঞ ভিক্ষু ইন্দগুপ্ত বলিলেন 'লঙ্কাদ্বীপবাসিগণ যাহারা এই ধাতু দর্শনও পূজা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন একসঙ্গে আসিয়া ইহা করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যায়। ভিক্ষুর এই নির্দেশই আদেশ হইয়া দাঁড়াইল। ॥ ১১২-১১৬ ॥

রাজা এই সাতদিন ধরিয়া ভিক্ষুসংঘকে খাদ্য পানীয় ও নানা সামগ্রী দান করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে ! ধাতুকক্ষে যাহা করণীয় উহা আমি করিয়াছি। একবার ভিক্ষুসংঘ ধাতুকক্ষ বন্ধ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুক।'

॥ ১১৭-১১৮ ॥

ভিক্ষুসংঘ দুইজন ভিক্ষুকে[১১] এই কার্যের ভার দিলেন। সেই ভিক্ষুদ্বয় বাকি একটি প্রস্তর খণ্ড দিয়া ধাতুকক্ষের উপরে ঢাকনার ন্যায় স্থাপন করিয়া কক্ষটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

'কক্ষের কোন বস্তুই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। কোন পুষ্পেই মলিন হইবে না। কোন প্রজ্বলিত প্রদীপ নিভিবে না। মেদবর্ণের ছয়টি প্রস্তর খণ্ড চিরকাল লাগিয়া থাকিবে।' অর্হত ভিক্ষুগণ এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন। ॥ ১১৯-১২১ ॥

জনগণের মঙ্গলকামী রাজা নির্দেশ দিলেন, 'এইবার জনগণ উক্ত ধাতুকক্ষের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।' রাজার নির্দেশে জনগণ যতখানি সম্ভব তাহাই করিল। স্তূপের মধ্যে উহা সুরক্ষিত রহিল।

রাজা এইবার মহাস্তূপে প্রবেশের রুদ্ধদ্বার সমেত সমস্ত স্তূপটি ইষ্টক দিয়া ঢাকিয়া উহার চতুর্দিকে ইষ্টক দ্বারা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করিলেন।

॥ ১২২-১২৪ ॥

বুদ্ধগণ অপরিসীম, বুদ্ধগণের প্রকৃতি অপরিসীম, বুদ্ধগণের ধর্মে অনুগতদের পারিতোষিকও অপরিসীম। যাঁহারা ধার্মিক তাঁহারা পুণ্যকর্ম করিয়া শুভাশীষ প্রাপ্ত হইয়া মহিমান্বিত হন। তাঁহারা শুদ্ধ চিত্তে অন্যকেও পুণ্যকর্ম করিতে উদ্বুদ্ধ করেন যাহাতে বহু জাতির[১২] পুণ্যবানদের সংখ্যা জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ।। ১২৫-১২৬ ।।

মহাস্তূপে ধাতু প্রতিষ্ঠা সমাপ্ত

এইখানে একত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল—'মহাস্তূপে ধাতু প্রতিষ্ঠা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. কোলিয়রা ছিল শাক্যদের প্রতিবেশী। দুই গোষ্ঠীর গ্রামের মধ্যে দিয়ে রোহিণী নদী প্রবাহিত হত। এই নদীর জল নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হত।

২. ভিক্ষু মহাকশ্যপ প্রথম ধর্ম মহাসম্মেলনের সভাপতি ছিলেন।

৩. **Turnour** বলেছেন 'গঙ্গার দুই বিপরীত স্রোত'। এটা সম্ভব নয়। **Geiger** বলেছেন 'সমুদ্রের দুই ভাগ জল'। এটাও ঠিক নয়। সমুদ্রে নানা স্রোত প্রবাহিত হয়, তাই 'দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যস্থলে' কথাটাই সঠিক বলে মনে হয়।

৪. যেই সব রাস্তা মহামেঘ বনে এসে পৌঁছায়।

৫. বাসুকীকে বলা হয়েছে।

৬. প্রাচীন কাল্পনিক পাহাড়, যা নাকি ছিল পৃথিবীর মধ্যস্থলে।

৭. দুই মহানাগ বলতে ভিক্ষু সোনুত্তরকেও পরম বিক্রমী নাগের সমকক্ষ রূপে বলা হয়েছে।

৮. তাবতিংশ স্বর্গের ফুল। মহাবগ্গ এবং জাতকে এর উল্লেখ আছে।

৯. গন্ধর্বদের রাজা।

১০. মহাযানীরা বলেন বুদ্ধ শ্রাবন্তীতে এই ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন। বিষয়টি সন্দেহাতীত নয়।

১১. টীকাকার এই দুই ভিক্ষুর নাম বলেছেন, উত্তর আর সুমন।

১২. বহু জাতি বলতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বোঝায়।

৩২

তুষিত স্বর্গে প্রবেশ

মহাস্তূপের পলেস্তারের কাজ ও শীর্ষের ছত্রের কাজ সম্পূর্ণ না হইতেই রাজা গামণি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই অসুখ ছিল জীবনহানিকারী। তিনি দীঘবাপি হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, 'মহাস্তূপের কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকিলে উহা তুমি সম্পূর্ণ কর।' ভ্রাতার এই অসুস্থতার কারণে তিষ্য মহাস্তূপটিকে শ্বেতশুভ্র বস্ত্রে ঢাকিয়া সেই বস্ত্রের উপর পুষ্পবেদীকা ও সারিবদ্ধ পুষ্পপূর্ণ পাত্র এবং চারিধারে রেলিং ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া দিতে নির্দেশ দিলেন। বাঁশের কঞ্চি দ্বারা ছত্র নির্মাণ করাইয়া ও খরপত্র দিয়া চাঁদ ও সূর্য বেদীকার দুইদিকে স্থাপন করাইয়া তিষ্য সুচতুরভাবে সুবর্ণ রঙের মৃত্তিকা দ্বারা স্তূপের আবরণটি রাঙাইয়া দিলেন। এই সকল করিয়া তিষ্য রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! স্তূপের যাহা অসম্পূর্ণ ছিল তাহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে'।

॥ ১-৬ ॥

শয্যাশায়ী রাজা পালকীতে করিয়া মহাস্তূপের নিকট গিয়া পালকীতে শায়িত অবস্থায় মহাস্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া উহার দক্ষিণ দ্বারের নিকট গিয়া স্তূপটিকে প্রণাম-বন্দনা করিলেন।

অতঃপর ভূমিতে শয়নের চৌকি পাতিয়া দিলে রাজা উহাতে শয়ন করিয়া বাম দিকে পাশ ফিরিলে মহাস্তূপটি দেখিতে পাইলেন। ভিক্ষুসংঘ দ্বারা পরিবৃত রাজা ইহাতে আনন্দিত হইলেন। ॥ ৭-৯ ॥

ভিক্ষুগণ রাজার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নানা স্থান হইতে রাজার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছেন। ছিয়ানব্বই কোটি ভিক্ষু তখন রাজার নিকট উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়া নানা সূত্র সমস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। রাজা ভিক্ষুদের মধ্যে ভিক্ষু থেরপুস্থাভয়কে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'এই ভিক্ষু পূর্বাশ্রমে ছিলেন পরাক্রম যোদ্ধা। তিনি আমার সঙ্গে আঠাশটি ভয়ানক যুদ্ধের সঙ্গী ছিলেন। কখনও তিনি পিছু হটেন নাই। অথচ তিনি আজ আমার পাশে নাই! এই ভয়ানক মরণ-সংগ্রামে তিনি আমাকে কেন সাহায্য করিতে আসেন নাই? তিনি কি এই সংগ্রামে আমার পরাজয় দেখিয়াছেন?'

॥ ১০-১৩ ॥

এই ভিক্ষু পঞ্জলি পর্বতে করিন্দ নদীর উৎসে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে রাজার উক্ত ভাবনা জানিতে পারিয়া পাঁচশত অর্হৎ

ভিক্ষুসহ সত্বর আকাশপথে উড়িয়া রাজার নিকট আসিয়া অন্যান্য ভিক্ষু-গণের সহিত রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রাজা ভিক্ষুকে দেখিয়া আনন্দে তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! পূর্বে আমি দশজন বীর যোদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলাম। সেই যোদ্ধা-গণের মধ্যে আপনিও ছিলেন। এখন আমি এই মরণ-সংগ্রামে একলা যুদ্ধে নামিয়াছি। এই শত্রুকে আমি একলা জয় করিতে পারিব না।' ॥ ১৪-১৭ ॥

ইহা শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি গণপতি। আপনার কিসের ভয়? পাপরূপ শত্রুকে জয় না করিলে মরণ-শত্রুকে জয় করা সম্ভব নয়। যাহার উৎপত্তি হয় উহার বিনাশও হয়। জগতের সকল কিছুই বিনাশশীল। শাস্তা তাই তো শিখাইয়াছেন। প্রভু বুদ্ধও মরণশীল ছিলেন। ইহাতে লজ্জা বা ভয়ের কিছু নাই। মহারাজ! এই জগত দুঃখময়, মায়াময়। এই জগতের সকল কিছুই বিনষ্ট হইবে। এই জীবনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল আপনার অপরিসীম। আপনি স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিয়া ইহ জীবনে বহু পুণ্যকর্ম করিয়াছেন। লঙ্কাদ্বীপে আপনার একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছে। অদ্য অবধি যে সকল পুণ্যকর্ম আপনি করিয়াছেন, সেই সকল অমূল্য পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করুন। ইহাতে আপনার দুর্ভাবনা দূর হইবে।' ॥ ১৮-২৩ ॥

রাজা ভিক্ষুর ভাষণ শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, 'ভন্তে! এই একলা সংগ্রামেও আপনি আমাকে সাহায্য করিলেন।'

রাজা আনন্দে তাঁহার রাজকার্যের খতিয়ানটি আনিয়া পাঠ করিতে নির্দেশ দিলেন। কর্মচারী রাজার নির্দেশে উক্ত খতিয়ানটি উচ্চস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। ॥ ২৪-২৫ ॥

'রাজা গামণি নিরানব্বইটি বিহার নির্মাণ করিয়াছেন। উহাতে উনিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। মরিচভট্‌ঠি বিহার ও মনোরম লোহপাসাদ নির্মাণ করিতে ত্রিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। মহাস্তূপের মূল্যবান সামগ্রীতে কুড়ি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। আর মহাস্তূপের অন্যান্য হাজার বিষয়ে হাজার কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।' এইরূপে রাজকর্মচারী পড়িয়া চলিল, 'কোট্‌ঠ পর্বত অঞ্চলে 'অক্‌খখায়িক'[১] দুর্ভিক্ষে রাজা গামণি স্বীয় দুইটি মূল্যবান কর্ণ-মাকড়ি দিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পাঁচজন অর্হত ভিক্ষুগণকে অম্লস্বাদের ভুট্টার মণ্ড দিয়াছিলেন। চূলঙ্গণিয় যুদ্ধে রাজা পরাজিত হইয়া পলায়নকালে অর্হত ভিক্ষু তিষ্যকে স্বীয় অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন।' ॥ ২৬-৩২ ॥

এইবার রাজা নিজেই বলিতে লাগিলেন, 'মরিচভট্‌টি, লোহপাসাদ ও মহাস্তূপের অভিষেককালে সাতদিন ধরিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে মহাউৎসব

হইয়াছিল। সেই উৎসবে চতুর্দিকের বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে মহাদান দিয়াছিলাম। পুতাস্থি মহাস্তূপে প্রতিষ্ঠাকালেও সাতদিন ধরিয়া যে উৎসব হয়, উহাতে বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে মহাদান প্রদান করি। আমি চব্বিশটি বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাউৎসব করি। তিনবার আমি লংকাদ্বীপের ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করি। 'সাতদিন ধরিয়া পাঁচবার আমি ধর্মকে এই দ্বীপের রাজারূপে অভিষিক্ত করি। আমি হাজার বাতি অখণ্ড প্রদীপ রূপে দ্বীপের বারোটি স্থানে ধর্মের নামে স্থাপন করিয়াছি। আঠারো বার আঠারো স্থানে আমি অসুস্থদের পরিচর্যা করিতে খাদ্য-পানীয় ও ঔষধ বিতরণ করিয়াছি।

চুয়াল্লিশটি স্থানে আমি অখণ্ড মধুমিশ্রিত পায়েসান্ন বিতরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছি। বহু স্থানে আমি তেলেভাজা চাউল পিণ্ড[২] দান করিয়াছি। আবার বহুস্থানে আমি জাল-পীঠা[৩] দান করিয়াছি। মাখনে সেঁকে চাউল দিয়ে উহা প্রস্তুত করিয়েছি। উপসথ দিবসে আমি আটটি বিহারে, প্রতিমাসের এক দিবসে, জ্বালানি তেল দান করিয়াছি। যেহেতু সকল দান অপেক্ষা ধর্ম দানই শ্রেষ্ঠ, তাই আমি লোহপ্রাসাদ বিহারের পাদদেশে ভিক্ষুসংঘের মধ্যস্থলে সভাপতির আসনে বসিয়া মঙ্গলসূত্র আবৃত্তি করিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু উপস্থিত মান্যবর ভিক্ষুগণের সম্মুখে সম্ভ্রমে কোন সূত্রই আমি আবৃত্তি করিতে পারিলাম না। তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে লংকাদ্বীপের প্রতিটি বিহারে যেন ভিক্ষুগণ উপস্থিত জনগণকে ধর্মদেশনা করেন, এবং সেই কারণে সেই ভিক্ষুগণকে আমি পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলাম। যে সকল ভিক্ষু এইরূপ ধর্মদেশনা করেন তাঁহাদের আমি একখণ্ড মাখন, গুড় ও চিনি, চার ইঞ্চি দীর্ঘ যষ্ঠিমধু (যট্ঠিমধুকা) ও এক জোড়া চীবর প্রদান করিয়াছিলাম! এই সকল দানে রাজার মনে আনন্দ উৎপন্ন হইলেও, দুইটি বিশেষ জীবন-উপেক্ষা দানে, আমার মন্দ অবস্থায়, আমি অধিক প্রীত হইয়াছিলাম।'

॥ ৩৩-৪৭ ॥

ভিক্ষু অভয় রাজার এই উক্তি শুনিয়া রাজার সেই দুঃসময়ের জীবন-বিপন্ন করা দান দুইটির কথা ব্যক্ত করিলেন। 'কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় রাজা গামণি পাঁচজন অর্হত ভিক্ষুকে অম্লস্বাদের ভুট্টার মণ্ড প্রদান করেন। এই পাঁচজন ভিক্ষুর মধ্যে ভিক্ষু মলয় মহাদেব, তাঁহার ভাগের মণ্ড লইয়া সুমনকূট পর্বতের বিহারে গিয়া নয়শত ভিক্ষু উহা প্রদান করিয়া তারপর নিজে আহার করিয়াছিলেন। ভিক্ষু ধম্মগুত্ত, যিনি ঋদ্ধিবলে পৃথিবী প্রকম্পিত করিতে পারেন, কল্যাণী-বিহারের পাঁচশত ভিক্ষুকে তাঁহার ভাগ হইতে মণ্ড দিয়া পরে নিজে আহার

করিয়াছিলেন। তলংগ-বিহারের ভিক্ষু ধম্মদিন্ন তাঁহার মণ্ডের ভাগ হইতে পিয়ঙ্গুদিপ প্রদেশের বারো হাজার ভিক্ষুকে মণ্ড দিয়া পরে নিজে আহার করিয়াছিলেন। মংগন প্রদেশের ঋদ্ধিসম্পন্ন অর্হত ভিক্ষু ক্ষুদ্দতিষ্য তাঁহার ভাগের মণ্ড হইতে কেলাস-বিহারের ষাট হাজার ভিক্ষুকে মণ্ড দিয়া পরে নিজে আহার করিয়াছিলেন। ভিক্ষু মহাব্যাগ্ঘ৪ উক্কনগর-বিহারের সাতশত ভিক্ষুগণকে তাঁহার মণ্ড হইতে প্রদান করিয়া পরে নিজে আহার করিয়াছিলেন। ॥ ৪৮-৫৪ ॥

আর চুলঙ্গনিয় যুদ্ধে রাজা যে ভিক্ষুর পাত্রে আহার্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভিক্ষু পিয়ঙ্গুদিপ প্রদেশের বারো হাজার ভিক্ষুকে সেই আহার্য প্রদান করিয়া পরে নিজে আহার করিয়াছিলেন। ॥ ৫৫ ॥

ভিক্ষু অভয় এই কথা বলিয়া রাজার মনে আনন্দের উদ্রেক করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া ভিক্ষুকে বলিলেন, 'ভন্তে! চব্বিশ বছর ধরিয়া আমি ভিক্ষুসংঘের সেবার দায়ক রহিয়াছি। আমার এই নশ্বর দেহও তাহাই। এই মহাস্তূপের অনতিদূরে ভিক্ষুসংঘের এই দীন দাসের নশ্বর দেহ মৃত্যুর পর যেন দাহ করা হয়।' ॥ ৫৬-৫৮ ॥

অতঃপর রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যকে বলিলেন, 'হে ভ্রাতা! মহাস্তূপের কোন কাজ যদি এখনও বাকি থাকে, তবে উহা সত্বর শেষ করিতে যত্নবান হও। সকাল ও সন্ধ্যায় এই ধাতুস্তূপে পুষ্প প্রদান করিবে। দিনে তিনবার স্তূপকে প্রণাম-বন্দনা করিবে। প্রভু বুদ্ধের ধর্মপালনে আমি যে সকল উৎসবের অবতারণা করিয়াছি উহা তুমি নির্দ্ধিধায় পালন করিয়া যাইবে। ভিক্ষুসংঘের প্রতি কর্তব্যে কখনও ক্লান্তবোধ করিবে না।' এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া রাজা চুপ হইলেন। ॥ ৫৯-৬২ ॥

সেই সময় ভিক্ষুগণ সমবেত কণ্ঠে সূত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ছয়টি স্বর্গের ছয়টি দেবতা ছয়টি স্বর্গীয় রথে একে একে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে রাজাকে বিনয়ে অনুরোধ করিলেন, 'মহারাজ! এইবার আমাদের স্বর্গীয় দেবলোকে আপনি পদার্পণ করুন।' ॥ ৬৩-৬৪ ॥

রাজা দেবতাদের হাতের ইশারায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া, তাঁহাদের হাতের ইশারায় বলিলেন, 'হে দেবগণ! আমি এইবার ধর্মদর্শন শুনিব। আপনারা ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।' ॥ ৬৫ ॥

রাজার হাতের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া ভিক্ষুগণ ভাবিলেন, রাজা হয়তো তাঁহাদের সূত্র আবৃত্তি থামাইতে বলিতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া ভিক্ষুগণ সূত্র আবৃত্তি থামাইলেন। রাজা ভিক্ষুগণের সূত্র আবৃত্তি থামাইবার কারণ জানিতে চাহিলে ভিক্ষুগণ বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি

যে হাতের ইশারায় আমাদের থামিতে বলিয়াছেন?' রাজা বলিলেন, 'ভন্তে! আমার হাতের ইশারা আপনাদের উদ্দেশে ছিল না।' এই বলিয়া রাজা ভিক্ষুগণকে বিষয়টি ব্যক্ত করিলেন। ॥ ৬৬-৬৭ ॥

রাজার সেই কথা শুনিয়া উপস্থিত কেহ কেহ ভাবিলেন, 'মৃত্যুভয়ে রাজার বিকার উৎপন্ন হইয়াছে।' ভিক্ষু অভয় এই সকলের সংশয় দূর করিতে রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ! স্বর্গীয় রথসকল যে এই স্থানে আসিয়াছে উহা কীরূপে বুঝিব? কিছুই তো দেখা যাইতেছে না।' বিজ্ঞ রাজা ইহা বলিবার কারণ বুঝিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! কিছু পুষ্প মালা দেবতাদের দিকে নিক্ষেপ করুন।' ভিক্ষু উহা করিলে, কিছু মালা স্বর্গীয় রথের অঙ্গে লাগিয়া ঝুলিতে লাগিল। ॥ ৬৮-৭০ ॥

উপস্থিত নগরবাসিগণ দেখিলেন মালাগুলি শূন্যে রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের সংশয় দূর হইল। ॥ ৭১ ॥

অতঃপর রাজা গামণি ভিক্ষু অভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভন্তে! কোন্ দেবলোক সকলের অপেক্ষা মনোরম?' ভিক্ষু বলিলেন, 'মহারাজ! পুণ্যবানগণ বলেন তুষিত স্বর্গই সকল দেবলোক অপেক্ষা মনোরম। এই স্বর্গে মহাকারুণিক মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ধরায় অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ হইতে অবস্থান করিতেছেন। ॥ ৭২-৭৩ ॥

মহাজ্ঞানী রাজা ভিক্ষুর উক্ত কথা শুনিয়া মহাস্তূপের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়া শায়িত অবস্থায় চক্ষু মুদিলেন। ॥ ৭৪ ॥

সেইক্ষণে রাজা মৃত্যুবরণ করিয়া পুনর্জন্মে তুষিত স্বর্গ হইতে আগত স্বর্গীয় রথের উপর দিব্যদেহ ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন। কৃত পুণ্যকর্মের কারণে লব্ধ এই পুরস্কার স্পষ্ট করিতে রাজা স্বীয় স্বর্গীয় জ্যোতিতে রথারূঢ় হইয়া মহাস্তূপের চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া উপস্থিত জনগণকে উহা দেখাইয়া মহাস্তূপ ও ভিক্ষুসংঘকে প্রণাম-বন্দনা করিয়া তুষিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ॥ ৭৫-৭৭ ॥

যেই স্থানে রাজনর্তকীগণ শোকাহত হইয়া স্বীয় মস্তকের ভূষণ খুলিয়া ফেলিয়াছিল, পরে সেই স্থানে 'মকুটমুক্তশালা' নামক একটি হলঘর নির্মাণ করা হয়। যে স্থানে রাজার নশ্বর দেহ চিতায় শায়িত হইলে শোকার্ত জনগণ বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিল সেই স্থানে নির্মিত হলঘরটিকে 'রবিভট্টিশালা[৬]' বলা হইল।

মহামেঘবন-বিহারের বাহিরে ও মহাস্তূপের নিকটে রাজার নশ্বর দেহ দাহ করা হয়। সেই স্থানটিকে 'রাজমালক' নামে চিহ্নিত করা হইল।

॥ ৭৮-৮০ ॥

মহান, স্বনামখ্যাত, রাজা দুট্ঠগামণি একসময় মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রথম

শিষ্য হইবেন। তাঁহার বর্তমান পিতা তখন মৈত্রেয় বুদ্ধের পিতা হইবেন। রাজার বর্তমান মাতা তখন মৈত্রেয় বুদ্ধের মাতা হইবেন। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সদ্দাতিষ্য তখন মৈত্রেয় বুদ্ধের দ্বিতীয় শিষ্য হইবেন। রাজার পুত্র শালিরাজকুমার তখন মৈত্রেয় বুদ্ধের পুত্র হইবেন। ॥ ৮১-৮৩ ॥

যিনি শুদ্ধ জীবনকে পরম শ্রেষ্ঠ মানিয়া পুণ্যকর্ম করিয়া জ্ঞানতঃ কৃত পাপকর্মকে অতিক্রম করেন, তিনি মৃত্যুর পর, স্বগৃহে যাইবার ন্যায় স্বর্গারোহণ করেন। সেই কারণে জ্ঞানীগণ পুণ্যকর্মে সর্বক্ষণ আনন্দিত হয়। ॥ ৮৪ ॥

তুষিত স্বর্গে প্রবেশ সমাপ্ত

এইখানে দ্বিত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'তুষিত স্বর্গে প্রবেশ'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. যে দুর্ভিক্ষে মানুষ ফলমূল না পেয়ে ফলের বীচি খেতো।
২. তেলেভাজা চালের পিঠে।
৩. সেঁকা পিঠে।
৪. থূববংশে ভিক্ষুর নাম বলা হয়েছে 'মহাভগ্‌গ'।
৫. যদিও তেত্রিশটি স্বর্গের কথা আমরা মহাযানী গ্রন্থে পাই, কিন্তু এইখানে কেবল ছয়টি স্বর্গের কথা বলা হয়েছে। কাহিনীটি 'থূপবংশ' গ্রন্থেও রয়েছে।
৬. 'থূপবংশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ভিরভিট্‌ঠি' আর মহাবংশে বলা হয়েছে 'রভিভট্‌টি'। দুটো শব্দই এখানে অর্থহীন। 'বিলাপ করে কাঁদা'—এই কোন শব্দেই তা বোঝায় না। খুব সম্ভবত শব্দটি হবে 'ভিরভত্তি'। যেখানে বিলাপ করে কাঁদা হয়েছিল সেখানে যে হলঘরটি নির্মাণ করা হয় সেটির নাম হল 'ভিরভত্তিশালা'।

৩৩

দশ রাজার কথা

রাজা দুট্‌ঠগামণির রাজত্বকালে রাজ্যের প্রজাগণ সুখেই ছিলেন। শালিরাজকুমার ছিলেন রাজা গামণির পুত্র। ॥ ১ ॥

পুণ্যাত্মা এই রাজকুমার পুণ্যকর্মে আনন্দিত হইতেন। পরমা সুন্দরী এক চণ্ডাল কন্যাকে কোমল হৃদয়ের এই যুবরাজ ভালবাসিতেন। অশোকমালাদেবী নামক এই কন্যা পূর্বজন্মে যুবরাজের অর্ধাঙ্গিণী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ যুবরাজ রাজকর্মে নিরাসক্ত থাকিয়া কেবল এই কন্যার প্রতি গভীর প্রণয়ে ডুবিয়া থাকিতেন। রাজ্যশাসনের প্রতি যুবরাজের নিরাসক্ততার কারণে রাজা দুট্‌ঠগামণির মৃত্যুর পর রাজার ভ্রাতা শ্রদ্ধাতিষ্যকে রাজারূপে অভিষিক্ত করা হইল। অতুলনীয় এই রাজা আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা মহাস্তূপের চূড়ার ছত্র, পলেস্তারের কাজ ও স্তূপের চারিধারে সারিবদ্ধ হস্তীমূর্তির প্রাকার নির্মাণ করিয়া ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে নিজের নামের যথার্থ মূল্য দিলেন। ॥ ২-৫ ॥

অপরূপ লোহপাসাদ-বিহারটি একদিন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে এই রাজা উহা পুনরায় নবরূপে সপ্ততল বিশিষ্ট করিয়া নির্মাণ করেন। সেই লোহপাসাদের মূল্য হইল নব্বই লক্ষ মুদ্রা। রাজা শ্রদ্ধাতিষ্য আটটি মনোরম বিহার নির্মাণ করেন, যথা—দক্ষিণগিরী-বিহার, কল্লকালেন-বিহার, কলমুবক-বিহার, পেত্‌তঙ্গবালিকা-বিহার, ভেলংগাবিট্‌ঠিক-বিহার, দুবুবলভাপিতিষ্যক-বিহার, দুরতিষ্যকভাপি-বিহার ও মাতুবিহারক-বিহার। ইহা ব্যতীত অনুরাধপুর হইতে দীঘবাপি অবধি রাস্তার প্রতি যোজনে রাজা একটি করিয়া বিহার নির্মাণ করেন। ॥ ৬-৯ ॥

তাছাড়া, এই রাজা চৈত্য সম্বলিত দীঘবাপি-বিহারটি নির্মাণ করেন। উক্ত চৈত্য সপ্তরত্নখচিত জালে আবৃত ছিল। জালের বুননের ফাঁকে শকটের চাকার ন্যায় বৃহৎ স্বর্ণ-পুষ্প ঝুলিত। উহা রাজার নির্দেশেই হইয়াছিল। ধর্মদর্শনের চুরাশি হাজার অংশের সম্মানার্থে রাজা চুরাশি হাজার প্রকারের দানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজা আঠারো বৎসর রাজত্ব করিয়া নানা পুণ্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুর পর পুনর্জন্মে তুষিত দেবলোকের দেবগণের মধ্যে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। ॥ ১০-১৩ ॥

রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের সময়েও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লঞ্জাতিষ্য

গিরিকুম্ভিল নামক একটি মনোরম বিহার নির্মাণ করেন। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র থুলথান 'কন্দর' নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন। রাজা শ্রদ্ধাতিষ্য যখন তাঁহার ভ্রাতা দুট্ঠগামণির নিকট অনুরাধপুরে গিয়াছিলেন, সেই সময় মুলথানও পিতার সহিত রাজা গামণির নিকট গিয়া বিহার নির্মাণের জন্য ভূমি প্রার্থনা করেন। ॥ ১৪-১৬ ॥

বাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের মৃত্যুর পর রাজার উপদেষ্টাগণ থুপরাম-বিহারে ভিক্ষুসংঘের সহিত একত্রিতে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। উক্ত পরামর্শে ভিক্ষুসংঘও সকলের সম্মতিক্রমে রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের কনিষ্ঠ পুত্র থুলথানকে রাজারূপে রাজ্যশাসনের জন্য অভিষিক্ত করা হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লজ্জাতিষ্য ইহা জ্ঞাত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া থুলথানকে পরাভূত[১] করিয়া বলপূর্বক রাজ্যশাসনের দায়িত্ব নিলেন। থুলথান কেবল একমাস দশদিন রাজা ছিলেন। ॥ ১৭-১৯ ॥

রাজা লজ্জাতিষ্য তিন বৎসর অবধি ভিক্ষুসংঘকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ভিক্ষুসংঘ বয়সের উপযুক্ততা বিচার করিলেন না'। অবশ্য পরে ভিক্ষুসংঘের সহিত এই বিরোধ মিটিয়া গেলে রাজা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মহাস্তূপের পূজার জন্য তিনটি পাষাণ বেদী নির্মাণ করিয়া দিলেন। ইহার পর রাজা এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহাস্তুপের চারিধারে মাটি ফেলিয়া স্থানটি সমান করিলেন ও বাগানটি মনোরম প্রস্তরের পাতে ঢাকিয়া দিলেন। এই স্থানের পূর্বদিকে রাজা একটি পাষাণ-স্তূপ ও ভিক্ষুসংঘের জন্য 'লজ্জাকাসন' নামক একটি হলঘর নির্মাণ করিলেন। রাজা খন্দক স্তূপটিও মনোরম প্রস্তর পাতে ঢাকিয়া দিলেন। ॥ ২০-২৫ ॥

রাজা চৈত্য পর্বতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে গিরীকুম্ভিল নামক একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। সেই বিহারের উদ্বোধন উৎসবে রাজা ষাট হাজার ভিক্ষুকে ছয়প্রকার[২] বস্ত্র প্রদান করিতে নির্দেশ দিলেন। ॥ ২৬ ॥

রাজা 'অরিতৃথ-বিহার' ও 'কুঞ্জরহিনক-বিহার' নির্মাণ করিলেন এবং গ্রামের বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুগণকে ওষুধ বিলি করিলেন। ভিক্ষুণী-গণকে রাজা তাঁহাদের ইচ্ছামত চাউল প্রদান করিলেন। এই রাজা নয় বৎসর পনেরো দিন রাজত্ব করেন। ॥ ২৭-২৮ ॥

রাজা লজ্জাতিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা খল্লাটনাগ ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা লোহপাসাদের চারিধারে ভিক্ষুদের জন্য বত্রিশটি মনোরম কক্ষ নির্মাণ করিয়া উক্ত বিহারের শোভা বর্ধন করিলেন। মহাস্তুপের চারিদিকে প্রদক্ষিণের জন্য এই রাজা সুরম্য পথ নির্মাণ করিলেন। ইহাকে 'হেমমালি' বলা হইল। এই রাজা

'কুরুন্দভাশোক' নামক একটি বিহারও নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত এই রাজা আরও নানা পুণ্যকর্ম করেন। ॥ ২৯-৩২ ॥

কম্মহারত্তক নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহ করিয়া রাজা খল্লাটনাগকে তাঁহার রাজধানীতেই পরাভূত করেন। কিন্তু রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বত্তগামণি সেই শয়তান সেনাপতিকে হত্যা করিয়া রাজ্যশাসন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন। ॥ ৩৩-৩৪ ॥

রাজা খল্লাটনাগের পুত্র মহাচুলককে তিনি স্বীয় পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং রাজমহিষী অনুলাদেবীকে নিজের রাণী করেন। বত্তগামণি এইরূপে ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতার আসন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে 'পিতিরাজ' বলা হইল। ॥ ৩৫-৩৬ ॥

উক্ত রাজার অভিষেকের পঞ্চম মাসে রোহণ প্রদেশের তিষ্য নামক এক নির্বোধ ব্রাহ্মণ এক ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বহু অনুচরও তাঁহার সঙ্গে জুটিল। সেই সময় সাতজন দমিল তাহাদের সৈন্যদল সহ মহাতীর্থ বন্দরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তিষ্য দমিলগণের বলে বলীয়ান হইয়া রাজাকে একটি পত্র পাঠাইয়া তাঁহার রাজছত্র প্রদান করিতে বলিলেন। তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা বত্তগামণি ব্রাহ্মণ তিষ্যকে লিখিয়া জানাইলেন, 'উক্ত প্রদেশটি এখন আপনার। আপনি দমিলগণকে বিতাড়িত করুন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তবে তাহাই হউক'। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তিষ্য দামিলগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। ॥ ৩৭-৪১ ॥

অতঃপর দামিলগণ রাজা বত্তগামণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। কোলম্বালক নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল এবং সেই যুদ্ধে রাজা বত্তগামণি পরাজিত হইলেন। তিনি দুই রাণী ও দুই পুত্রকে লইয়া রথে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। নিগ্রন্থীগণের তিত্থিয়ারামের প্রবেশদ্বারের নিকটে রাজা বত্তগামণি রথে চড়িলে গিরি নামক একজন নিগ্রন্থী উহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন 'মহা কালসিংহ[৩] দেখ পলায়ন করিতেছে।' রাজা ইহা শুনিয়া ভাবিলেন, 'যদি আমার কার্য সিদ্ধ হয় তবে আমি ফিরিয়া আসিয়া এইস্থানে একটি বিহার নির্মাণ করিব।'

॥ ৪২-৪৪ ॥

রাণী অনুলাদেবী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁহার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য এবং দুই পুত্র মহাচুল ও মহানগকে বাঁচাইতে রাজা তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইলেন। রথ হাল্কা না থাকিলে দ্রুতগতিতে চলা যাইবে না। তাই রাজা তাঁহার দ্বিতীয় রাণী সোমদেবীকে, স্বীয় মুকুটের মনোরম রত্নটি

উপহার দিয়া, রাণীর সম্মতি লইয়া, তাঁহাকে রথ হইয়া নামাইয়া দিলেন।
॥ ৪৫-৪৬ ॥

রাজা বত্তগামণি যুদ্ধে গেলে পরিবারের উক্ত সদস্যদেরও তিনি সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তাই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নকালে তাঁহারা রাজার সঙ্গেই ছিলেন। রাজা প্রাসাদে যাইতে সময় পায় নাই বলিয়া বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটিও তিনি সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। রাজা বসুসগিরির জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। কুপিককুল-বিহারের মহাতিষ্য নামক এক ভিক্ষু রাজা ও তাঁহার পুত্র পরিবারকে উক্ত জঙ্গলে অবস্থান করিতে দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার সংগৃহিত ভিক্ষান্নের কিছু অংশ তাঁহাদেরও প্রদান করিতেন। ॥ ৪৭-৪৯ ॥

রাজা প্রীত হইয়া ভিক্ষুসংঘকে বিহারের জন্য কিছু ভূমি দান করিবার নির্দেশ কেয়াফুলের পাতায় লিখিয়া রাখিলেন। ॥ ৫০ ॥

উক্ত জঙ্গলে কিছুদিন অবস্থান করিয়া রাজা পুত্রপরিবারসহ শিলাশোব্ভকণ্ডক নামক স্থানে গেলেন। সেইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তাঁহারা সামগল্ল নামক স্হানের নিকটে অবস্হিত মাতুভেলংগ নামক স্হানে গেলেন। সেইখানে তাঁহাদের সহিত পুনরায় কুপিককুল-বিহারের ভিক্ষু মহাতিষ্যের সাক্ষাৎ হইল। সেই ভিক্ষু রাজা বত্তগামণি ও তাঁহার পুত্রপরিবারকে তাঁহার পরিচারক, বিশ্বস্ত তনশিবের দায়িত্বে দিলেন। এই বিশ্বস্ত তনশিবের গৃহে রাজা বত্তগামণি ও তাঁহার পুত্র পরিবার চৌদ্দ বৎসর অবস্হান করেন। তনশিব তাঁহাদের সকলকে চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া পোষণ করেন। ॥ ৫১-৫৩ ॥

সেই সাতজন দমিলগণের মধ্যে একজন দমিল সুন্দরী সোমদেবীর রূপে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রপথে নিজের দেশে[৪] ফিরিয়া গেলেন। আর একজন দমিল বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া খুশী মনে নিজের দেশে ফিরিয়া গেলেন। ॥ ৫৪-৫৫ ॥

কিন্তু দমিল পুলহত্থ অপর একজন দমিল 'বাহিয়'কে নিজের সেনাপতি করিয়া তিন বৎসর লংকাদ্বীপে রাজত্ব করেন। এই সেনাপতি বাহিয় দমিল রাজা পুলহত্থকে হত্যা করিয়া রাজা হন। তিনি দুই বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজার সেনাপতি ছিলেন 'পনয়মারক'। পনয়মারক রাজা বাহিয়কে হত্যা করিয়া রাজা হন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা পনয়মারক-এর সেনাপতি ছিলেন 'পিলয়মারক'। এই সেনাপতি পিলয়মারক রাজা পনয়মারক'কে হত্যা করিয়া রাজা হন। তিনি সাতমাস রাজত্ব করেন। এই রাজার সেনাপতি ছিলেন 'দাঠিক'। দামিল দাঠিক রাজা পিলয়মারককে হত্যা করিয়া রাজা হন। তিনি দুই

বৎসর অনুরাধপুরে রাজত্ব করেন। এই পাঁচজন দমিল রাজা চৌদ্দ বৎসর সাতমাস লংকাদ্বীপে রাজত্ব করেন। ॥ ৫৬-৬১ ॥

মলয়প্রদেশে তনশিবের গৃহে অবস্থানকালে একদিন রাণী অনুলাদেবী তাঁহাদের খাদ্য আনিতে রন্ধনশালায় গেলে তনশিবের পত্নী অবজ্ঞাভরে রাণীকে প্রদত্ত খাদ্যের পাত্রটি পা দিয়া ঠেলিয়া রাণীকে দিলেন। রাগে দুঃখে অভিভূত রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে রাজাকে গিয়া ঘটনাটি জানাইলেন। তনশিব হইা শুনিয়া রাজার মহাক্রোধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে ধনুর্বাণ লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন। রাজা রাণীর নিকট ঘটনাটি শুনিয়া দুঃখীত মনে স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় সহ সেই গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে, তাহাদের লইয়া গৃহের বাহিরে আসিলে, ধনুর্বাণ হস্তে তনশিবকে দেখিয়া মুহূর্তে স্বীয় ধনুকে শরস্থাপন করিয়া তনশিবকে শরদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ॥ ৬২-৬৪ ॥

অতঃপর রাজা নিজের পরিচয় ঘোষণা করিলেন। ইহাতে তাঁহার বহু অনুচর জুটিয়া গেল। তিনি আটজন নামী যোদ্ধাকে তাঁহার অমাত্য করিলেন। রাজা লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ॥ ৬৫-৬৬ ॥

রাজা কুপিকক্কল বিহারের ভিক্ষু মহাতিষ্যকে প্রভু বুদ্ধের সম্মানার্থে অচ্ছগল্ল-বিহারে উৎসব করিতে নির্দেশ দিলেন। সেই সময় রাজার নবনিযুক্ত অমাত্য কপিসীস আকাশ-চৈত্যের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া রাস্তার উপর বসিলেন। রাজা বত্তগামণি ও রাণী উক্ত চৈত্যে যাইতে এই অমাত্যকে রাস্তায় বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। কিন্তু অমাত্য কপিসীস রাজাকে দেখিয়াও সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন না। তিনি অবজ্ঞাভরে বসিয়াই রহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অমাত্য কপিসীসকে হত্যা করিলেন। ॥ ৬৭-৬৯ ॥

এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য সাতজন অমাত্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যথাইচ্ছা চলিয়া যাইতে গেলে পথিমধ্যে দস্যুরা তাঁহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইল। ইহার পর তাঁহারা হম্বুগল্লক-বিহারে আশ্রয় লইলেন। সেইখানে তাঁহাদের সহিত মহাজ্ঞানী ভিক্ষু তিষ্যের সাক্ষাৎ হইল। ॥ ৭০-৭১ ॥

চারি নিকায়জ্ঞ ভিক্ষু তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও আহার্য প্রদান করিলেন। তাঁহারা তৃপ্ত ও সজীব হইলে ভিক্ষু তিষ্য তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্রগণ! আপনারা কোথায় যাইতেছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা ভিক্ষুকে সকল কিছু ব্যক্ত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভন্তে! কাহার দ্বারা বুদ্ধের ধর্মের বিকাশ হইবে? রাজা বত্তগামণির

দ্বারা না দমিল রাজার দ্বারা? ভিক্ষু বলিলেন, 'হে মিত্রগণ! রাজা বট্টগামণির দ্বারাই ধর্মের বিকাশ হইবে।' ভিক্ষু তাঁহাদের এই বিষয়ে সন্দেহাতীত করিয়া, দুই ভিক্ষু তিষ্য ও মহাতিষ্য তাঁহাদের রাজা বট্টগামণির নিকট লইয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ রাজার সহিত অমাত্যগণের বিরোধ দূর করিলেন। রাজা ও উক্ত অমাত্যগণ ভিক্ষুদের বলিলেন 'ভন্তে! আমাদের সুদিন আসিলে, সংবাদ পাঠাইলে আপনারা আমাদের নিকট আসিবেন।' ভিক্ষুগণ ইহাতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ॥ ৭২-৭৭ ॥

অতঃপর রাজা বট্টগামণি দলবল লইয়া অনুরাধপুরে গিয়া দমিল রাজা দাঠিক-কে হত্যা করিয়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সত্বর নিগ্রন্থীগণের তিত্থিয়ারামটি ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে বারো কক্ষবিশিষ্ট একটি বিহার নির্মাণ করিলেন। মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপনের দুইশত সতের বৎসর দশমাস দশদিন পর রাজা পুণ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ হইয়া অভয়-গিরি-বিহার নির্মাণ করিলেন। রাজা দুই ভিক্ষু তিষ্য ও মহাতিষ্যকে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে, যিনি রাজাকে বিপদের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন, রাজা উক্ত বিহারটি সম্মানার্থে তাঁহাকে দান করিলেন। যেহেতু রাজা বট্টগামণি অভয় উক্ত বিহারটি নির্মাণ করেন, নিগ্রন্থগিরি আবাসের স্থলে, সেই কারণে বিহারটির নাম হইল 'অভয়গিরি বিহার'। ॥ ৭৮-৮৩ ॥

রাজা সোমদেবীর স্মৃতিতে 'সোমরাম-বিহার' নির্মাণ করেন। উক্ত রাণী স্বেচ্ছায় রাজার রথ হইতে অবতরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়াছিলেন। একজন শ্রমণ আড়ালে প্রস্রাব করিতে গিয়া সোম-দেবীকে উক্ত স্থানে দেখিয়াছিলেন। রাজা ইহা শুনিয়া সেই স্থানে উক্ত বিহারটি নির্মাণ করেন। ॥ ৮৪-৮৬ ॥

মহাস্তূপের উত্তরে রাজা একটি সুউচ্চ চৈত্য নির্মাণ করেন। উহার নাম হইল শীলাসোবভকণ্ডক। ॥ ৮৭ ॥

রাজার সাতজন পরমবীর যোদ্ধার মধ্যে অন্যতম উত্তিয় নগরের দক্ষিণ অংশে 'দক্ষিণ বিহার' নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন। সেই স্থানেই রাজার 'মুল' নামক অমাত্য 'মুলবকাশ' নামক স্বীয় নামযুক্ত বিহারটি নির্মাণ করেন। ॥ ৮৮-৮৯ ॥

রাজার শালিয় নামক অমাত্য 'শ্যালিয়রাম' বিহার নির্মাণ করেন। অমাত্য পব্বত 'পব্বতারাম'-বিহার নির্মাণ করেন। আর অমাত্য তিষ্য 'উত্তর-তিষ্যারাম'-বিহার নির্মাণ করেন। এই সকল মনোরম বিহার-গুলি নির্মিত হইলে অমাত্যগণ ভিক্ষু তিষ্যের নিকট গিয়া বলিলেন, 'ভন্তে! আপনার কৃপার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই বিহারগুলি আপনাকে প্রদান

করিলাম।' এই বলিয়া রাজার অমাত্যগণ মহামান্য ভিক্ষুকে বিহারগুলি দান করিলেন। ॥ ৯০-৯২ ॥

উক্ত ভিক্ষু নানা ভিক্ষুকে উক্ত বিহারগুলিতে রাখিলেন। অমাত্যগণ সেই সকল ভিক্ষুগণকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করিলেন। রাজাও ভিক্ষুগণকে যথাযোগ্য দান প্রদান করিলেন যাহাতে বিপুল সংখ্যক ভিক্ষুগণও অমাত্যগণের প্রদত্ত দানে কিছুর অভাব বোধ না করেন।

॥ ৯৩-৯৪ ॥

মহাতিষ্য নামক অপর এক ভিক্ষু প্রায়ই উপাসকদিগের গৃহে যাইতেন। এই কারণে উক্ত ভিক্ষুকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত ভিক্ষুর শিষ্য বহলমস্সুতিষ্য মহাবিহার ত্যাগ করিয়া নিজের দল গড়িয়া তাহাদের লইয়া অভয়গিরি-বিহারে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সকল ভিক্ষুর আর মহাবিহারে ফিরিলেন না। এই ভিক্ষুর দলটি থেরবাদী ভিক্ষুগণের সংঘ হইতে পৃথক হইল। ॥ ৯৫-৯৬ ॥

আবার অভয়গিরি-বিহারের এই ভিক্ষুগণ হইতে কিছু ভিক্ষু সরিয়া আসিয়া আর একটি দল গড়িয়া দক্ষিণ বিহারে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইভাবে থেরবাদী ভিক্ষুসংঘ হইতে আলাদা হইয়া যে সকল ভিক্ষু সরিয়া আসিলেন, তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। ॥ ৯৭-৯৮ ॥

* রাজা বত্তগামণি বিহারের কক্ষগুলি খুবই প্রশস্ত করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই সকল কক্ষে বহু সংখ্যক ভিক্ষু একত্রে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং এইরূপে অবস্থান করিলে, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য থাকিলে উহা সহজে নিষ্পত্তি হইবে। ॥ ৯৯ ॥

* পূর্বকালে ত্রিপিটকের সূত্রগুলি ও উহার অট্‌ঠকথাগুলি জ্ঞানী ভিক্ষুগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক ধর্মজ্ঞান হ্রাস পাইতেছে, তখন তাঁহারা একত্রিত হইয়া সঠিক ধর্মকে চিরস্থায়ী করিতে উহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিলেন। ॥ ১০০-১০১ ।

রাজা বত্তগামণি-অভয় পূর্বে পাঁচ মাস ও পরে বারো বৎসর রাজত্ব করিলেন। মধ্যে তিনি দমিলগণের দ্বারা সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিলেন।

॥ ১০২ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি রাজা হইলে পরের হিতার্থে ও নিজের মঙ্গলার্থে পরিশ্রম করেন। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি রাজা হইলে পরের হিতার্থে লব্ধভোগ ত্যাগ করেন না। স্বীয় মঙ্গল ও অন্যের মঙ্গল, উহা যতই মহামূল্যের হউক না কেন, উহার জন্য তিনি নিজের লোভ সংবরণ করেন না। ॥ ১০৩ ॥

দশ রাজার কথা সমাপ্ত

এইখানে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল, 'দশ রাজার কথা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. খুব সম্ভবত তাহাকে হত্যা করা হয়।
২. প্রতিটি ভিক্ষুকে একজোড়া ত্রিচীবর দেওয়া হলো। ত্রিচীবর হচ্ছে—অন্তর্বাস, উত্তরাসঙ্গ ও সংঘাটি।
৩. রাজার গায়ের বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. ভারতবর্ষে। এরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি।
৫. চারি নিকায় হলো—দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায় ও অংগুত্তর নিকায়।
* এই অংশ দুটো পরে এইখানে যুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি কোন সময়ের কথা তার কোন উল্লেখ নেই।

৩৪

এগারোজন রাজার কথা

'বত্তগামণি-অভয়'-এর মৃত্যুর পর মহাচুলি-মহাতিষ্য ন্যায় ও ধর্মানুসারে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা শুনিয়াছিলেন যে, স্বীয় দৈহিক শ্রমে উপার্জিত বস্তু দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়। এই কারণে রাজা তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে এক শ্রমিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ধানের ক্ষেত্রে মজুরের ন্যায় কাজ করিয়া যে মজুরি লাভ করিলেন, উহা দ্বারা ভিক্ষু মহাসুমমকে আহার্য দান করিলেন। রাজা সোণ্ণগিরি প্রদেশের এক চিনির কারখানায় শ্রমিকের ছদ্মবেশে তিন বৎসর শ্রম করিয়া মজুরি হিসাবে চিনির যে ভাণ্ডগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা লইয়া রাজধানীতে গিয়া ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন।

রাজা ত্রিশ হাজার ভিক্ষু ও বারো হাজার ভিক্ষুণীকে চীবরও দান করিয়াছিলেন। ॥ ১-৬ ॥

ধরণীপতি একটি সুপরিকল্পিত বিহার নির্মাণ করিয়া ষাট হাজার ভিক্ষু ও ত্রিশ হাজার ভিক্ষুণীকে এক জোড়া করিয়া চীবর দান করিলেন। এই রাজা পাঁচটি বিহার নির্মাণ করিলেন, যথা মণ্ডবাপি-বিহার, অভয়গল্লক-বিহার, বংকাবট্ঠকগল্ল-বিহার, দীঘবাহুগল্লক-বিহার ও জালগাম-বিহার। ॥ ৭-৯ ॥

ধর্মানুরাগী রাজা নানাভাবে বহুপ্রকার পুণ্যকর্ম করিয়া চৌদ্দ বৎসর পর মৃত্যুতে স্বর্গে গিয়া আবির্ভূত হইলেন। ॥ ১০ ॥

রাজা বত্তগামণির পুত্র 'চোরনাগ' উক্ত রাজার রাজত্বকালে বিদ্রোহীর ন্যায় সঙ্গোপনে ছিলেন। উক্ত রাজার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হইলেন। রাজা হইয়া তিনি যেই সকল স্থানে পূর্বে আশ্রয় পান নাই, সেই সকল স্থানের আঠারোটি বিহার ধ্বংস করিলেন। এই রাজা বারো বৎসর রাজত্ব করেন। রাণীর দেওয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই পাপীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর রাজা 'লোকন্তরিক' নরকে, গমন করেন। ॥ ১১-১৪ ॥

এই রাজার মৃত্যুর পর মহাচুলি রাজার পুত্র তিষ্য তিন বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা চোরনাগ-এর রাণী অনুলা প্রাসাদের এক রক্ষীর প্রণয়াসক্তা ছিলেন। এই কারণে রাণী খাদ্যে বিষ মিশাইয়া রাজা চোরনাগকে হত্যা করিয়াছিলেন। রক্ষীর সহিত এই প্রণয়ের কারণে অনুলা বিষ দিয়া রাজা তিষ্যকেও হত্যা করেন। ইহার পর অনুলা রাজ্যশাসনের ভার সেই রক্ষীকে প্রদান করেন। সেই রক্ষী, যিনি ছিলেন মহাদ্বারপাল

শিব, রাজা হইয়া অনুলাকে তাঁহার রাজমহিষী করেন। তিনি দুই বৎসর দুই মাস রাজত্ব করেন। রাজমহিষী অনুলা পরে বটুক নামক এক দমিলের প্রতি প্রণয়াসক্তা হন্। এই কারণে অনুলা বিষ দিয়া রাজা শিবকে হত্যা করিয়া রাজ্যের ভার দমিল বটুক-এর হস্তে সমর্পণ করেন। এই দমিল ছিলেন রাজধানী নগরের এক ছুতার। তিনি রাজা হইয়া অনুলাকে নিজের রাণী করেন। ॥ ১৫-২১ ॥

রাণী অনুলা একদিন এক কাষ্ঠ-বাহককে প্রাসাদে আসিতে দেখিয়া তাহার প্রতি প্রণয়াসক্তা হন। ইহাতে রাণী দমিল রাজা বটুককে বিষ দিয়া হত্যা করিয়া রাজ্যশাসনের ভার দারুভটিক-তিষ্য নামক সেই কাষ্ঠ-বাহকের হস্তে অর্পণ করেন। এই রাজা অনুলাকে তাঁহার রাণী করিয়া এক বৎসর একমাস রাজত্ব করেন। এই রাজা মহামেঘবন-এ একটি স্নানের পুষ্করিণী খনন করেন। ॥ ২২-২৩ ॥

রাণী অনুলা রাজপ্রাসাদের এক দমিল ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিলিয়'র প্রণয়াসক্তা হন। এই ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইবার উদগ্র কামনায় রাণী অনুলা রাজা দারুভটিক-তিষ্যকে বিষ দিয়া হত্যা করিলেন। ইহার পর সেই ব্রাহ্মণকে রাণী রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ নিলিয় অনুলাকে স্বীয় রাণী করিয়া ছয় মাস অনুরাধপুরে বাস করিয়া রাজত্ব করেন। এই রাণী রাজপ্রাসাদের বত্রিশজন রক্ষীর প্রতি আসক্তির[১] কারণে, রাজা নিলিয়কে বিষ দিয়া হত্যা করেন। ইহার পর রাণী অনুলা স্বয়ং রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করেন ও চার মাস রাজত্ব করেন। ॥ ২৪-২৭ ॥

রাজা মহাচুলির দ্বিতীয় পুত্র কুটকণ্ণতিষ্য রাণী অনুলার ভয়ে পলায়ন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া বহু সৈন্য একত্রিত করিয়া দুষ্ট রাণী অনুলাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা চৈত্য পর্বতে উপসথ-উৎসবের জন্য একটি ইমারত নির্মাণ করেন। ইহার পূর্বদিকে তিনি একটি প্রস্তর-চৈত্যও নির্মাণ করেন। এই চৈত্যের নিকটে এই রাজা একটি মহাবোধিবৃক্ষের চারা রোপণ করেন। । ২৮-৩১ ॥

রাজা কুটকণ্ণ-তিষ্য দুই নদীর[২] মধ্যস্থিত অঞ্চলে 'পেলগাম-বিহার' নির্মাণ করেন। তিনি 'বণ্ণক' নামক একটি খাল এবং অম্বপুগ্গ ও ভয়ল্লপপ্পল নামক দুইটি পুষ্করিণী খনন করেন। তিনি রাজধানী নগরের চারিদিকে সাত হস্ত উচ্চ একটি দেওয়াল এবং পরিখা নির্মাণ করেন।

॥ ৩২-৩৩ ॥

প্রাসাদ চত্বরে রাণী অনুলার মৃতদেহ দাহ করিয়া উক্ত স্থানের কিছুটা

দূরে রাজা তিষ্য নতুন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজধানী নগরে রাজা পদুমসস্সর নামক একটি উদ্যানও স্থাপন করেন। ॥ ৩৪ ॥

পূর্বেই রাজা তিষ্যের মাতা ভিক্ষুণী হইয়া ভিক্ষুণী-সংঘে যোগ দিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার পরিবারের এক খণ্ড জমিতে তাঁহার মাতার জন্য একটি ভিক্ষুণী আগার নির্মাণ করিয়া দেন। সেই ভিক্ষুণী আগারের নাম ছিল 'দন্তগেহ'। ॥ ৩৫-৩৬ ॥

এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যুবরাজ ভাতিকাভয় রাজা হইয়া আঠাশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। যেহেতু এই পুণ্যবান ধরণীধর ছিলেন রাজা মহাদাঠিক-এর ভ্রাতা, সেই কারণে দ্বীপবাসীগণের নিকটে তিনি ভাতীক-অভয় রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। এই রাজা লোহপাসাদ-এর সংস্কার কার্য করিলেন এবং মহাস্তূপে দুইটি বেদিকা নির্মাণ করিলেন। তিনি একটি সভাগৃহও নির্মাণ করেন (থূপারাম)। ॥ ৩৭-৩৯ ॥

রাজা প্রজাগণের উপর কর ধার্য না করিয়া নিজের খরচে রাজধানী নগরের চারিদিকে এক যোজন ভূমিতে দুই প্রজাতির যূঁইফুল রোপণ করিলেন। রাজার নির্দেশে মহাস্তূপটি, নীচের বেদিকা হইতে চূড়ার ছত্র অবধি সম্পূর্ণ অঙ্গে, চারি আঙুল পরিমাণ পুরু সুমিণ্ট সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া উহার মধ্যে সযত্নে নানা বর্ণের ফুল ডাঁটা-সমেত লাগাইয়া স্তূপটিকে একটি বৃহৎ গোল পুষ্পের গোলকে পরিণত করা হইল। ॥ ৪০-৪২ ॥

আর একবার রাজা মহাস্তূপটির সমগ্র অঙ্গে আট আঙুল পরিমাণ পুরু পলেস্তারের প্রলেপ লাগাইয়া, উহার উপর ফুল গাঁথিয়া স্তূপটিকে পুষ্পের স্তূপে পরিণত করিলেন। ॥ ৪৩ ॥

আরও একবার রাজা সমগ্র স্তূপটিকে, নীচের বেদিকা হইতে চূড়ার ছত্র অবধি ফুলে আবৃত করিয়া উহাকে একটি প্রস্ফুটিত ফুলের স্তবকে পরিণত করিলেন। ॥ ৪৪ ॥

রাজা অভয়-পুষ্করিণী হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া সেই জল মহাস্তূপের উপর ঢালিয়া স্তূপটিকে জল-অর্ঘ প্রদান করিলেন। পলেস্তারের গায়ে একশত শকটপূর্ণ মুক্তা তেলের সাহায্যে সযত্নে গাঁথিয়া সেই মুক্তাখচিত পলেস্তারে মহাস্তূপের সারা অঙ্গ শোভিত করা হইল। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

রাজা সামুদ্রিক পলাযুক্ত জালে মহাস্তূপটি ঢাকিয়া সেই জালের মধ্যে শকটের চাকার ন্যায় বৃহৎ সুবর্ণ পদ্ম লাগাইয়া দিয়া জালের কানায় মুক্তার গুচ্ছ ঝুলাইয়া দিলেন।

রাজা এইরূপে নানাভাবে মহাস্তূপের পূজা ও অর্ঘ প্রদান করিলেন।
॥ ৪৭-৪৮ ॥

রাজা একদিন মহাস্তূপের মধ্যে অবস্থিত ধাতুকক্ষ হইতে অর্হত ভিক্ষুগণের সমবেত মন্ত্র উচ্চারণের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা সংকল্প করিলেন যে, তিনি সেই দৃশ্য না দেখিয়া মহাস্তূপের নিকট হইতে সরিয়া আসিবেন না। এইরূপ সংকল্পে রাজা মহাস্তূপের পূর্বদিকে স্থাপিত শিলাস্তম্ভের পাদদেশে অনশনে বসিলেন।

ইহা দেখিয়া অর্হত ভিক্ষুগণ অলৌকিক শক্তিতে মহাস্তূপে প্রবেশের একটি দ্বার সৃষ্টি করিয়া রাজাকে উক্ত ধাতুকক্ষে লইয়া গেলেন। রাজা ধাতুকক্ষের সাজ-সজ্জা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, বাহিরে আসিয়া, সেই কক্ষের অনুরূপ নানারকম মূর্তি প্রস্তুত করিয়া, সাজাইয়া, উহার পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ॥ ৪৯-৫১ ॥

চৈত্যের প্রাঙ্গণে রাজা মধু, সুগন্ধ, অগুরু চন্দনের প্রলেপ ইত্যাদি দিয়া উহার উপর ফুলের স্তবক ও পদ্ম ছড়াইয়া দিলেন। এইরূপে সারা প্রাঙ্গণটি ফুলে ফুলে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বহু ঘিয়ের, তেলের ও মধুর প্রদীপ উক্ত পুষ্পিত প্রাঙ্গণের চারিধারে জ্বালানো হইল। রাজা নগরবাসিগণকে মহাস্তূপটিকে বহুবার অর্ঘ প্রদান করিতে নির্দেশ দিলেন।
॥ ৫২-৫৭ ॥

ধর্মানুরাগী এই রাজা ধর্মে অনুপ্রাণীত হইয়া প্রতি বৎসর স্তূপের উপরের পলেস্তার পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন, এবং সেই কারণে মহাউৎসব করিতে বলিলেন। মহাবোধিবৃক্ষে জল-অর্ঘ প্রদানের দিনেও মহাউৎসব করিতে রাজা নির্দেশ দিলেন। ॥ ৫৮ ॥

এই রাজা আঠাশটি বৈশাখী পূর্ণিমা-উৎসব ও চুরাশি হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসব উদ্‌যাপন করিলেন। সে সকল উৎসবে মূকাভিনয়, নৃত্য, গীত, সঙ্গীত ইত্যাদি মহাস্তূপের সম্মানার্থে পরিবেশিত হইল। ॥ ৫৯-৬০ ॥

রাজা প্রতিদিন তিনবার স্তূপে গিয়া বুদ্ধপূজা করিতেন। তিনি জনগণকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁহারা প্রতিদিন দুইবার পুষ্পপূজা করেন।
॥ ৬১ ॥

রাজা প্রতিনিয়ত সংঘদান (ছন্দদানং) করিতেন এবং প্রবারণা-উৎসবে ভিক্ষুগণকে আহার্য প্রদান করিতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় বস্তুসকল ভিক্ষুগণকে প্রদান করিতেন যথা, জ্বালানি তেল, গুড়, চীবর ইত্যাদি। ॥ ৬২ ॥

রাজা ভিক্ষুগণের ইচ্ছানুযায়ী চৈত্য স্থাপনের জন্য নানাস্থানে ভূমি দান করিতেন। প্রতিনিয়ত রাজা রাজ্যের স্তূপগুলির সংস্কার করিতেন।

চৈত্য পর্বতের এক হাজার ভিক্ষুকে রাজা প্রতিদিন আহার্য প্রদান করিতেন। যেহেতু উক্ত পর্বতের বিহারে উহার অধিক ভিক্ষুগণ ছিলেন, সেই কারণে শলাকা দিয়া একপ্রকার লটারির দ্বারা প্রতিদিন উক্ত সংখ্যক ভিক্ষুগণকে বাছাই করা হইত। (মূলে শব্দটি রয়েছে 'শলারাবত্ত')।
॥ ৬৩-৬৪ ॥

রাজপ্রাসাদের পাঁচটি স্থানে যথা, চিত্তুপট্ঠান, মণিউপট্ঠান, মুচলুপট্ঠান, পদুমগৃহ ও সুরম্য ছত্তপ্রাসাদ প্রভৃতিতে রাজা ভিক্ষুগণের (যাঁহারা ধর্মের পবিত্র সূত্রে গ্রথিত) প্রয়োজনীয় বস্তুসকল রাখিতেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে উহা তাঁহাদের দান করিতেন। ॥ ৬৫-৬৬ ॥

ইহা ব্যতীত, পূর্বতন রাজণ্যগণ ধর্মের জন্য যেই সকল পুণ্যকর্মের নির্দেশ দিয়াছিলেন, এই রাজা ভাতিক সেই সকল নির্দেশও পালন করিতেন। ॥ ৬৭ ॥

রাজা ভাতিক-অভয়-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহাদাঠিক-মহানাগ রাজা হইয়া বারো বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বহুপ্রকার পুণ্যকর্মের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি মহাস্তূপের প্রাঙ্গণটি পাথরের পলেস্তার দিয়া ঢাকিয়া দিলেন এবং চারিধারের চক্রমনের পথটিও প্রশস্ত করিলেন। রাজ্যের প্রতিটি বিহারে তিনি ভিক্ষুগণের বসিবার জন্য প্রস্তরের আসন নির্মাণ করিয়া দিলেন। এই রাজা চৈত্য পর্বতের 'অমবত্থল' স্তূপটি স্থাপন করেন। চৈত্য পর্বতে ধ্যানে বসিয়া রাজা নিজের জীবনও বিপন্ন করিয়াছিলেন[৪]। রাজা উক্ত চৈত্যের চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করিয়া উহার উপর স্থপতির নকশা অনুযায়ী চারিটি রত্নখচিত তোরণ নির্মাণ করাইলেন। চৈত্যের উপর রাজা স্বর্ণগোলকযুক্ত মুক্তার চাঁদোয়া স্থাপন করিলেন। ॥ ৬৮-৭৪ ॥

রাজা চৈত্য পর্বতের চারিধারে প্রায় এক যোজন ভূমি সমতল করিয়া সুন্দর চলার পথ নির্মাণ করিলেন। সেই রাস্তার দুইধারে ব্যাপারিদের পণ্যদ্রব্যের বিপণি স্থাপন করিলেন। পর্বতের চারিধারে চারিটি সুদৃশ্য বিজয় তোরণ নির্মাণ করিয়া সারা রাস্তাটি পতাকা, মালা, আলোকে সজ্জিত করিলেন। রাজা নৃত্য, গীত ও সঙ্গীত পরিবেশনেরও ব্যবস্থা করিলেন।
॥ ৭৫-৭৭ ॥

দর্শনার্থীগণ কদম্ব নদীর জলে পদধৌত[৫] করিয়া পরিষ্কার পায়ে যাহাতে চৈত্য পর্বতে উপস্থিত হয়, রাজা সেই কারণে উক্ত নদী হইতে চৈত্য পর্বত অবধি পথটি গালিচায় ঢাকিয়া দিলেন। চারিটি তোরণ দ্বারে রাজা দর্শনার্থীদের উপহার প্রদানেরও ব্যবস্থা করিলেন। নৃত্য-গীত, উজ্জ্বল

আলোক, নানাবর্ণের পতাকা সম্বলিত স্থানটি স্বর্গের দেবগণের উৎসবের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হইল।

রাজার নির্মিত চৈত্যের উদ্বোধনের এই উৎসবে সারা রাজধানী নগরকেও আলো, পুষ্প ও পতাকার মালায় সজ্জিত করা হইল। সমুদ্রের একযোজন অবধি আলোর মালায় সজ্জিত করা হইল। এই মহাউৎসবকে 'গিরিভণ্ড-দান' বলা হইল। ॥ ৭৮-৮১ ॥

দূরাগত ভিক্ষুগণকে রাজা আট জায়গায় আহার্য দানের ব্যবস্থা করিলেন। আটটি সুবর্ণ ভেরীর শব্দে রাজা চব্বিশ হাজার ভিক্ষুকে ডাকিয়া অঢেল সামগ্রী প্রদান করিলেন। তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকে দুই জোড়া করিয়া চীবর প্রদান করিলেন। ॥ ৮২-৮৩ ॥

এই উপলক্ষে রাজা বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। চারিটি দ্বারের নিকটে রাজা নাপিতগণকে তাদের ব্যবসায় নিযুক্ত করিলেন। পূর্বতন রাজাদের সকল প্রকার পুণ্যকর্মের নির্দেশ ও ভ্রাতৃগণের সেইরূপ নির্দেশ এই রাজা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন।

রাজা তাঁহার রাণী ও দুই পুত্রদের, রাজ হস্তীকে ও অশ্বদের ভিক্ষুগণের সেবায় সাদরে প্রদান করিলে, ভিক্ষুগণ উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাজাকে এইরূপ দান করিতে নিষেধ করেন। ॥ ৮৪-৮৬ ॥

রাজা ভিক্ষুসংঘকে ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নানা প্রকার উপহার প্রদান করেন। ভিক্ষুগণের রীতিনীতি ও প্রয়োজন জ্ঞাত হইয়া রাজা সেইরূপ দান প্রদান করিয়া তিনি পরকালের ঋণ মুক্ত হন। কালায়নকন্নিক প্রদেশে এই গণপতি 'মণিনাগ-পব্বত-বিহার' ও 'কলন্দ-বিহার' নির্মাণ করেন; কুবুকন্দ নদীর তীরে 'সমুন্দ-বিহার' নির্মাণ করেন; হুবাচকন্নিক প্রদেশে 'চুলনাগ পব্বত' নামক বিহার নির্মাণ করেন। রাজা যখন 'পাষাণদিপক'-বিহারটি নির্মাণ করিতেছিলেন, তখন এক ভিক্ষু তাঁহাকে তৃষ্ণার জল প্রদান করেন। ইহাতে প্রীত হইয়া রাজা উক্ত বিহারের নিকট অর্ধযোজন ভূমি ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন। এইরূপ 'মণ্ডবাপি-বিহার' নির্মাণকালেও এক ভিক্ষুর ব্যবহারে প্রীত হইয়া রাজা সেইখানেও একখণ্ড ভূমি ভিক্ষুসংঘের ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন।

॥ ৮৭-৯৩ ॥

অতএব জ্ঞানীগণ যাঁহারা স্বীয় গর্ব ও আলস্য জয় করিয়াছেন; লোভ হইতে মুক্ত হইয়াছেন; অন্যের ক্ষতিসাধন না করিয়া ক্ষমতার শিখরে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারা পুণ্যকর্মে প্রীত হন, ধর্মে উদ্বুদ্ধ হন, এবং বহু প্রকার শুভকর্ম করেন। ॥ ৯৪ ॥

এগারোজন রাজার কথা সমাপ্ত

এইখানে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'এগারোজন রাজার কথা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. এই কথাটি প্রক্ষিপ্ত। Geiger সাহেব বলেছেন, এই কথাটি পরে যুক্ত করা হয়েছে। মূলে শব্দটি হচ্ছে 'কট্‌টুকামা' অর্থাৎ উগ্র কামাসক্তা। রাণী অনুলা উগ্র কামাসক্তির কারণে রাজা নিলিয়কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। বত্রিশজন প্রাসাদ রক্ষীগণের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হওয়া কথাটা ঠিক নয়।

২. খুব সম্ভবতঃ অমবনগঙ্গা ও মহওয়ালিগঙ্গার মধ্যস্থ অঞ্চল। মূলে শব্দটি হচ্ছে 'অনতরগংগায়', অর্থাৎ দুই গঙ্গানদীর অন্তর বা মধ্যস্থল।

৩. বোঝা যাচ্ছে, রাজারা যা নির্মাণ করতেন তা করা হতো প্রজাগণের উপর কর ধার্য করেই। কিন্তু নাম হতো রাজাদেরই। এইসব কাজে রাজারাই নাকি পুণ্যবান হতেন। ভাবা যায়। এইসব কাজে শ্রমটাও গরীব প্রজারাই দিতেন। রাজা দুট্‌ঠগামণি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন বলা হয়েছে এই গ্রন্থে। কিন্তু অন্যান্য রাজাদের সম্বন্ধে তা কোথায়ও বলা হয়নি।

৪. টীকাকার বলেছেন, রাজা ধ্যানে বসলে একটি ভারী পাথর পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে রাজার কাছে পড়ে।

৫. পাদুকা ব্যবহারের চল তখনও হয়নি। লোকে খালি পায়েই চলতো।

৬. পূর্বজন্মের কর্মফলে এই জন্মে জন্মগ্রহণ করেছে বাকি কর্মফল শোধ দিতে। সেই ঋণ স্বরূপ কর্মফল শোধ করা হলো।

৩৫

বারোজন রাজার কথা

রাজা মহাদাঠিকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আমণডগামণি—অভয় রাজা হইলেন। তিনি নয় বৎসর আটমাস রাজত্ব করেন। তিনি মহাস্তূপের ছত্রের উপর আরও একটি ছত্র স্থাপন করেন। মহাস্তূপের চূড়ায় ও নীচে তিনি একটি করিয়া বেদীও স্থাপন করেন। রাজা লোহপাসাদের প্রদক্ষিণের পথ ও অলিন্দ নির্মাণ করেন। থূপারাম নামক উপসথ গৃহেও অনুরূপ পথ ও অলিন্দ নির্মাণ করেন। উভয় স্থানে রাজা রত্নখচিত সুরম্য বহিরঙ্গনের কুটির নির্মাণ করেন! তিনি রজতলের বিহারটিও নির্মাণ করেন। অনুরাধপুরের দক্ষিণ দিকে মহাগামেন্দি পুষ্করিণীটি খনন করিয়া বিচক্ষণ রাজা পুণ্যলাভের জন্য উহা দক্ষিণ বিহারের ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করেন। এই রাজা সমগ্র দ্বীপে ঘোষণা করিলেন যেন কেহ প্রাণীহত্যা না করে। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে ফলের বৃক্ষ রোপণ করেন। রাজা আমণড ভিক্ষুগণের ভিক্ষাপাত্রে তাজা কুমড়া, চীবর ইত্যাদি প্রদান করেন। এই কারণে এই রাজা 'আমণড' নামে খ্যাত হন। ॥ ১-৮ ॥

এই রাজার ভ্রাতা কনিরজানুতিষ্য রাজা আমণডকে হত্যা করিয়া রাজা হন। তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। বিহারের উপসথগৃহের নাম থূপারাম হইবে কেন, এই বিষয়ে বিবাদের মামলায় রাজা নিরপেক্ষ বিচার না করিয়া রায় প্রদান করিলে বিহারের ষাটজন ভিক্ষু রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এই সকল ভিক্ষুদের বন্দি করেন এবং তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহারের বস্তুসকল বিহার হইতে লইয়া গিয়া চৈত্য পর্বতের কণির গুহায় নিক্ষেপ করেন। ॥ ৯-১১ ॥

কনিরজানুতিষ্যের মৃত্যুর পর রাজা আমণডের পুত্র 'চুলাভয়' রাজা হইয়া এক বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা রাজধানীর দক্ষিণে গোণ নদীর তীরে চুলগল্লক-বিহারটি নির্মাণ করেন। ॥ ১২-১৩ ॥

রাজা চুলাভয়-এর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী, রাজা আমণডের কন্যা, চার মাস রাজত্ব করেন। রাজা আমণডের ভাগিনেয় 'ইলনাগ' রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সার্বভৌম রাজারূপে রাজধানীতে রাজছত্র উত্তোলন করেন। একদিন এই রাজা তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে দলবল সহ তিষ্য পুষ্করিণীতে গেলে রাজার অধীনে থাকা লম্বকর্ণ গোষ্ঠীর লোকেরা রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসে। ইহাতে

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের অপদস্ত করিতে নির্দেশ দিলেন যে, লম্বকর্ণ গোষ্ঠীর লোকেরা যেন উক্ত পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ সড়কটি প্রস্তুত করিয়া উহা মহাস্তূপ অবধি দীর্ঘ করে। এই কাজের তত্ত্বাবধানে রাজা চণ্ডালদের নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে লম্বকর্ণ গোষ্ঠীর লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া রাজাকে তাঁহারা রাজপ্রাসাদের মধ্যে নজরবন্দি করিয়া নিজেরা রাজশাসন করিতে লাগিলেন। ॥ ১৪-১৯ ॥

তখন রাজমহিষী যুবরাজ চন্দমুখশিবকে উৎসবের পোশাকে সজ্জিত করিয়া এক পরিচারিকার মারফত রাজহস্তীর নিকট পাঠাইলেন। রাণী সেই পরিচারিকার মারফত রাজহস্তীকে এই সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদটি সেই পরিচারিকা রাজহস্তীকে প্রদান করিল ও যুবরাজকে রাজহস্তীর নিকট পেঁছাইল। রাণীর প্রদত্ত সংবাদটি হইল—'এই যুবরাজ তোমার প্রভুর পুত্র। তোমার প্রভু রাজপ্রাসাদে বন্দি অবস্থায় রহিয়াছেন। শত্রুর হাতে মৃত্যু অপেক্ষা তোমার হাতে মৃত্যু হওয়া এই পুত্রের পক্ষে শ্রেয়ঃ। তুমি যুবরাজকে হত্যা কর। ইহাই রাণীর নির্দেশ।' এই সংবাদ দিয়া পরিচারিকা যুবরাজকে রাজহস্তীর পদতলে শোয়াইয়া দিল। ॥ ২০-২৩ ॥

রাজহস্তী দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তারপর প্রচণ্ড রাগে খুঁটির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া রাজহস্তী ছুটিয়া গিয়া রাজপ্রাসাদের সিংহদরজায় আঘাত করিয়া উহা ধ্বংস করিয়া প্রাসাদে ঢুকিয়া রাজার কক্ষের বন্ধ দরজাটি ভাঙিয়া ফেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষের মধ্যে উপবিষ্ট রাজাকে নিজের পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া রাজহস্তী বীরবিক্রমে মহাতীর্থ অভিমুখে চলিল। মহাতীর্থে পেঁছাইলে রাজা একটি জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজহস্তী ইহার পর মলয় প্রদেশের জঙ্গলে গিয়া আত্মগোপন করিল। ॥ ২৪-২৬ ॥

রাজা তিন বৎসর পশ্চিম উপকূলে থাকিয়া সৈন্যসামন্ত যোগাড় করিয়া জাহাজে চড়িয়া রোহণ প্রদেশে আসিলেন। শকুখর-সোবভ বন্দরে নামিয়া রাজা আরও সৈন্যসামন্ত যোগাড় করিলেন। দক্ষিণ মলয় প্রদেশ হইতে রাজহস্তীও রাজার নিকট আসিয়া পেঁছিল। ॥ ২৭-২৯ ॥

রাজা এই স্থানে মহান ভিক্ষু, জাতক বিশারদ, মহাপদুম-এর নিকট বোধিসত্ত্বের 'কপি-জাতক' শুনিয়াছিলেন। তিনি তখন তুলাধার-বিহারে ছিলেন। ইহাতে ধর্মে অনুপ্রাণীত হইয়া রাজা নাগমহা-বিহারটিকে আরও একশত ধনুক[১] দীর্ঘ করেন। উহার স্তূপটি আরও বৃহৎ করেন এবং তিষ্য-পুষ্করিণী ও দূর-পুষ্করিণী খনন করেন। ॥ ৩০-৩২ ॥

রাজা এক বিরাট সৈন্যদল যোগাড় করিয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। লম্বকর্ণগণ ইহা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

হংকারপিট্ঠি প্রান্তরে, কপল্লখনন্দ দ্বারের নিকটে, দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে উভয় দলের বহু ক্ষয়ক্ষতি হইল। ॥ ৩৩-৩৪ ॥

রাজার সৈন্যদল সমুদ্রযাত্রায় এবং এতোখানি পথ চলিয়া কিছুটা ক্লান্ত ছিল বলিয়া যুদ্ধের প্রথম ভাগে তাহারা কিছুটা পিছু হটিল। ইহা দেখিয়া রাজা রণহুঙ্কার দিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে, শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িল। রাজার সৈন্যরা ইহাতে সহজে তাহাদের মাথা কাটিয়া লইল। স্তূপাকার সেই মাথাগুলি ভূমি হইতে শকটের চাকার ঊর্ধ্বে উঠিল। এইরূপ কাটা মাথাগুলি তিনগুণ হইলে রাজা দয়াপরবশ হইয়া ঘোষণা করিলেন, 'আর হত্যা না করিয়া তাহাদের বন্দি কর।' ॥ ৩৫-৩৭ ॥

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজছত্র উত্তোলন করিয়া রাজা উৎসব করিতে তিষ্য-পুষ্করিণীতে গেলেন। উৎসব শেষে রাজা লম্বকর্ণদের আস্পর্ধার কথা মনে করিয়া তাঁহার নির্দেশে পরাজিত গোষ্ঠীর বন্দিদের জোড়ায় জোড়ায় পরপর রথের পিছনে বাঁধিয়া রাজা সেই রথে চড়িয়া রাজধানী নগরে ফিরিলেন। ॥ ৩৮-৪০ ॥

প্রাসাদের দরজায় দাঁড়াইয়া রাজা ঘোষণা করিলেন 'এই দরজার চৌকাঠে এই সকল ব্যক্তির মস্তক ছেদন করা হউক।' রাজমাতা তখন বলিয়া উঠিলেন, 'হে পুত্র! এই সকল ভারবাহী পশু। ইহাদের বরং শিং ও খুর কাটিয়া দাও।' রাজা ইহা শুনিয়া পূর্বের ঘোষণা বদল করিয়া বলিলেন, 'তবে ইহাদের নাক ও পায়ের আঙুলগুলি ছেদন কর।'
॥ ৪১-৪৩ ॥

রাজহস্তী যেই অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়াছিল, রাজা হস্তীকে সেই অঞ্চলটি প্রদান করিলেন। সেই অঞ্চল 'হত্থিভোগ'[২] নামে খ্যাত হইল।
॥ ৪৪ ॥

রাজা ইলনাগ রাজারূপে পূর্ণ ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ চন্দমুখশিব আট বৎসর সাতমাস রাজত্ব করেন।
॥ ৪৫-৪৬ ॥

রাজা চন্দমুখ-শিব মণিকারগাম-এর নিকটে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া উহা 'ইস্সর সমণ'-বিহারের ভিক্ষুগণকে প্রদান করিলেন। তাঁহার রাণী দমিলাদেবী সেই গ্রামের রাজকরের জন্য তাঁহার অংশটি উক্ত বিহারে দান করিলেন। ॥ ৪৭-৪৮ ॥

রাজা চন্দমুখ-শিব যখন তিষ্য-পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যশলালকতিষ্য তাঁহাকে হত্যা করেন।

যশলালকতিষ্য রাজা হইয়া সাত বৎসর আট মাস রাজত্ব করেন।
॥ ৪৯-৫০ ॥

দত্ত নামক এক দ্বাররক্ষকের পুত্র শুভ নিজেও ছিলেন দ্বাররক্ষক। রাজার সহিত শুভর চেহারার যথেষ্ট মিল ছিল। রাজা যশলালকতিষ্য ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন দ্বাররক্ষক শুভকে রাজপোষাক ও রাজালংকার পরাইয়া রাজ সিংহাসনে বসাইয়া, নিজে শুভর পোশাক ও শিরস্থান পরিয়া দণ্ড হাতে দ্বারে দাঁড়াইলেন। অমাত্যগণ সিংহাসনে উপবিষ্ট শুভকে রাজা মনে করিয়া অভিবাদন করিলেন। এইরূপে রাজা অমাত্যগণের সহিত প্রায় রসিকতা করিতেন। ॥ ৫১-৫৪ ॥

একদিন এইরূপে রাজা যখন শুভকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে শুভর পোশাক পরিয়া দণ্ড হাতে দ্বাররক্ষীর কর্মে রত ছিলেন, তখন অমাত্যগণ আসিয়া শুভকে রাজা ভাবিয়া অভিবাদন করিলে, রক্ষীর বেশধারী রাজা যশলালকতিষ্য হাসিয়া আকুল হইলেন। রক্ষীর এইরূপ অশোভন আচরণে অন্য একজন রক্ষী সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজারূপী শুভকে রাজা ভাবিয়া নালিশ করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! এই দ্বাররক্ষক শুভ আপনার উপস্থিতিতে হাসিয়া আপনার অপমান করে কী করিয়া?' ইহা শুনিয়া শুভ সিংহাসন হইতে রাজার ন্যায় নির্দেশ দিলেন, 'এইরূপ অশোভন আচরণের জন্য এই দ্বাররক্ষককে প্রাণদণ্ড দিলাম।' রাজা যশলালকতিষ্যের প্রাণদণ্ড হইলে শুভ রাজা হইয়া ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তখন তাহার নাম হইল, শুভরাজা। ॥ ৫৫-৫৬ ॥

এই রাজা দ্বীপের দুইটি প্রধান বিহারে ভিক্ষুগণের জন্য কক্ষ নির্মাণ করিয়া দিলেন। উরুবেল প্রদেশে তিনি 'বল্লি-বিহার' নির্মাণ করেন। উহার পূর্বদিকে 'একদ্বার' নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন। আর গঙ্গার মোহনার নিকট 'নন্দিগামক-বিহার' নির্মাণ করেন। ॥ ৫৭-৫৮ ॥

উত্তর প্রদেশের লম্বকর্ণ বংশের 'বসভ' নামক এক ব্যক্তি, যিনি যুদ্ধে তাঁহার মাতুল সেনাধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, লোকমুখে ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে, 'বসভ নামক এক ব্যক্তি রাজা হইবেন।' দেশের রাজাও ইহা শুনিয়াছিলেন। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন যে 'সমগ্র দ্বীপে যাহাদের নাম 'বসভ' হইবে তাহাদের হত্যা কর।' এই নির্দেশ শুনিয়া বসভ-এর মাতুল সেনাধ্যক্ষ ভাবিলেন 'এই বসভকে আমি রাজার নিকট অর্পণ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সেনাধ্যক্ষ তাহার স্ত্রীকে উহা জ্ঞাত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে বসভকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী বসভকে পানের পুটলিটি সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন, কারণ সেনাধ্যক্ষের পানের প্রতি আসক্তি ছিল। কিন্তু সেই পুটলিতে চুন

দেওয়া হইল না। ॥ ৫৯-৬২ ॥

কিছুদূর যাইবার পর সেনাধ্যক্ষ পান চাহিলে বসভ পানের পুটলি খুলিয়া দেখিলেন যে উহাতে চুন নাই। অগত্যা তিনি পানের পুটলি লইয়া চুনের জন্য পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বসভ চুনের জন্য ফিরিয়া আসিলে সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী সেনাধ্যক্ষের গোপন অভিসন্ধির কথা বসভকে জ্ঞাত করিয়া, এক হাজার মুদ্রা দিয়া, তাঁহাকে পলায়ন করিতে বলিলেন। ॥ ৬৩-৬৪ ॥

বসভ সেনাধ্যক্ষের নিকট ফিরিয়া না গিয়া মহাবিহারে ছুটিয়া গিয়া ভিক্ষুগণের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ বসভকে বিহারে অবস্থান করিতে দিয়া তাঁহাকে খাদ্যপানীয় ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। সেইস্থানে অবস্থানকালে বসভ এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের নিকট শুনিলেন যে, বসভ নামে এক ব্যক্তি এই দেশের রাজা হইবেন। ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বসভ ভাবিলেন, 'তবে আমি রাজদ্রোহী হইব'। এইরূপ চিন্তা করিয়া বসভ রাজার বিপক্ষের কিছু ব্যক্তিদের নিজের সঙ্গী করিলেন। তারপর গ্রামে গ্রামে গিয়া বসভ নিজের দল ভারী করিতে লাগিলেন। রোহণ প্রদেশ এবং সারা রাজ্য ঘুরিয়া বসভ বহু সৈন্য যোগাড় করিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া তিনি বহু রাজদ্রোহী ব্যক্তিগণকে সৈন্যে পরিণত করিয়া দুই বৎসর পর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। ॥ ৬৫-৬৮ ॥

যুদ্ধে শুভরাজকে পরাজিত করিয়া বসভ-রাজ সিংহাসনে বসিয়া রাজছত্র উত্তোলন করিলেন। বসভ-এর সেই মাতুল সেনাধ্যক্ষ সেই যুদ্ধে নিহত হইলেন। কিন্তু বসভ সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী পোত্থাকে তাঁহার সাহায্যের জন্য রাণীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। ॥ ৬৯-৭০ ॥

একদিন বসভ-রাজ এক দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দৈবজ্ঞ! আমার আয়ু আর কত কাল?' দৈবজ্ঞ রাজাকে গোপনে বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার আয়ু আর বারো বৎসর।' রাজা সেই দৈবজ্ঞকে এক হাজার মুদ্রা দিয়া বিষয়টি গোপন রাখিতে বলিয়া ভিক্ষুসংঘকে সমবেত করিয়া অভিবাদনান্তে বলিলেন, 'হে ভন্তে! মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করিবার কোন উপায় কি আছে?' ভিক্ষুগণ সমস্বরে বলিলেন 'মহারাজ! নিশ্চয়ই আছে।' ইহা বলিয়া ভিক্ষুগণ রাজাকে দীর্ঘ জীবন লাভের বাধা-বিপত্তি দূর করিবার উপায়সকল শিখাইলেন।—ভিক্ষুগণকে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্তুদান, বিহারদান, ওষুধদান, এবং ভিক্ষুগণের পুরাতন আবাসগুলির জীর্ণ সংস্কার করা; পঞ্চশীল গ্রহণ ও সযত্নে পালন; উপসথ দিবসে উপবাসী থাকা প্রভৃতি। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'ভন্তে!

এই সকল আমি করিব।' রাজা সেই সকল যথাযথভাবে পালন করিলেন।
॥ ৭১-৭৬ ॥

প্রতি তৃতীয় বর্ষে রাজা সমগ্র দ্বীপের ভিক্ষুগণকে ত্রি-চীবর দান করিলেন। আর যে সকল ভিক্ষু বহুদূরে অবস্থিত ছিলেন, রাজা তাঁহাদেরও ত্রি-চীবর পাঠাইলেন। বত্রিশটি স্থানে রাজা মধুমিশ্রিত পায়েস বিতরণ করিতে নির্দেশ দিলেন এবং চৌষট্টিটি স্থানে রাজা নানা প্রকার দান বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। ॥ ৭৭-৭৯ ॥

রাজা চারি জায়গায়, প্রতি স্থানে, হাজার প্রদীপ জ্বালাইয়া স্থানগুলি আলোকিত করিলেন। সেই চারিটি স্হান হইল,—চৈত্য পর্বত, থূপারাম, মহাস্তূপ ও বোধিবৃক্ষ। ॥ ৮০ ॥

রাজা চিত্তল পর্বতে (চিত্তকূট-বিহারে) দশটি মনোরম স্তূপ নির্মাণ করিলেন। সমগ্র দ্বীপের জীর্ণ বিহারগুলির সংস্কার করিলেন। একজন পুণ্যাত্মা ভিক্ষু বল্লিয়ের বিহারে অবস্হান করিতেন। তাঁহার প্রতি পরমভক্তির কারণে রাজা মহাবল্লিগোত্ত-বিহার ও মহাগামের নিকটে অনুরারাম-বিহার নির্মাণ করেন। এই দুই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজা এক হাজার আট করিশ[৪] ভূমিযুক্ত হেলিগামটি ভিক্ষুদের দান করেন।
॥ ৮১-৮৩ ॥

রাজা তিষ্যবর্দ্ধমানক অঞ্চলে মুচেল-বিহার নির্মাণ করিয়া আলিসার খালের জলের ভাগ সেই বিহারকে দান করেন। রাজা গলনুবিত্থ স্তূপে ইষ্টকের আচ্ছাদন প্রদান করেন ও একটি উপসথগৃহও নির্মাণ করেন। সেই গৃহে প্রদীপের তেলের যোগানের জন্য রাজা এক হাজার করিশ ভূমিতে জল প্রদানের উপযোগী একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া ভিক্ষুগণকে প্রদান করেন। ॥ ৮৪-৮৬ ॥

রাজা কুম্ভিগল্লক-বিহারে একটি উপসথ-আগার নির্মাণ করেন। এইরূপে রাজা ইসুসর-সমণক বিহারেও একটি উপসথ-আগার নির্মাণ করেন এবং থূপারামে একটি স্তূপ-মন্দির স্হাপন করেন। মহাবিহারে রাজা পশ্চিমমুখী সারিবদ্ধ কক্ষ নিমার্ণ করেন ও চতুস্‌শাল হলটির সংস্কার করেন। ॥ ৮৭-৮৯ ॥

এই রাজা চারিটি মনোরম বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত[৬] করিয়া উহাদের স্হাপনের জন্য বোধিবৃক্ষের বিস্তির্ণ প্রাঙ্গণে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই স্হানে রাজমহিষী পোতুথা একটি মনোরম স্তূপ-যুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ॥ ৯০-৯১ ॥

থূপারামে স্তূপ-মন্দির স্হাপন করিয়া রাজা উদ্বোধনের দিনে ভিক্ষুসংঘকে দান দিয়া মহা উৎসব করেন। যে সকল ভিক্ষুগণ বুদ্ধের

ধর্মশ্রবণে আগ্রহী, রাজা তাঁহাদের ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করিলেন। যে সকল ভিক্ষু ধর্মশিক্ষা প্রদানে পারদর্শী রাজা তাঁহাদের ননী ও গুড় প্রভৃতিও প্রদান করিলেন। রাজধানীর চতুর্দ্বারে রাজা দরিদ্রদের অন্ন বিতরণ করিলেন। যে সকল ভিক্ষু অসুস্থ ছিলেন রাজা তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিলেন। ॥ ৯২-৯৩ ॥

রাজা বারোটি পুষ্করিণী ও খাল নির্মাণ করিলেন যাহাতে ভূমি উর্বর হয়। সেই বারোটি পুষ্করিণী হইল, চয়স্তি, রাজুপ্পল, বহ, কোলম্বগামক, মহানিকখবতন্তি, মহারামেন্তি, কোহাল, কালি, চমবুতি, চাথমংগণ, অগ্গি ও বড্ডনমানক। এই বারোটি পুষ্করিণী ও উহাদের হইতে নির্গত বারোটি খাল রাজা নির্মাণ করেন। ॥ ৯৪-৯৫ ॥

সুরক্ষার জন্য রাজা নগরের চারিধারের প্রাকারটি আরও উচ্চ করেন এবং চতুর্দ্বারের উপরে রক্ষীগণের লক্ষ্য রাখিবার দুর্গতোরণ স্থাপন করেন। রাজপ্রাসাদেও এইরূপ দুর্গতোরণের ব্যবস্থা করেন। বাগানে পুষ্করিণী খনন করিয়া উহাতে হংস বিচরণ করিতে দিয়া রাজা বাগানের শোভাবর্ধন করেন। ॥ ৯৬-৯৭ ॥

এইসকল পুণ্যকর্ম করিয়া রাজা বসভ দীর্ঘ জীবনলাভের প্রতিবন্ধকতা দূর করিলেন। সারা জীবন মঙ্গল কর্ম করিয়া রাজা চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি চুয়াল্লিশটি বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব উদ্‌যাপন করেন। ॥ ৯৮-১০০ ॥

রাজা শুভ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জীবনহানির আশংকায় স্বীয় কন্যাকে একজন ইষ্টক নির্মাতার হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিলেন। তাঁহার রাজ-চিহ্ন এবং পোষাকও তিনি এই ব্যক্তিকে দিলেন। রাজা বসভ এই রাজাকে হত্যা করিলে এই ব্যক্তি তাঁহার নিজের কন্যারূপে রাজকন্যাকে মানুষ করিলেন। এই ব্যক্তি যখন ইষ্টক নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, এই রাজকন্যা তখন তাঁহার আহার্য লইয়া যাইতেন। ॥ ১০১-১০৩ ॥

একদিন রাজকন্যা এইরূপ আহার্য লইয়া যাইবার সময় দেখিলেন একজন ভিক্ষুকে নিরোধ সমাপত্তির ধ্যানে কদম্ব বৃক্ষের নীচে বসিয়া আছেন। শীর্ণকায় ভিক্ষুকে দেখিয়া রাজকন্যা তাহার সঙ্গের আহার্য এই ভিক্ষুকে প্রদান করিলেন। তারপর গৃহে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় আহার্য প্রস্তুত করিয়া পালিত পিতার নিকট লইয়া গেলেন। পিতা কন্যাকে দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা সেই ভিক্ষুর কথা বলিলেন। ইহা শুনিয়া পিতা আনন্দিত হইয়া কন্যাকে বলিলেন, সে যেন প্রতিদিন সেই ভিক্ষুকে আহার্য দান করে।

রাজকন্যা পরদিন সেই ভিক্ষুকে আহার্য দিলে, সেই ভিক্ষু চোখ

খুলিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, 'হে কন্যা! রাজকীয় ভাগ্য উদয় হইলে, তুমি এই স্থানের কথা মনে রাখিও', এই কথা বলিয়া ভিক্ষু প্রাণত্যাগ করিলেন। ॥ ১০৪-১০৭ ॥

রাজা বসভ-এর পুত্র বঙ্কনাসিকতিষ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহার বিবাহের জন্য যোগ্য কন্যার সন্ধান করিতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিলেন। সেই ব্যক্তিগণ কন্যার শুভ লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। সেইরূপ শুভলক্ষণ যুক্ত কন্যার সন্ধানে বাহির হইয়া তাঁহারা ইষ্টক প্রস্তুতকারীদের গ্রামে এইরূপ একটি কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহারা রাজাকে এই সংবাদটি প্রদান করিলেন। রাজা সেই কন্যার খোঁজ লইতে গিয়া জানিলেন যে এই কন্যা শুভরাজার। কন্যার পালিত পিতা রাজাকে রাজ-চিহ্ন এবং রাজপোষাক দেখাইলেন। রাজা বসভ খুবই আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্রকে এই কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। ॥ ১০৮-১১১ ॥

রাজা বসভ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বঙ্কনাসিকতিষ্য তিন বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা গোণ নদীর তীরে 'মহামঙ্গল-বিহার' নির্মাণ করেন। তাঁহার রাণী মহামত্তা সেই ভিক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া সেই ভিক্ষুর স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করিতে অর্থ সংগ্রহ করেন। ॥ ১১২-১১৪ ॥

এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গজবাহুকগামণি রাজা হইয়া বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা স্বীয় মাতার নির্দেশে সেই ভিক্ষুর স্থানে, পুষ্পিত কদম্ব বৃক্ষের নীচে, মায়ের সম্মানার্থে 'মাতুবিহার' স্থাপন করেন। রাজার মাতা একশত হাজার মুদ্রায় ভূমি ক্রয় করিয়া উহাতে উক্ত বিহারটি নির্মাণ করেন। রাজা সেই স্থানে প্রস্তরে নির্মিত একটি চৈত্য স্থাপন করিলেন এবং চৈত্য সম্বলিত বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া ভিক্ষুসংঘকে সেই ভূমি দান করেন। ॥ ১১৫-১১৮ ॥

রাজা গজবাহুকগামণি অভয়উত্তর স্তূপটি আরও বৃহৎ করিয়া স্থাপন করিলেন এবং উহার চারিদিকে চারিটি তোরণ যুক্ত দালান নির্মাণ করিলেন। রাজা গামণিতিষ্য পুষ্করিণী খনন করিয়া উহা অভয়গিরি-বিহারের ভিক্ষুসংঘকে দান করিলেন। মরিচভট্টি-বিহারের স্তূপটি নতুন আস্তরণে ঢাকিয়া রাজা উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একশত হাজার মুদ্রায় ভূমি ক্রয় করিয়া সেই ভূমি ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। জীবনের শেষ বর্ষে রাজা রামুকা-বিহার ও মহেজাসনশালা সভাগৃহটি রাজধানীতে নির্মাণ করেন।
॥ ১১৯-১২২ ॥

রাজা গজবাহুকগামণির মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশুর মহল্লকনাগ রাজা হইয়া ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজা নানা স্থানে সাতটি বিহার নির্মাণ করেন যথা, পূর্বদিকে সেজলক বিহার, দক্ষিণদিকে গোটপব্বত-

বিহার, পশ্চিমদিকে ডকপাসান-বিহার, নাগদ্বীপে সালিপব্বত-বিহার, বিজগামে তনবেলি-বিহার, রোহণে তোব্বল-নাগপব্বত-বিহার ও অন্তর্দেশে গিরিহালিক-বিহার। এই রাজার স্বল্প রাজত্বকালে এই সকল বিহার নির্মাণ করা হয়। ॥ ১২৩-১২৬ ॥

এইরূপে বিজ্ঞগণ মূল্যহীন সম্পদ বিসর্জন দিয়া মূল্যবান সম্পদ স্বরূপ পুণ্য অর্জন করেন। আর মূর্খগণ স্বীয় অজ্ঞানতার কারণে মূল্যহীন সুখের জন্য বহু দুষ্কর্ম করে। ॥ ১২৭ ॥

বারোজন রাজার কথা সমাপ্ত

এইখানে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'বারোজন রাজার কথা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. আট ফুট লম্বা হচ্ছে এক ধনুক।
২. হস্তীর নির্ভয়ে বিচরণ ক্ষেত্র।
৩. তৎকালে শ্রীলঙ্কায়ও পান খাওয়ার চল ছিল।
৪. প্রয়োজনীয় সকল বস্তু হচ্ছে 'পরিক্খার', আর 'পরিস্সাবন' হচ্ছে জল ছাকনী। মূলে 'পরিস্সাবন' শব্দটি থাকলেও এখানে 'পরিক্খার' শব্দটাই ঠিক। এতে জলছাকনীও বোঝায়।
৫. এক করিশ হচ্ছে প্রায় এক একর ভূমি।
৬. রাজা বসভ বুদ্ধমূর্তি প্রস্তুত করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন, বলা হয়েছে। এই রাজার পূর্বে রাজা দেবানং পিয় তিস্যও বুদ্ধমূর্তি তৈরী করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন বলা হয়েছে পরের পরিচ্ছেদে। কিন্তু শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধমূর্তি তৈরী শুরু হয় খুব সম্ভবতঃ খ্রিঃ তৃতীয়-চতুর্থ অব্দ থেকে। তার আগে নয়।

৩৬

তেরোজন রাজার কথা

রাজা মহল্লনাগের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভাটিকতিষ্য রাজা হইয়া চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি মহাবিহারের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন। 'গবরতিষ্য-বিহার' নির্মাণের পর রাজা মহামণি পুষ্করিণী খনন করিয়া উহা উক্ত বিহারের ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। তিনি 'ভাটিকতিষ্য-বিহারও' নির্মাণ করেন। মনোরম থূপারামে রাজা একটি উপসথ-গৃহ স্থাপন করেন। এই রাজা রণুধকণ্ডক পুষ্করিণীও খনন করেন। সকল জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এবং ভিক্ষুসংঘের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাজা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে প্রভূত দানাদি দিতেন। ॥ ১-৫ ॥

এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনিটঠতিষ্য রাজা হইয়া আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা 'ভুতারামা-বিহারের' ভিক্ষু মহানাগের প্রতি অতীব প্রীত ছিলেন। সেই কারণে তিনি এই ভিক্ষুর জন্য অভয়-গিরিতে মনোরম রতনপাসাদ নামক বিহারটি নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া, রাজা অভয়গিরি-বিহারের চারিধারে প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই বিহারে ও মণিসোম-বিহারে রাজা ভিক্ষুগণের জন্য পরিবেন স্থাপন করেন। মণিসোম-বিহারে রাজা একটি চৈত্যও স্থাপন করেন। এইরূপে অম্বতত্থল স্তূপটিও নির্মিত হয়। নাগদ্বীপের প্রাচীন মন্দিরটিও রাজা সংস্কার করেন। মহাবিহারের সীমানা ছাড়িয়া রাজা ভিক্ষুগণের জন্য কিছু সারিবদ্ধ কক্ষ (প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ) নির্মাণ করেন। ইহাদের 'কুক্কুটগিরি' আখ্যা দেওয়া হইল। ॥ ৬-১০ ॥

রাজা মহাবিহারে চারি দেওয়াল যুক্ত বারোটি বিরাট সুদৃশ্য কক্ষ নির্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি দক্ষিণ বিহারের চৈত্যের একটি আচ্ছাদনও দিলেন। মহামেঘবন বিহারের একটি ভোজনকক্ষও নির্মাণ করিয়া দিলেন। মহাবিহারের প্রাচীরের পাশ দিয়া একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়া উহা দক্ষিণ বিহার অবধি লইয়া গেলেন। ইহা ছাড়া, এই রাজা ভূতারাম বিহার, রামগোণক-বিহার ও নন্দতিষ্যরাম-বিহার নির্মাণ করিলেন। ॥ ১১-১৪ ॥

দ্বীপের পূর্বদিকে রাজা গংগরাজি অঞ্চলে অনুলাতিষ্য পব্বত বিহার, নিয়েলতিষারাম-বিহার, পিলপিট্‌ঠি-বিহার, ও রাজমহা-বিহার নির্মাণ করিলেন। সেইরূপ তিনটি বিহারের জন্য রাজা একটি উপসথ-গৃহ নির্মাণ করিলেন। সেই বিহারগুলি হইল, কল্যাণীক-বিহার, মণ্ডলগিরিক-বিহার ও দুব্বলবাপিতিষ্য-বিহার। ॥ ১৫-১৭ ॥

রাজা কনিট্‌ঠতিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খুজ্জনাগ রাজা হইয়া এক বৎসর রাজত্ব করেন। এই রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুঞ্চনাগ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হন এবং দুই বৎসর রাজত্ব করেন। একনালিক[১] রূপ মহা-দুর্ভিক্ষে এই রাজা পাঁচশত ভিক্ষুগণকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেটিকা ভর্তি আহার্য প্রদান করিয়াছেন। ॥ ১৮-২০ ॥

এই রাজার শ্যালক সিরিনাগ ছিলেন রাজার প্রধান সেনাধ্যক্ষ। তিনি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। ইহার পর তিনি রাজা হইয়া উনিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি মহাস্তূপে মনোরম স্বর্ণছত্র স্থাপন করেন। এই রাজা লোহপাসাদটির পাঁচতলা উচ্চ পর্যন্ত সংস্কার করেন এবং বোধিবৃক্ষের চারিধারের তোরণ-দ্বারের সিঁড়িগুলির সংস্কার করেন। স্বর্ণছত্র স্থাপন করিয়া ও সিঁড়ি-গুলির সংস্কার করিয়া রাজা উহার উদ্বোধনের উৎসব করিয়া বহু দানাদি করেন। মহানুভব রাজা সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসীগণের করদানের বোঝা কিছুটা লাঘব করেন। ॥ ২১-২৬ ॥

রাজা সিরিনাগের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তিষ্য দেশের আইন ও প্রথা মান্য করিয়া বাইশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি শাস্তিস্বরূপ দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করিলেন। এই দেশে সর্বপ্রথম রাজা এইরূপে আইনের প্রবর্তন করিলেন। সেই কারণে তিনি 'বোহারিক-তিষ্য' নামে খ্যাত হইলেন। ॥ ২৭-২৮ ॥

কপ্‌পুকগাম-বিহারে ভিক্ষু 'দেব' অবস্থান করিতেন। রাজা সেই ভিক্ষুর নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া পাঁচটি বিহারের জীর্ণ সংস্কার করিলেন। অনুরারাম বিহারে অবস্থিত ভিক্ষু মহাতিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাজা পাত্রে[২] করিয়া অন্নদানের প্রবর্তন করিলেন। রাজা দুইটি মহাবিহারে[৩] মণ্ডপ নির্মাণ করেন। মহাবোধিবৃক্ষের পূর্বদিকে অবস্থিত মন্দিরে রাজা দুইটি তাম্রনির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের বাসোপযোগী সত্তপন্নপাসাদ বিহারও রাজা নির্মাণ করেন। প্রতি মাসে রাজা এক হাজার মুদ্রা মহাবিহারে দান করিতেন। রাজা আটটি বিহারের চৈত্যে আটটি ছত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিহারগুলি হইল,—অভয়গিরি-বিহার, দক্ষিণমূল-বিহার, মরিচভট্টি-বিহার, কুলালিতিষ্য-বিহার, মহিয়ঙ্গন-বিহার, মহাগামনাগ-বিহার, মহানাগতিষ্য-বিহার ও কল্যাণীক-বিহার।

॥ ২৯-৩৫ ॥

রাজা ছয়টি বিহারের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ করিলেন। সেই বিহারগুলি হইল—মূলনাগসেনাপতি-বিহার, দক্ষিণ-বিহার, মরিচভট্‌টি-

বিহার, পত্তভাগ-বিহার, ইসুসরসমন-বিহার ও নাগদ্বীপের তিষ্য-বিহার। রাজা অনুরারাম বিহারে একটি উপসথ-গৃহও নির্মাণ করেন। ॥ ৩৬-৩৭ ॥

রাজা ঘোষণা করেন যে, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের অধিবাসিগণ যেন 'আর্যবংশ[৪]' পাঠের দিনগুলিতে দান প্রদান করেন। ধর্মবন্ধু এই রাজা ঋণগ্রস্ত ভিক্ষুগণকে ঋণমুক্ত হইতে তিন লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন। বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে রাজা সমগ্র লঙ্কাদ্বীপের ভিক্ষুগণকে ত্রি-চীবর দান করেন। বৈপুল্য[৫] ধর্মনীতি দমিত রাখিয়া ও অমাত্য কপিলের সাহায্যে বিধর্মীদের প্রতিহত করিয়া রাজা সদ্ধর্মকে আপন মহিমায় উজ্জ্বল করিলেন। ॥ ৩৮-৪১ ॥

রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়নাগ ছিলেন রাণীর গোপন প্রেমিক। সেই অপরাধ সচক্ষে আবিষ্কৃত হইলে রাজভয়ে ভীত হইয়া অভয়নাগ তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া ভল্লতিত্থে পলায়ন করিলেন। তিনি মাতুলের প্রতি মিথ্যা ক্রোধের ভান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন না। হস্তপদ ছিন্ন অসহায় ব্যক্তির ন্যায় মাতুলকে সেই রাজ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিতে রাখিয়া গেলেন।

অতঃপর অভয়নাগ তাঁহার অনুচরগণকে পোষা কুকুরের বিশ্বস্ততার উদাহরণ দিয়া কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত হইতে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া ভল্লতিত্থে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেলেন।

॥ ৪২-৪৫ ॥

অভয়নাগের মাতুল শুভদেব রাজার নিকট গিয়া রাজার একান্ত মিত্ররূপে নিজেকে উপস্থিত করিয়া গোপনে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অভয়নাগ রাজ্যের পরিস্থিতি কীরূপ জানিতে একজন গুপ্তচরকে পাঠাইলেন। সেই গুপ্তচরকে দেখিয়া মাতুল শুভদেব একটি চারা গাছের চারিদিকে বর্শা দিয়া মাটি সরাইয়া শিকড় সমেত চারা গাছটিকে বাহুবলে ভূমি হইতে তুলিয়া ধরিলেন। গুপ্তচর ফিরিয়া গিয়া অভয়নাগকে বিষয়টি জ্ঞাত করিলেন। ॥ ৪৬-৪৮ ॥

অভয়নাগ ইহার গূঢ় অর্থ বুঝিয়া কিছু সংখ্যক দমিলকে সঙ্গে লইয়া এইপারে আসিয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা এই সংবাদটি পাইয়া স্বীয় রাণীসহ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া মলয় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। অভয়নাগ মলয় প্রদেশে গিয়া রাজাকে হত্যা করিয়া রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা হইয়া অভয়নাগ আট বৎসর রাজত্ব করিলেন।

॥ ৪৯-৫১ ॥

এই রাজা বোধিবৃক্ষের চারিদিকে বেদিকা নির্মাণ করিলেন। লোহ-

পাসাদের প্রাঙ্গণে একটি মণ্ডপও তিনি স্থাপন করেন। রাজা দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সমগ্র দ্বীপের ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করেন। ॥ ৫২-৫৩ ॥

রাজা অভয়নাগ-এর মৃত্যুর পর রাজা তিষ্যের পুত্র সিরিনাগ (দ্বিতীয়) রাজা হইয়া দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি বোধিবৃক্ষের চারিধারের প্রাচীরের জীর্ণ সংস্কার করেন। বোধি মন্দিরের বালুকাময় প্রাঙ্গণে, মুচকুন্দ বৃক্ষের দক্ষিণে রাজা মনোরম হংসবট্‌ট মণ্ডপ নির্মাণ করেন।

এই রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিজয়কুমার রাজা হইয়া এক বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ৫৪-৫৭ ॥

সেই সময় লম্বকর্ণ গোষ্ঠীর তিনজন ব্যক্তি মহিয়ঙ্গনে বাস করিতেন। এই তিনজন ব্যক্তি, সংঘতিষ্য, সংঘবোধি ও গোটকাভয় পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। একদিন তাঁহারা রাজার কার্যে নিযুক্ত হইতে অনুরাধপুরের দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক অন্ধ দৈবজ্ঞ তিষ্য-পুষ্করিণীর কানায় দাঁড়াইয়া উক্ত ব্যক্তিদের পদশব্দ শুনিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'তিনজন ধরণীপতিকে এই স্থানের ধারণী এখন ধারণ করিতেছে'। ॥ ৫৮-৬০ ॥

উক্ত তিনজনের মধ্যে গোটকাভয় সকলের পিছনে থাকিয়া উহা শুনিয়া সেই দৈবজ্ঞকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ উত্তরে আবার সেই পূর্বের কথাটি বলিলেন। তখন গোটকাভয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে দৈবজ্ঞ! কাহার রাজত্ব এই ধরণীতে বেশীদিন টিকিবে?' দৈবজ্ঞ বলিলেন, যিনি শেষে রাজা হইবেন।' ইহা শুনিয়া গোটকাভয় অন্যান্যদের সহিত চলিলেন। ॥ ৬১ ॥

এই তিনজন ছিলেন রাজার ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁহারা রাজধানীতে পৌঁছিয়া রাজার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। এই তিন ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা বিজয়কুমারকে রাজপ্রাসাদে হত্যা করিয়া রাজার সেনাধ্যক্ষ সংঘতিষ্যকে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা সংঘতিষ্য তিন বৎসর রাজত্ব করিলেন। তিনি মহাস্তূপের চূড়ায় স্বর্ণছত্র স্থাপন করিলেন। তাছাড়া, রাজা মহাস্তূপের চতুর্দিকে চারিটি লক্ষ মুদ্রা মূল্যের (প্রতিটি) রত্ন বসাইলেন, এবং মোচড়ানো চূড়ায় বহুমূল্যের স্ফটিকের বেষ্টন দিলেন। উহার উদ্বোধন উৎসবে রাজা চল্লিশ হাজার ভিক্ষুকে একজোড়া করিয়া ত্রি-চীবর দান করিলেন। ॥ ৬২-৬৭ ॥

রাজা সংঘতিষ্য একদিন দামহালক-বিহারের ভিক্ষু মহাদেবের নিকট খন্দক গ্রন্থের[৬] সূত্রপাঠ শুনিয়া উহাতে বর্ণিত চাউলের লপ্‌সি দানে মহাপুণ্যের কথা জ্ঞাত হইয়া, আনন্দ সহকারে উহা বিশ্বাস করিয়া একদিন নগরের চতুর্দ্বারে আগত ভিক্ষুগণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাউলের

উত্তম লপ্‌সি প্রদান করিলেন। ॥ ৬৮-৬৯ ॥

রাজা সংঘতিষ্য মাঝে মধ্যে রাজঅন্তঃপুরিকা ও অমাত্যদের লইয়া পাচিনদ্বিপ[৭]-এ গিয়া সেই স্থানের জামফল ভক্ষণ করিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া সেই স্থানের অধিবাসিগণ রাজার আহার্য জামফলে বিষ মাখাইয়া রাখিল। রাজা সেই জামফল ভক্ষণ করিবামাত্র সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোটকাভয় রাজার সেনাধ্যক্ষ সংঘবোধিকে রাজা রূপে অভিষিক্ত করিলেন। ॥ ৭০-৭২ ॥

রাজা সংঘবোধি রাজা হইয়া দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি সিরিসংঘবোধি নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি পঞ্চশীল মানিয়া চলিতেন। ॥ ৭৩ ॥

এই রাজা মহাবিহারে মনোরম সলাকগৃহ[৮] স্থাপন করিলেন। রাজা একসময় খরায় পীড়িত দ্বীপবাসিগণের দৈন্যের কথা শুনিয়া তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তিনি মহাস্তূপের প্রাঙ্গণে ভূমিশয্যা লইয়া সংকল্প করিলেন যে, দেবগণের অনুকম্পায় বর্ষণের জলে আমি ভাসিয়া না উঠিলে আমরণ আমি এই ভূমিশয্যায় থাকিব।' রাজার এই সংকল্পের পর দেবগণ লংকাদ্বীপে বৃষ্টি নামাইলেন। সমগ্র দ্বীপভূমি ইহাতে সজীব হইল। কিন্তু যেহেতু রাজার শরীর সেই বৃষ্টির জলে ভাসিয়া উঠিল না, তিনি সেই কারণে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিলেন না। তখন অমাত্যগণ সেই স্থানের সকল জলনিকাশি নালাগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার রাজা জলে ভাসিয়া উঠিলে, তিনি সাঁতার দিয়া উঠিয়া আসিলেন। করুণাময় রাজা এইভাবে দেশে দুর্ভিক্ষের ভয় দূর করিলেন। ॥ ৭৪-৭৯ ॥

রাজা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সংবাদ পাইলে, তিনি বিদ্রোহীদের তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া আনিয়া গোপনে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতেন। তারপর কিছু মৃত ব্যক্তিদের শব গোপনে যোগাড় করিয়া রাজা উহা শ্মশানে দাহ করিয়া বিদ্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করিলেন। ইহাতে লোকের মনে বিদ্রোহীদের প্রতি ভয় আর রইল না। ॥ ৮০-৮১ ॥

ইহার পর 'রক্তঅক্ষি' নামক এক যক্ষের উদয় হইল। উহার প্রভাবে কিছু কিছু লোকের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। সেইসকল ব্যক্তিগণ অন্য ব্যক্তিদের সহিত এই বিষয়ে বাক্যালাপ করিলে বা কেবল তাকাইলেও সেই সকল ব্যক্তির মৃত্যু হইত। যক্ষ তখন নির্ভয়ে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিত। ॥ ৮২-৮৩ ॥

ইহা শুনিয়া ব্যথিত চিত্তে রাজা অষ্টশীল গ্রহণ করিয়া নির্জন কক্ষে উপবাসে থাকিয়া সংকল্প করিলেন, 'আমি যক্ষকে না দেখিয়া উপবাস ভঙ্গ করিব না।' রাজার করুণার অলৌকিক শক্তিতে সেই যক্ষ রাজার নিকট

উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্র! তুমি কে?' যক্ষ বলিল, 'হে রাজা! আমি সেই যক্ষ।' রাজা বলিলেন 'হে মিত্র! তুমি কেন আমার সমগ্র রাজ্যের প্রজাগণকে ভক্ষণ করিতেছ? তুমি ইহা করিও না।' যক্ষ বলিল, 'হে রাজা! তবে আপনার রাজ্যের একটি প্রদেশের প্রজাদের অন্ততঃ আমাকে ভক্ষণ করিতে দিন।' রাজা বলিলেন, 'হে মিত্র! ইহা সম্ভব নয়।' তখন যক্ষ ধীরে ধীরে একটি প্রদেশের প্রজা হইতে নামিতে নামিতে তাহার অনুরোধে একটি প্রজায় আসিয়া ঠেকিল। ইহাতে রাজা বলিলেম, 'হে মিত্র! কোন প্রজাকে আমি ভক্ষণ করিতে দিতে পারি না। তুমি বরং আমাকে ভক্ষণ কর।' ইহা শুনিয়া যক্ষ বলিলেন, 'হে রাজা! ইহা সম্ভব নয়।' ৮৪-৮৮ ॥

অতঃপর যক্ষ রাজাকে প্রার্থনা করিলেন যেন তাহার রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে যক্ষের নামে 'বলি' প্রদান করা হয়। রাজা সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অনুরূপ ঘোষণা করিলেন। এইরূপে করুণাময় রাজা প্রজাগণের ত্রাস দূর করিলেন। ॥ ৮৯-৯০ ॥

রাজার মিত্র গোটকাভয় ছিলেন রাজা সংঘবোধির কোষাধ্যক্ষ। তিনি একসময় বিদ্রোহ করিয়া সৈন্য-সামন্তসহ উত্তরদিক হইতে রাজধানী আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধ না করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তুসকল লইয়া, একলা, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন, কারণ তাঁহার দ্বারা অন্যের ক্ষতি করা সম্ভব নয়। ॥ ৯১-৯২ ॥

একজন পথিক পথিমধ্যে তাঁহার পেটিকায় রক্ষিত আহার্যের কিছু অংশ রাজাকে দিতে চাইলেন। বারবার অনুরোধ করিলে মহানুভব রাজা পথিকের প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে বলিলেন 'হে মিত্র! আপনার প্রদত্ত খাদ্যের পরিবর্তে আপনি আমার মস্তক ছেদন করিয়া রাজধানীতে গিয়া গোট্‌কাভয়কে উহা দেখাইলে তিনি আপনাকে বহু স্বর্ণ প্রদান করিবেন, কারণ আমি এই দেশের রাজা সংঘবোধি, এবং তিনি আমাকে হত্যা করিতে খুঁজিতেছেন।' পথিক এই কার্য করিতে অস্বীকার করিলে সেই মুহূর্তে রাজার অনুরূপ দেখিতে একটি প্রেতাত্মার উদয় হইল। পথিক সেই প্রেতাত্মার মস্তকটি লইয়া উহা গোটকাভয়কে দেখাইলেন। গোটকাভয় উহা রাজা সংঘবোধির কাটা-মুণ্ডু মনে করিয়া সেই পথিককে প্রভূত স্বর্ণ উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া সেই মুণ্ডটির সৎকার করিলেন। ॥ ৯৩-৯৭ ॥

অতঃপর গোটকাভয়, যাঁহাকে মেঘবর্ণাভয়ও বলা হইত, তিনি লংকা-দ্বীপের রাজা হইয়া তের বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ৯৮ ॥

এই রাজা নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া উহার প্রবেশদ্বারের নিকটে

একটি মণ্ডপ স্থাপন করিয়া সেই সুসজ্জিত স্থানে প্রতিদিন এক হাজার আটজন ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের চাউলের লাপসি, উত্তম সুস্বাদু খাদ্য-পানীয়, চীবর ও নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তুসকল দান করিতেন। এইরূপে পর পর একুশ দিন চলিয়াছিল। ॥ ৯৯-১০১ ॥

মহাবিহারে এই রাজা একটি প্রস্তরের মণ্ডপ নির্মাণ করেন ও লোহ-পাসাদের থামগুলির সংস্কার করেন। মহাবোধিবৃক্ষের সম্মুখে রাজা প্রস্তর-বেদী স্থাপন করেন ও উত্তর দিকের দ্বারে তোরণ নির্মাণ করেন। রাজা বোধিবৃক্ষের প্রাঙ্গণের চারি কোণে চারিটি ধর্মচক্র খোদিত স্তম্ভও প্রতিষ্ঠা করেন। ॥ ১০২-১০৩ ॥

এই প্রাঙ্গণের চারিটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে রাজা তিনটি প্রবেশ দ্বারে তিনটি প্রস্তরে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করেন ও চতুর্থ প্রবেশ দ্বারে একটি প্রস্তর নির্মিত বজ্রাসন স্থাপন করেন। মহাবিহারের পশ্চিমদিকে রাজা চংক্রমণের জন্য ভূমি নির্দিষ্ট করিলেন। ॥ ১০৪-১০৫ ॥

রাজা গোটকাভয় সমগ্র লংকাদ্বীপের সকল জীর্ণ বিহারগুলি সংস্কার করেন। থূপারামের মন্দির, থূপারাম, অম্বত্থল-বিহার, মণিসোমারাম-বিহার, মরিচভট্টি-বিহার, দক্ষিণ-বিহার প্রভৃতির উপসথ-গৃহগুলি রাজা সংস্কার করেন। রাজা মেঘবণ্ণাভয়-বিহার নামক একটি নতুন বিহারও প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের উদ্বোধন উৎসবে রাজা সমগ্র দ্বীপবাসী ত্রিশ হাজার ভিক্ষুকে দুই জোড়া করিয়া ত্রি-চীবর প্রদান করিলেন। ॥ ১০৬-১০৯ ॥

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে রাজা এইরূপে প্রতিটি ভিক্ষুকে দুই জোড়া করিয়া ত্রি-চীবর দান করিতেন। ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে রাজা বিরুদ্ধচারীদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলিকে দমন করিলেন। এইরূপে রাজা অভয়গিরি-বিহারের ষাটজন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভিক্ষুকে বন্দি করিলেন। তাহারা বুদ্ধের সদ্ধর্মের কণ্টকস্বরূপ বৈপুল্য ধর্মদর্শন[৯] গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা এই সকল ভিক্ষুগণকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লংকাদ্বীপের অপর পারে নির্বাসিত করিলেন ॥ ১১০-১১২ ॥

ভারতবর্ষের চোল রাজ্য হইতে আগত একভিক্ষু সংঘমিত্ত ছিলেন তন্ত্রসাধনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি ছিলেন নির্বাসিত এক ভিক্ষুর উক্ত বিষয়ের গুরু। তিনি মহাবিহারের ভিক্ষুসংঘের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন। ॥ ১১৩ ॥

উক্ত 'বিনয়' অমান্যকারী ভিক্ষু সংঘমিত্ত থূপারামে সমবেত ভিক্ষু-সংঘের উপস্থিতিতে সংঘপাল বিহারের পরিবেণে[১০] অবস্থানরত ভিক্ষু

গোটাভয়ের উক্তি খণ্ডন করিলেন। এই ভিক্ষু গোটাভয় ছিলেন রাজার মাতুল। তিনি রাজাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন, এবং প্রায়ই রাজপ্রাসাদের অতিথি হইতেন। রাজা মাতুলের প্রতি প্রীত ছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ যুবরাজ জ্যেট্ঠতিষ্য ও কনিষ্ঠ যুবরাজ মহাসেনকে রাজা এই ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ যুবরাজ মহাসেন ছিল ভিক্ষুর প্রিয় পাত্র। সেই কারণে জ্যেষ্ঠ যুবরাজ জ্যেট্ঠতিষ্য ভিক্ষু গোটাভয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। ॥ ১১৪-১১৭ ॥

রাজা গোটকাভয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জেট্ঠতিষ্য রাজা হইলেন। রাজার মরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কিছু অমাত্যগণ রাজা জ্যেট্ঠতিষ্যের সহিত শোকমিছিলে যোগদান করিতে না চাহিলে, রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মিছিলে সকলের আগে রাখিয়া তাহার পর পিতার মৃতদেহ এবং উহার পরে অমাত্যগণকে রাখিয়া নিজে শোভাযাত্রার পিছনে রহিলেন। এইরূপে রাজার মৃতদেহ লইয়া শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও রাজার মৃতদেহ রাজপ্রাসাদের দ্বার অতিক্রম করিয়া গেলে, রাজার ইঙ্গিতে মুহূর্তে প্রাসাদের দ্বারটি বন্ধ করা হইল এবং অমাত্যগণের যাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইল। রাজার হুকুমে বিশ্বাসঘাতক অমাত্যগণকে হত্যা করা হইল এবং তাঁহাদের স্তূপাকার মৃতদেহ রাজার পিতার চিতার পাশেই দাহ করা হইল। ॥ ১১৮-১২১ ॥

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য রাজাকে 'নির্দয়' পদবী প্রদান করা হয়। এই ঘটনার পর ভিক্ষু সঙ্ঘমিত্ত রাজার ভয়ে ভীত হইয়া রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসেনের পরামর্শে রাজার অভিষেকের সময় লঙ্কাদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া যান। তিনি মহাসেনের অভিষেকের অপেক্ষায় রইলেন। ॥ ১২২-১২৩ ॥

রাজা জ্যেট্ঠতিষ্য লোহপাসাদকে সাততলা অবধি উচ্চ করিলেন। পিতার এই অসমাপ্ত কার্যটি রাজা কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সম্পন্ন করিলেন। রাজা এই বিহারে ষাট হাজার মুদ্রা মূল্যের একটি রত্ন স্থাপন করিয়া উহার নতুন নাম দিলেন 'মণিপাসাদ'। ॥ ১২৪-১২৫ ॥

রাজা মহাস্তূপে দুইটি মূল্যবান রত্ন স্থাপন করিলেন। মহাবোধি মন্দিরের তিনটি প্রবেশদ্বারও রাজা নির্মাণ করিলেন। রাজা পাচিনপব্বত-বিহার স্থাপন করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিলেন। ॥ ১২৬-১২৭ ॥

রাজা দেবানংপিয় তিষ্য থূপারাম-এ যে মনোরম প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি স্থাপন[১১] করিয়াছিলেন, এই রাজা সেই মূর্তিটি সেই স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া পাচিনপব্বত-বিহারে উহা স্থাপন করিলেন। রাজা

কালমত্তিকা পুষ্করিণীটি চৈত্যপর্বত-বিহারের ভিক্ষুগণকে প্রদান করিলেন। ॥ ১২৮-১৩০ ॥

রাজা উক্ত বিহারের উদ্বোধন উৎসবে ও বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসবে লঙ্কাদ্বীপের ত্রিশ হাজার ভিক্ষুকে একজোড়া করিয়া ত্রি-চীবর প্রদান করিলেন। ॥ ১৩১ ॥

রাজা জ্যেট্ঠতিষ্য আলম্বগাম পুষ্করিণীটিও খনন করেন। এইরূপে রাজা মণিপাসাদ ও অন্যান্য বিহার নির্মাণের পুণ্যকর্ম করিয়া দশ বৎসর রাজত্ব করেন। ॥ ১৩২ ॥

অতএব চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা যেমন নানা পুণ্যকর্মের উৎস, আবার উহা অবিচারেরও উৎস। অবশ্য মঙ্গল চিত্তের ব্যক্তিগণ উহাতে কখনও আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের নিকট উহা বিষমিশ্রিত সুমিষ্ট খাদ্যের ন্যায় বোধ হইবে। ॥ ১৩৩ ॥

তেরোজন রাজার কথা সমাপ্ত

এইখানে ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'তেরোজন রাজার কথা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

টীকা

১. 'একনালিক' হচ্ছে এক মুষ্টি। এই দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের ঘরে এক মুঠো খাদ্যও ছিল না।

২. মূলে শব্দটি হচ্ছে 'মুচেলপট্টন'। টীকাকার বলেছেন ওটা হচ্ছে তাম্র নির্মিত একটি জাহাজের নাম। ঐরূপ নৌকার মত পাথরের পাত্রে খাদ্য রেখে ভিক্ষুদের তা দেওয়া হতো। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এইরূপ বহু পাত্র শ্রীলঙ্কায় পাওয়া গেছে। (**'Buried cities of ceylon'—Burrows, pp. 38, 43-44**).

৩. টীকাকার বলেছেন, বিহার দুটো হলো—মহাবিহার ও অভয়গিরি-বিহার।

৪. এই প্রাচীন গ্রন্থে বৌদ্ধবিহারের খ্যাতিমান ভিক্ষুগণের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সভাস্থলে এই গ্রন্থটি পাঠ করা হতো। এই গ্রন্থে ভিক্ষুদের প্রতি অবারিত দানের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

৫. বৈপুল্য সূত্রটি হচ্ছে মহাযানী বৌদ্ধদের প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থের একটি বিশেষ অংশ। (**Manual of Indian Buddhism—Kern, P. 5**). মহাযানীদের এখানে বিধর্মী বলা হয়েছে।

৬. বিনয় পিটকের মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ-এর কিছু অংশ।

৭. এটি হচ্ছে লঙ্কাদ্বীপের উত্তরে সমুদ্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এটাকে **East Island**'ও বলা হয়। টীকাকার বলেছেন— 'সমুদ্দ-মজ্‌ঝে সম্ভূতং পাচিনদিপং অগমাসি।'

৮. এই কক্ষে নানা দায়কদের প্রদত্ত অন্নদান একত্র করে ভিক্ষুদের দান করা হতো।

৯. মহাযানী ধর্মদর্শন।

১০. বৌদ্ধবিহারের যে স্থানে ভিক্ষুরা ধর্মালোচনা করেন।

১১. কথাটি ঠিক নয়, কারণ এই রাজার আমলে শ্রীলঙ্কায় কোন বুদ্ধ-মূর্তিই তৈরী হয়নি। সেটা হয়েছে বহু পরে।

৩৭

রাজা মহাসেনের কথা

রাজা জ্যেটঠতিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসেন রাজা হইয়া সাতাশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা জ্যেটঠতিষ্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষু সংঘমিত্ত রাজা মহাসেনকে অভিষিক্ত করিতে সাগর-পার হইতে ছুটিয়া আসেন। উক্ত ভিক্ষু রাজা মহাসেনের অভিষেক ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম করিয়া রাজার মন জয় করিয়া ফেলিলেন। এই বিনয় বহির্ভূত ভিক্ষু যিনি মহাবিহারের ধ্বংস আনিতে তৎপর, রাজা মহাসেনকে বলিলেন, 'মহারাজ! মহাবিহারের ভিক্ষুগণ সঠিক বিনয় শিক্ষা দেন না। আমরাই সঠিক বিনয় জানি ও উহাই শিক্ষা দিই।' রাজাকে এইরূপ বলিয়া এই ভিক্ষু রাজাকে দিয়া এইরূপ ঘোষণা করাইলেন, 'মহাবিহারের ভিক্ষুগণকে যে ব্যক্তি অন্নদান করিবে, তাহাকে শাস্তিস্বরূপ একশত মুদ্রা দণ্ড দিতে হইবে।' ॥ ১-৫ ॥

এই রাজাদেশে মহাবিহারের ভিক্ষুগণ নিরন্ন হইলেন। তাঁহারা উক্ত বিহার ত্যাগ করিয়া মলয় ও রোহণ প্রদেশে চলিয়া গেলেন। ইহাতে মহাবিহার ভিক্ষুশূন্য হইল এবং এইরূপে নয় বৎসর অবধি চলিল। শূন্য বিহারের পরিবেণ ও অন্যান্য কিছু অংশও ধ্বংস হইল। জ্ঞানহীন ভিক্ষু সংঘমিত্ত এইবার সমাধক অজ্ঞানী রাজা মহাসেনকে এই বলিয়া প্ররোচিত করিলেন, 'মালিকহীন ভূমি রাজারই হয়।' উক্ত ভিক্ষু মহাবিহারটি ধ্বংস করিলেন।

রাজার নির্লিপ্ততায় এই ভিক্ষু মহাবিহার ধ্বংস করিতে শত্রুভাবাপন্ন চিত্তের কিছু জনগণকে এই কার্যে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ॥ ৬-৯ ॥

এক দুর্ধর্ষ অমাত্য, সোনা ছিলেন এই ভিক্ষুর অনুরক্ত। তিনি রাজারও প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই অমাত্যের সাহায্যে নির্লজ্জ ভিক্ষু সংঘমিত্ত সপ্ততল বিশিষ্ট লোহপাসাদটি ধ্বংস করিলেন। সেই স্থানের সকল মূল্যবান বস্তু এই ভিক্ষু অভয়গিরি-বিহারে লইয়া গেলেন। মহাবিহারের মূল্যবান বস্তুসকলও এই ভিক্ষু অভয়গিরি-বিহারে লইয়া গেলেন। এইরূপে অভয়গিরি-বিহারটি ধন সম্পদে ভরিয়া গেল।

॥ ১০-১২ ॥

রাজা এই দুষ্ট ভিক্ষু সংঘমিত্ত ও সোনা অমাত্যের সাহায্যে বহু অন্যায় করিলেন। রাজা পাচিনপব্বত-বিহারে স্থাপিত বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তিটি আনিয়া অভয়গিরি-বিহারে স্থাপন করিলেন। এই বৃহৎ মূর্তির

জন্য রাজা একটি সৌধ নির্মাণ করেন। মহাবোধি বৃক্ষের জন্য একটি মন্দিরও স্থাপন করেন। রাজা রাজধানীতে চতুশালা ও ধাতুগৃহ নির্মাণ করেন এবং কুক্কুট পরিবেণের জীর্ণ সংস্কার করেন। দুষ্টভিক্ষু সংঘমিত্ত কেবল অভয়গিরি-বিহারটিকে সজ্জিত করিলেন। ॥ ১৩-১৬ ॥

রাজার অমাত্য মেঘবণ্ণাভয়, যিনি রাজার পরম মিত্র ছিলেন ও যিনি রাজার সকল কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখিতেন, তিনি মহাবিহার ধ্বংসের কারণে রাজার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বিদ্রোহ করিয়া মলয় প্রদেশে গিয়া বহু সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করিলেন ও দুরতিষ্য-পুষ্করিণীর নিকট সৈন্য শিবির স্থাপন করিলেন। ॥ ১৭-১৮ ॥

রাজা এই সংবাদ পাইয়া উক্ত অমাত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া কিছুদূরে শিবির স্থাপন করিলেন। ॥ ১৯ ॥

অমাত্য মেঘবণ্ণাভয় মলয় প্রদেশ হইতে কিছু উত্তম সুস্বাদু মাংস ও পানীয় আনিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ইহা আমি আমার পরম মিত্র রাজা মহাসেনের সহিত আহার করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই অমাত্য সেই সকল খাদ্য-পানীয় লইয়া রাতের অন্ধকারে একলা রাজার নিকট গোপনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাকে তাঁহার আসিবার কারণ জ্ঞাত করিয়া দুই বন্ধুতে বসিয়া পরম বিশ্বাসে সেই খাদ্য-পানীয় তাঁহারা উপভোগ করিলেন। রাজা তখন অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মিত্র! তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ কেন?' অমাত্য তখন বলিলেন, 'মহারাজ! আপনি কেন পবিত্র মহাবিহার ধ্বংস করিলেন?' রাজা বলিলেন, 'হে মিত্র! আমার এই ত্রুটি মার্জনা কর। আমি উক্ত বিহার পুনরায় বাসোপযোগী করিয়া দিব।' রাজার কথায় প্রীত হইয়া অমাত্য রাজার সহিত বিরোধ মিটাইয়া লইলেন। ॥ ২০-২৪ ॥

অতঃপর রাজা সৈন্য-সামন্তসহ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন, আর অমাত্য মেঘবণ্ণাভয় মহাবিহার সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসকল যোগাড় করিতে চলিয়া গেলেন। ॥ ২৫ ॥

রাজা মহাসেনের এক রাণী ছিলেন এক করণিকের কন্যা। তিনি ছিলেন রাজার অতীব প্রিয়পাত্রী। মহাবিহার প্রায় ধ্বংস হইলে এই রাণী খুবই দুঃখিত হন। তিনি পরম আক্রোশে একজন মজুর দিয়া ভিক্ষু সংঘমিত্তকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। একদিন এই হিংস্র ভিক্ষু সংঘমিত্ত লোকজন লইয়া থুপারাম-বিহারটি ধ্বংস করিতে গেলে রাণীর সেই মজুর ভিক্ষুকে হত্যা করেন। ইহার পর হিংস্র অরাজক অমাত্য সোনাকেও হত্যা করা হয়। ॥ ২৬-২৮ ॥

অমাত্য মেঘবণ্ণাভয় প্রয়োজনীয় বস্তুসকল যোগাড় করিয়া আনিলে,

রাজা উহা দ্বারা মহাবিহারের সংস্কার করিয়া নতুন পরিবেণও স্থাপন করেন। রাজা মহাবিহারের সংস্কার করিয়া উহা পুনরায় ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী করেন। অমাত্য মেঘবণ্নাভয় ভিক্ষুগণের মন হইতে অনাহারে থাকিবার ভয় দূর করিলে সেই বিহারের ভিক্ষুগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া আবার মহাবিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ॥ ২৯-৩০ ॥

রাজা দুইটি মিশ্রধাতুতে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি মহাবোধি মন্দিরের পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠা করেন। ॥ ৩১ ॥

অরাজক ভিক্ষু সংঘমিত্তের এক দুষ্ট মিত্র ভিক্ষু তিষ্য দক্ষিণারাম-বিহারে অবস্থান করিতেন। তাঁহাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু মহাবিহারের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত জ্যোতিবনে[২] জ্যোতিবন-বিহার নির্মাণ করিলেন। এই ভিক্ষু সকল ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন, তাঁহারা যেন নিজেদের অবস্থানের বিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকেন। ভিক্ষুসংঘ সেই কথা না মানিতে বিহার ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। পরে এই ভিক্ষুগণ তাঁহাদের পূর্বতন মহাবিহারে ফিরিয়া গেলেন।

॥ ৩২-৩৭ ॥

সেই সময় ভিক্ষুসংঘের মধ্যে রব উঠিল যে ভিক্ষু তিষ্য মহাপাপ কর্মে[৩] দুষ্ট হইয়াছেন। তিনি তখন জ্যোতিবন-বিহারের সর্বময় কর্তা। ভিক্ষুসংঘের ন্যায়পরায়ণপ্রধান বিষয়টি অনুধাবন করিয়া ভিক্ষু তিষ্যকে সংঘ হইতে বহিষ্কার করিলেন। ইহা রাজার অমতেই করা হইল।

॥ ৩৮-৩৯ ॥

রাজা মহাসেন মণিহীর-বিহারটিও নির্মাণ করেন। রাজা ব্রাহ্মণ্য দেবগণের মন্দিরগুলি ধ্বংস[৪] করিয়া তিনটি বিহার নির্মাণ করিলেন, যথা—গোকণ্ন-বিহার, এরকাভিল্ল-বিহার ও কলন্দ-বিহার। রাজা মিগগাম বিহার, গংগাসেনপব্বত বিহার এবং পশ্চিম প্রদেশে ধাতুসেন পব্বত-বিহার নির্মাণ করেন। কোকভাত অঞ্চলে রাজা একটি মহাবিহার নির্মাণ করেন। ॥ ৪০-৪২ ॥

রাজা থূপারাম বিহারটির সংস্কার করেন ও হুলপিটঠি-বিহারটি নির্মাণ করেন। রাজা ভিক্ষুণীদের জন্য উত্তর এবং অভয় নামের দুইটি ভিক্ষুণী-আগার প্রতিষ্ঠা করেন। যক্ষ কালভেলর স্থানে রাজা একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। সমগ্র লংকাদ্বীপের বহু ভগ্নপ্রায় সৌধ রাজা পুনরায় সংস্কার করেন। ॥ ৪৩-৪৪ ॥

রাজা এক হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া দ্বীপের এক হাজার সংঘপ্রধানকে দানাদি প্রদান করিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণকে রাজা প্রতি বৎসর চীবর

দান করিতেন। খাদ্য ও পানীয় যে কত দান করিতেন তাহার কোন হিসাব নাই। ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ভূমিকে উর্বর করিতে রাজা তাঁহার রাজ্যে আরও ষোলটি পুষ্করিণী খনন করেন, যথা—মণিহীর-পুষ্করিণী, মহাগাম-পুষ্করিণী, চল্লুর-পুষ্করিণী, খানু-পুষ্করিণী, মহামণি-পুষ্করিণী, কোকভাত-পুষ্করিণী, ধম্ম-রম্ম-পুষ্করিণী, কুম্বালক-পুষ্করিণী, বাহন-পুষ্করিণী, রত্তমালকণ্দক-পুষ্করিণী, তিষ্যবড্ডমানক পুষ্করিণী, ভেলংগভিট্ঠি পুষ্করিণী, মহাগল্লক-পুষ্করিণী, চির-পুষ্করিণী, মহাদারগল্লক-পুষ্করিণী ও কাল-পাসান-পুষ্করিণী। রাজা পব্বতনত নামক একটি খাল গঙ্গা নদী হইতে বাহির করেন।

এইরূপে এই রাজা অপরাধের সহিত বহু পুণ্যকর্মও করেন।

॥ ৪৭-৫০ ॥

রাজা মহাসেনের কথা সমাপ্ত

এইখানে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের সমাপ্তি। মহাবংশ গ্রন্থের এই অধ্যায়ের নাম হইল 'রাজা মহাসেনের কথা'। পুণ্যবানদের শুদ্ধ, নির্মল, আনন্দ প্রদানের জন্য ইহা সংকলিত হইল।

* * * *

[প্রাচীন মূল 'মহাবংশ' গ্রন্থের এইখানেই সমাপ্তি। গ্রন্থটি সাঁইত্রিশ অধ্যায়ের। কিন্তু পরবর্তীকালে আর একজন লেখক 'সাত রাজার কথা' নামক একশ আটানব্বইটি নতুন স্তবক এর পরে যুক্ত করেন। এই লেখক 'দ্বীপবংশ' গ্রন্থের দুইটি স্তবকও তাঁর রচনার পরে বসিয়ে দিয়ে এই প্রাচীন গ্রন্থ এবং তাঁর নিজের লিখিত নতুন স্তবকগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করেন।

মূল গ্রন্থের বিশুদ্ধতা রাখতে এগুলো বাদ দিয়ে গ্রন্থটি পূর্বের মূল গ্রন্থের ন্যায় এইখানেই শেষ করা হলো।]

মহাবংশ গ্রন্থের সমাপ্তি

টীকা

১. চার দেওয়াল বিশিষ্ট হলঘর।
২. প্রাচীন অনুরাধপুরের নন্দন উদ্যান।
৩. মূলে বলা হয়েছে 'অন্তিমবত্থু' অর্থাৎ অন্তিম বিষয়। এটাকে মহাবংশে 'পারাজিকা' অপরাধ বলা হয়েছে। কিন্তু ভিক্ষু কী অপরাধ করেছিলেন সেটা অবশ্য বলা হয়নি।

৪. টীকাকার বলেছেন 'এবম্ সব্বতথ লংকাদিপমহি কুদিট্‌ঠিকানং আলয়ং বিদধংসেত্বা শিবলিংগাদিও নাশেত্বা বুদ্ধশাসনং এভ পতিটঠপেসি' অর্থাৎ সমগ্র লংকাদ্বীপে বিধর্মীদের মন্দির, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি, ধ্বংস করিয়া রাজা বুদ্ধের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ভারতবর্ষে যেমন শংকরাচার্যের সময়ে এবং সুঙ্গ রাজাদের কালে বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মন্দির স্থাপন করা হয়, আবার বৌদ্ধমন্দিরগুলোতে শিবের ত্রিশূল, লিঙ্গ ইত্যাদি স্থাপন করে শাক্ত মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়, দেখা যাচ্ছে শ্রীলংকাতেও এই রাজা অন্য ধর্মের মন্দির ভেঙে বুদ্ধের মন্দির স্থাপন করেন। এতে ধর্মের ক্ষতি বৃদ্ধি হউক বা না হউক, মানুষের কট্টর ধর্মবিশ্বাস যে তাকে কত নীচে নামাতে পারে এগুলো তারই নিদর্শন।